আল-কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতির বিস্ময়কর বাস্তবায়ন

আল-হাজ্জ মোঃ আজিজুল হক ভূঁঞা
এডভোকেট, জজ কোর্ট, ঢাকা

আল-কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতির বিস্ময়কর বাস্তবায়ন

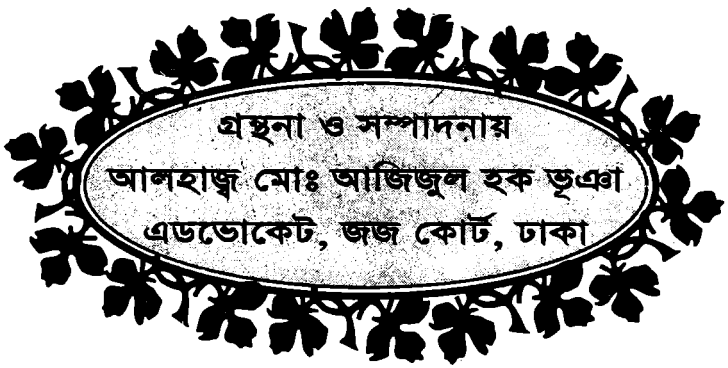

সহযোগিতায় ঃ

হাফেজ মৌলানা সিদ্দিকুর রহমান

আল-আমান প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মেসার্স আল-আমান প্রকাশনীর পক্ষে
মোহাম্মদ আমানুল হক
৩৫৫, ৩৮৬/১, গুলবাগ, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭।

প্রচ্ছদ ঃ
ইব্রাহিম মন্ডল (চিত্রন গ্রাফিকস)
৪৩৫/এ/২, বড় মগবাজার (ওয়্যারলেস রেলগেট), ঢাকা-১২১৭।

স্বত্ব ঃ গ্রন্থকার ও প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0816-7

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন ১৪০৬ বাংলা
ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইংরেজী
জিলক্বদ ১৪২০ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
সিটি কম্পিউটারস্
১৭৩, ফকিরেরপুল (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণে ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ১১০/-

পরিবেশক ঃ

১। **মদীনা পাবলিকেশন্স**, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ২৩৪৫৫৫।

২। **আল ফালাহ পাবলিকেশন্স** (প্রফেসর'স বুক কর্ণারের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
১৯১, ওয়্যারলেস গেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
৩৫৫, ৩৮৬/১, গুলবাগ (ইন্দ্রপুরী), মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ও ঢাকার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়সমূহ।

AL-QURANER BHABISHAT BANI O PRATISHRUTIR BISHAYKAR BASTABAYAN (In Bangla) * Prophesies and Promises of the Holy Quran and their Astonishing Fulfilment by Alhaj Md. Azizul Hoque Bhuiyan and Published by M/s. Al-Aman Prokashoni, Dhaka, Bangladesh.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম
আব্বা ও আম্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এবং
বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তাবিদ,
গবেষক ও কলম জেহাদীদের,
এবং
স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়
জীবন বিসর্জনকারী অমর
শহীদদের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গকৃত।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল-কোরআনুল করীম হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব/গ্রন্থ। ইহা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহা শুধু কোন একটি দেশ, দল, গোত্র বা সম্প্রদায়ের জন্য নাজিল হয়নি। ইহা বরং সমগ বিশ্ব মানবের জন্যই চলার পথে পাথেয় বা হেদায়েত স্বরূপ নাজিল হয়েছে। এতে মানব জাতীর সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যে বা যারাই ইহা গ্রহণ ও অনুসরণ করবে সে বা তারাই ইহা থেকে হেদায়েত তথা সহজ সরল সৎপথ ও কল্যাণ, মংগল লাভ করতে সক্ষম হবে।

এ কোরআন যে সময় এবং যেখানে নাজিল হয়েছিল, সে সময় সেখানে, সে আরব তথা মক্কায় চলছিল অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকার যুগ, যাকে বলা হয় "আইয়ামে জাহেলিয়াত"। ইহা সর্বজনবিদিত যে তখনকার ঐ যুগে আরবরা তথা মক্কার অধিবাসীরা মূর্তীপুজা/প্রতিমা পূজা করত। আর মক্কার কাবা গৃহই ছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা ও উপসনার প্রধান কেন্দ্র।

হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশেই তাদেরকে মূর্তী পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহ'র এবাদত করার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু মক্কার কাফের/মুশরিক কোরাইশরা এ একেশ্বরবাদ গ্রহণ করার পরিবর্তে চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তারা এই একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের বিরোধীতা করতে গিয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নানাভাবে নির্যাতন, উৎপীড়ণ নিপীড়ণ করতে থাকে। আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ)-এর উপর এরূপ নির্মম জুলুম, নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাদের প্রতি ভয়ানক রুষ্ট হয়ে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁর রাছুল ও মুসলমানদেরকে কাফের/মুশরিকদের প্রতিরোধের মুখে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/ওয়াদা প্রদান করেন যা পরবর্ত্তীকালে বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়।

আল-কোরআনের আগাম ঘোষিত আল্লাহ তায়ালার এ সব প্রতিশ্রুতি/ওয়াদা এবং উহাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানব জাতীর জন্যই একটি বিস্ময়কর দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয়। লেখক তার এ গ্রন্থটিতে কোরআনের এ বিশেষ বিষয়টিই সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কোরআনের এ বিশেষ দিকটি আলোচনা/পর্যালোচনা করতে গিয়ে অবলীলাক্রমেই মহান আল্লাহতায়ালা, তাঁর প্রিয় রাছুল (ছাঃ) ও আল-কোরআনের কিছুটা প্রকৃতি, রূপ ও পরিচিতি এবং তৎকালীন মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের বহু অজানা কথা, অজানা ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যা পাঠক সমাজের প্রতি আকর্ষনীয়, উপাদেয় ও উপভোগ্য হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এতে লেখকের ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টি ভঙ্গীরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থটি আল-কোরআনে উল্লেখিত বিশেষ বিষয়টির সম্পর্কে মুসলিম, অমুসলিম সকলেই জ্ঞাত হতে সহায়ক হবে বলেও আমাদের ধারণা। ইহাছাড়া কাফের/মুশরিক, নাস্তিক/জড়বাদী/সন্দেহবাদীদের কোরআন সম্পর্কিত প্রায় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর এ পুস্তকটিতে মিলবে বলেও আমাদের বিশ্বাস।

আরো উল্লেখ্য যে লেখকের ইহা একটি প্রাথমিক প্রয়াস। আইন পেশায় নিয়োজিত থাকাবস্থায়ও লেখক এই ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজে হাত দিয়ে সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে সক্ষম হওয়ায় সকল মহল থেকেই উৎসাহ/উদ্দীপনা পাবার যোগ্য। লেখক যেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত আরো নতুন নতুন গ্রন্থ/পুস্তক প্রকাশে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান সে কামনা ও দোয়া করছি।

সর্বশেষে বর্তমানে এই ধরণের গ্রন্থ দুর্লভ বিধায় কোরআনী তথা ইসলামী জ্ঞান পিপাসু পাঠক/পাঠিকাদের নিকট ইহা সমাদৃত হলেই লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হবে আমার বিশ্বাস। লেখকের প্রচেষ্টা সফল হোক। মহান আল্লাহতা'য়ালা কবুল করুন। আমীন।

ইতি

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

১। "ই'লমুল গায়েব" তথা অজ্ঞাত/অদৃশ্যের সংবাদ/জ্ঞান সম্পর্কে কোরআন ১৭
২। আল-কোরআনে প্রদত্ত ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি/বাণী (ভবিষ্যদ্বাণী) সম্পর্কে খোদ কোরআন ২২
৩। ধরাতলে সময় সময় হেদায়েত তথা শরীয়তি বিধানমালা/আসমানী কিতাব প্রেরনের আগাম ঘোষণা ২৩
৪। নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই রাছুল (ছাঃ) -এর উপর গুরুভার ও দূর্বহ 'কালাম' (কোরআন) নাজিল হতে যাচ্ছে বলে অগ্রিম ঘোষণা ২৯
৫। সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল-কোরআনের সূরা/আয়াত মুখস্ত, ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করিয়ে দেয়ার চাঞ্চল্যকর ঘোষণা ৩৪
৬। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর আগমনী বার্তা পূর্ববর্তী ঐশী ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে বলে কোরআনের ঘোষণা ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কোরআন আল্লাহর বাণী যা কোন মানুষ/জ্বিন বা অন্য কেহই রচনা করতে পারবে না বলে কোরআনের বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ ৫৯
২। আল-কোরআন সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তি, দূর্নীতি ও হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট থেকেই অবতারিত বলে ঘোষিত ১৩৭
৩। কোরআন মহান স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত এবং তিনিই স্বয়ং এর সংরক্ষক বলে আগাম ঘোষণা ১৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

১। আল্লাহর পথে বাধা ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য ধনসম্পদ ব্যয়কারী কাফের/মুশরিকরা পরিশেষে অনুতপ্ত, পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে অগ্রিম ঘোষণা ১৪৯
২। কাফের/মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অবস্থা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়ার অগ্রিম ঘোষণা ১৫১
৩। হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'কাওসার' তথা অনন্ত অসীম অশেষ কল্যাণ ও নিয়ামত প্রদানের আগাম ঘোষণা ১৬৩
৪। কাফের/মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর 'ঝিকির' তথা- তাঁর নাম, ডাক, উল্লেখধ্বনি বিশ্বব্যাপী মহামহিমান্বিত করে দেয়ার আগাম ঘোষণা ১৬৮
৫। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্ব প্রকার অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তা দানের আগাম ঘোষণা ১৮২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

১। বিজয়ী পারসিকদের উপর পরাজিত রোমানদের পুনঃবিজয় এবং মুসলমানদেরকেও মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৫
২। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) এর প্রতি উপহাস, ঠাট্টা/বিদ্রূপকারীরা ব্যর্থ ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা ২০২
৩। ইসলাম ও রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ঘোর বিরোধী কট্টর অবিশ্বাসী আবু লাহাবের পতন সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ২০৫
৪। ইসলাম ও রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ঘোর বিরোধী কট্টর কাফের/মুশরিক আবু জেহেলের পতন সম্পর্কে কোরআনের আগাম ঘোষণা ২১০
৫। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) নয়, বরং তাঁর বিদ্রূপকারী শত্রুরাই নাম-নিশানাহীন, 'লেজকাটা' নির্বংশ বলে ঘোষিত ২১৪
৬। আল্লাহ ও তাঁর রাছূলই বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হবে এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা ২১৯
৭। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'ওমরা' পালনের সত্য স্বপ্ন প্রদর্শন ও অনতিবিলম্বে 'খয়বর' বিজয়ের আগাম সংবাদ দান ২২৩
৮। মুরতাদ, কাফের/মুশরিকদেরকে অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতার কারণে শাস্তি দানের আগাম ঘোষণা ২২৭
৯। ধর্মদ্রোহী কাফের/মুশরিকরা নয়, বরং আল্লাহর রাছূল (ছাঃ) ও ধর্মভীরু মুসলমানগণই পবিত্র মক্কা নগরীর বৈধ অধিকারী বলে ঘোষিত ২২৯
১০। মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে মক্কায় অবস্থানকারী কাফের/মুশরিকদের সাথে পুনঃমিলন তথা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ২৩২

পঞ্চম অধ্যায়

১। ঈমানদার সৎ-কর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত/প্রতিনিধিত্ব ও আধিপত্য প্রদানের অগ্রিম ঘোষণা ২৩৫
২। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে কাফের/মুশরিকদের সর্বপ্রকার চালবাজী ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে উল্টো তাদের উপরই পতিত হবে বলে অগ্রিম ঘোষণা ২৪০
৩। আল্লাহর রাছূল (ছাঃ) ও কোরআন বিরোধী কাফের/মুশরিকরা মুসলমানদের নিকট পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা ২৪২
৪। দ্বীন ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী ও পরাক্রান্ত করার আগাম ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি ২৪৫
৫। ইসলাম ও রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোর বিরোধিতায় মদিনার ইহুদীরা পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা ২৫২
৬। খল/কপট বিশ্বাসী অর্থাৎ মোনাফিকদের মর্মন্তুদ পরিণতি সম্পর্কে আগাম ঘোষণা ২৫৪

www.pathagar.com

৭। ঈহুদীদের প্রতি মুনাফিকদের অনুগত থাকা ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি/আশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে বলে আগাম ঘোষণা ২৫৬
৮। 'তবুক' অভিযানের পর মোনাফিকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সমীপে মিথ্যা অজুহাত/বাহানা পেশ করবে বলে আগাম অবহিতকরন ২৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মুনাফিকদের অনিষ্টকর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী মসজিদ 'মসজিদে জেরার' নির্মাণের হীন উদ্দেশ্যে সম্পর্কে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগাম সংবাদ প্রদান ২৬৩
২। পানিতে নিমজ্জিত 'ফেরাউনের' মরদেহ নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত হবে বলে আগাম ঘোষণা ২৬৭
৩। হোদায়বিয়ায় 'বায়াতে রিজওয়ানে' অংশ গ্রহণকারীগণকে অনতিবিলম্বে একটি বিজয় প্রদানসহ আরও গনিমতের মাল অর্জন করবে বলে আগাম ঘোষণা ২৭১
৪। 'হুদায়বিয়ার' সন্ধির অনতিবিলম্বে 'খয়বর' বিজয়ের পর আরও বহু বিজয়ের মাধ্যমে বিপুল গণিমতের মাল হস্তগত হবে অগ্রিম ঘোষণা ২৭৪

সপ্তম অধ্যায়

১। মহানবী হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিশ্ব মাঝে পাঠানোর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার এবং পরপারে মহাপ্রস্থানের অগ্রিম আভাস ২৭৭
২। আল-কোরআনের 'আয়াত' কে (কোরআনকে) অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে খোদ কোরআন ২৮৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

করিলাম শুরু নিয়ে আল্লাহর নাম
যিনি করুনার আধার রাহীম ও রহমান।

আল-কোরআন হচ্ছে সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহোত্তম আসমানী কিতাব বা জীবন বিধানমালা। ইহা বিশ্ববাসীর ইহ ও পরকালীন সময়ে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মংগলামংগলের জন্য শ্রেষ্ঠতম পূর্নাংগ জীবনবিধান যা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাছুল হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা পটভূমিতে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান স্বরূপ নাজিল হয়েছিল। ইহা এক সাথে একদিনে নাজিল না হয়ে ধাপে ধাপে, অল্পে অল্পে সূরা/আয়াতের আকারে প্রয়োজনুসারে নাজিল হয়েছিল।

তাছাড়া, এই কোরআন কোন বিশেষ গোত্র বা জনতা অথবা কোন বিশেষ এলাকার মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যই নাজিল হয়েছে বলে খোদ কোরআনেই ঘোষিত হয়েছে। ইহা মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক, বৈষয়িক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক অর্থাৎ সর্বপ্রকার সমস্যার যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত চিরস্থায়ী বাস্তব সমাধান স্বরূপ একটি প্রত্যক্ষ অবতারিত গ্রন্থ। ইহা নিজেই যেমন একটি বিস্ময়কর মু'জিযা/অলৌকিকতাপূর্ণ তেমনি চাঞ্চল্যকর শেফাময় (রোগ আরোগ্য লাভে যোগ্যতা সম্পন্ন) প্রত্যাদিষ্ট মহাগ্রন্থ যা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থের বেলায় প্রযোজ্য নয়। ইহা মানব জাতির জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সময় সময় হেদায়েত বা শরীয়তি বিধানমালা বা পথ নির্দেশ প্রেরনের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির সর্বশেষ বাস্তবায়ন। ইহা সর্বপ্রকার ভুল/ভ্রান্তি, পরিবর্তন/পরিবর্ধন, সংযোজন/বিয়োজন ও ত্রুটি/বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক হেফাজত বা নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত একটি প্রচন্ড আবেগ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী মনোমুগ্ধকর, মনোরম ও মনোহর কিতাব/গ্রন্থ। ইহা ছাড়া উহার বাহক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভূপৃষ্ঠে আগমনী বার্তাসহ এর অবতরণ বার্তাও বহু পূর্বেই অন্যান্য অবতারিত আসমানী গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় অগ্রিম ঘোষিত হয়েছিল। অর্থাৎ ইহা একটি পূব প্রতিশ্রুত আসমানী মহাগ্রন্থ।

মানুষ বিশ্বমাঝে স্রষ্টার 'খলিফা' বা প্রতিনিধি হিসাবে স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনার জন্য যা যা করণীয় ও যা যা বর্জনীয় সবকিছুই সুন্দর সুচারুরূপে এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ধরাতলে অবস্থানকালে স্রষ্টা ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মেনে চললে অথবা মেনে না চললে ইহ ও পরকালে মানুষের পরিণতি ও অবস্থান সম্পর্কেও অন্ত্যন্ত পরিস্কার বর্ণনা রয়েছে কোরআনে।

মু'জিযা বা অলৌকিকতাময় ও বিস্ময়কর এই মহাগ্রন্থটিতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য পুস্তক/পুস্তিকা রচিত হয়েছে। এতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন দিকের বিষয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এতে ইহ ও পরকালে এবং নাজিলের পর থেকে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ও বাস্তবায়নযোগ্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য ওয়াদা/ঘোষণা/ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার মধ্যে বহু সংখ্যক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবিতাবস্থায় সাহাবাদের সম্মুখেই অতি চমকপ্রদভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং কতক

www.pathagar.com

পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন ও মুসলিম রাজা বাদশাদের সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। বাকী সব যা পরবর্তীতে এবং পরকালে বাস্তবায়িত হবার তা যথাসময়ে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

আল-কোরআনে ঘোষিত আল্লাহর এসব বিভিন্ন ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যদ্বাণী এবং এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক/পুস্তিকাতেও বিচ্ছিন্ন বা খন্ডাকারে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায় বটে। কিন্তু বিষয়টির উপর পর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত পূর্ণাংগ গ্রন্থ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে জ্ঞান পিপাসু অমুসলিমগণ তো বটেই এমনকি মুসলমানেরাও কোরআনের এ দিকটার পর্যাপ্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রয়েছে বলেই আমার ধারণা। সবিশেষে গুরুত্বের অধিকারী এ বিষয়টির প্রতি মুসলিম/অমুসলিম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে বিবেচিত হওয়ায় এবং আল্লাহ, আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ) ও কোরআনের মাহাত্ম সম্পর্কেও কতকটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার মানসে আমি এ প্রয়াস চালিয়েছি।

উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি মূলতঃ একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট আয়াত, আয়াতের তরজমা, তফসীর, শানে নজুল, পটভূমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ তফসীর, অনুবাদিত তফসীর গ্রন্থ ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে সংগৃহিত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে প্রয়োজন অনুয়ায়ী পুরোপুরি বা আংশিক হুবহু উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। কারণ আমি (লেখক) নিজে আল- কোরআনের কোন তরজমা বা তফসীরকারক বা ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণকারক নহি। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি বোধকল্পে তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে মূল ভাব ঠিক রেখে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু নেয়া হয়েছে, বাকী অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে মূল ভাব ঠিক রেখে বক্তব্য পরিস্কার, স্পষ্ট ও অধিকতর সুখ পাঠ্য ও শ্রুতিমধুর করার লক্ষ্যে উদ্ধৃত তরজমা বা তফসীর সমূহে কোন কোন শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল ভাব ঠিক রেখেই প্রয়োজন মোতাবেক তরজমা/তফসীর কিছুটা সংক্ষেপিত করা হয়েছে।

যে সমস্ত প্রধান প্রধান তফসীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে বা সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- ১। তফসীরে মা'রেফুল কোরআন (মূল- মুফতী মোঃ শফী, ভাষান্তর মৌলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশনা), ২। তফসীরে আশরাফী (ভাষান্তর মৌলানা শামসুল হক ফরিদপুরী), ৩। তফসীরে তাফহীমুল কোরআন (মূল- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ভাষান্তর মৌলানা মোঃ আব্দুর রহীম), ৪। তফসীরে কোরান শরিফ (মোঃ আলী হাসান অনুদিত ও সংকলিত)। ইহা ছাড়া হাদিস গ্রন্থ ও অন্যান্য খ্যাতনামা ইসলামী গ্রন্থসমূহ যেগুলি থেকে যে সহায়তা নেয়া হয়েছে বা উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার একটি তালিকা এ পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, সাধু ভাষায় তরজমা ও তফসীর সমূহ কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সূরা/আয়াতের পুর্বাপর সমস্ত বা আংশিক আয়াত নেয়া হয়েছে। আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও অনেক ক্ষেত্রে 'মেশকাত শরীফ'কে অনুসরণ করে প্রচলিত 'রাসুল' বানান 'রাছুল' এবং (সাঃ) এর বানান (ছাঃ) করা হয়েছে এবং ইহাই অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে হয়।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একই বিষয়ে একাধিক তফসীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত দেয়া হয়েছে। কারণ এক এক তফসীরকারের দৃষ্টি ও প্রকাশভংগি এক এক রকম যদিও

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু একই। একই বিষয়ে বিভিন্ন তফসীরকারকের প্রকাশ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত পরিচিত হওয়া এবং পাঠের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি এবং অধিকতর জোরালো ও রসালো করার মানসেই এরূপ করা হয়েছে।

আমার এ পুস্তক রচনায় আমি বর্ণিত তফসীর গ্রন্থ সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থকারের বহু সংখ্যক গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং যথাসম্ভব উদ্ধৃতি দিতে সচেষ্ট হয়েছি। এসব তফসীরকারক ও পুস্তক প্রণেতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইহা ছাড়া আমার এই পুস্তকটি প্রণয়ন/গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় বিশেষ করে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখে দিয়ে কতিপয় প্রখ্যাত সুহৃদ গ্রন্থকার ও আলেম ওলামা যেমন, জনাব আবুল কাশেম ভূঞা, উবায়দুর রহমান খান নদভী, হাফেজ মৌলানা সিদ্দিকুর রহমান, খতিব খিলগাঁও শাহী মসজিদ ও প্রিন্সিপাল, মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ঢাকা, আলহাজ্ব মৌলানা কাফীল উদ্দিন সরকার সালেহী, প্রিন্সিপাল, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ, ঢাকা ও খতিব আমিনবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা, মুফতী, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহ, ঢাকা। আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমার এই পুস্তক প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমি তাদের সবাইর কাছেও কৃতজ্ঞ।

প্রকাশ থাকে যে, পুস্তকের কলেবর রোধকল্পে আমাকে অনেকক্ষেত্রে তথ্যাদির বিস্তৃতি সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। আমার এ লেখা আগত-অনাগত দিনের নবীন উদ্যোগী লেখক ও গবেষকদের প্রেরণার বস্তু হিসাবে কিছুটা কাজ করলেও আমার এই উদ্যোগ সার্থক হবে বলে আমি মনে করব। মূলতঃ কোরআন ভিত্তিক এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী হিসাবে ইহা একটি প্রাথমিক পর্যায়ের বই বিধায় ইহা পূর্নাংগ নাও হতে পারে। আবার আমি কোন সু-অভিজ্ঞ গ্রন্থকার বা সু-সাহিত্যিক নই, ফলে প্রকাশভংগী যেমন হওয়া প্রয়োজন তেমন নাও হতে পারে। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হল যে, যে কোনভাবে ইপ্সিত বিষয়বস্তু পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি বা কোন কোন স্থানে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি পরিহার করা সম্ভব হয় নাই। আশা করব পাঠক যেন তা সহজভাবে গ্রহণ করেন।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার প্রচেষ্টায় কোন ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলে আমি সাদরে ও পরম কৃজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে আগামীতে তা সংশোধন করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবো। তাছাড়া, আরও নতুন তথ্যাদি ও সৎ পরামর্শ দিয়ে আমাকে এই ব্যাপারে কেউ সাহায্য সহযোগিতা করলে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে আমার এ পুস্তক পাঠে প্রিয় পাঠকবৃন্দের জ্ঞানে কিছুটা সংযোজন হলে এবং ইহ ও পরকালে নিজেদের অবস্থান এবং পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি জাগাতে সক্ষম হলেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক ও নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সর্বশেষে আল্লাহপাক এ পুস্তকটিকে কোরআন পাঠে এবং উহার মর্ম অনুধাবনে আগ্রহীদের সহায়ক হিসাবে কবুল করুন, এই দোয়া করছি। আমীন।

ইতি

মোঃ আজিজুল হক ভূঁঞা

www.pathagar.com

কিছু প্রাসংগিক কথা

সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে উল্লেখিত সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি ও (ভবিষ্যত) বাণী, গায়েবী/অদৃশ্য/অজানা সংবাদ/খবর সমূহ যা পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ ও বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং অন্যসব যা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্যভাবে সর্বকালেই বাস্তবায়িতব্য, সে সকল ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কেই অত্র গ্রন্থে অল্প বিস্তর বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে অতি সংক্ষেপে হলেও খোদ কোরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য, রাছুলে করীম (ছাঃ) -এর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহতায়ালার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীত্ব ও মহানুভবতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার এ লেখা কোরআনের অনুসারী শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই নহে বরং মুসলমান অমুসলমান সমভাবে সকলের উদ্দেশ্যেই লিখিত। তাছাড়া, আশ্চর্য্যজনক হলেও ইহা বাস্তব সত্য যে, দেশে দেশে, কালে কালে সর্বত্র একদল নামধারী মুসলমান ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে যারা নিজেদের ধর্মে জ্ঞান (বিশেষ করে ইসলামী জ্ঞান) আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) হওয়া সত্বেও সেদিকে মোটেও ধারায় না বা ভ্রুক্ষেপও করেনা। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই যে, নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে এরা একেবারেই অজ্ঞ ও চরম উদাসীন। মানব জাতির জন্য স্রষ্টার নির্ধারিত একমাত্র ধর্ম ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে দাবীদার হয়েও সর্বক্ষেত্রে ইসলাম, মুমিন-মুসলমান, আলেম-ওলামা, নিজ ধর্মগ্রন্থ কোরআন, হাদীস এক কথায় স্বীয় ধর্মের এবং স্বজাতির সমালোচনা ও বিরোধীতা বা এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে এরা একটুও দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করে না। বাংলাদেশেও এর কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলাম পন্থী গণমাধ্যম, সাময়িকী, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ফোরামগুলিতে এদের (নাম সর্বস্ব মুসলমানদের) স্বরূপ ও প্রকৃতি যে ভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে তা অনেকটা এরূপ, 'মুসলমানদের ঘরে জন্ম গ্রহণকারী এদের নামটাই শুধু মুসলমানী। আর বাকী আপাদমস্তক সর্ববিধ বিবেচনায় এরা অমুসলমান, বিধর্মী বা বিজাতীয়দের অনুরূপ।' এরা জানে না, পড়ে না বা পড়েও বুঝে না নিজেদেরই ধর্মগ্রন্থ কোরআন/হাদিস। এরা জানে না, বা জেনেও মানে না, আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-কে অথবা [মানবজাতি, ইসলাম বা মুসলমানদের] সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালা আল-কোরআনে কি-ই বা বলেছেন।

আল-কোরআনে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য বহু কিছু বলার মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টি আকর্ষন স্বরূপ এখানে দুই একটি উল্লেখ করা যায় যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন, (ক) "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাছ" অর্থাৎ "তোমরাই (মুসলমানেরাই) সর্বশ্রেষ্ট জাতি। মানুষের মংগলের জনই তোমাদেরকে বের (সৃষ্টি) করা হয়েছে" (সূরা ইমরান, আয়াত-১১০ অংশ)। (খ) 'এই লোকেরা চাহে যে, আল্লাহ'র আলোকে (নূরকে) তারা নিজেদের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো (জ্যোতি)কে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফেরদের/ মুশরিকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হউক না কেন।' (সূরা- তওবা, আয়াত- ৩২)।

www.pathagar.com

অপ্রিয় হলেও ইহা সত্যের কোন অপলাপ নয় যে, ঐ সব লোকেরা জানেনা এক সময়কার বিশ্ববিজয়ী এদেরই জাত ভাই মুসলমানদের ইতিহাস, সভ্যতা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, স্থপতি ইত্যাদি। শুধু তা-ই নহে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু সুযোগ পেলেই এই সব নামধারী মুসলমানেরা দেশে দেশে বিধর্মী বিজাতীয়দের সাথে একাত্ম হয়ে হাটে মাঠে ঘাটে সদা সর্বত্র ইসলামী চিন্তা-চেতনার, ইসলামী ভাবধারার বিরোধীতায় সোচ্চার হয়ে উঠে। এরা বক্তৃতায় বিবৃতিতে প্রকৃত আলেম, ওলামা, মুমিন মুসলমানদেরকে 'মৌলবাদী', 'ধর্ম ব্যবসায়ী', 'ফতোয়াবাজ' ইত্যাদি বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এসব 'বুদ্ধি ব্যবসায়ী' ও 'রাজনীতি ব্যবসায়ী' ছিন্নমূল (মূলহীন/মূলচ্যুত) ধর্ম বিরোধী মোরতাদেরা (ধর্মচ্যুতরা), নাস্তিক্যবাদী ও জড়বাদীরা নিজেদের নাম পরিবর্তন না করেই ইসলামী নাম সম্বল করে বিজাতীয়, বিধর্মী, নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুনাফেকদের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে একটু দ্বিধা করে না, বরং আচার আচরণে, কথাবর্তায়, চিন্তায়, চেতনায়, কবিতায়, গানে, নাটকে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে অর্থাৎ জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এরা ইসলাম বিরোধী। ইহা ছাড়া, বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী শক্তি সমূহের মত এরাও মুসলিম দেশ গুলিতে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিজাতীয় ভাবধারা, অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কৃতি প্রবিষ্ট করার জন্য সর্বপ্রকার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এই শ্রেণীর নাম সর্বস্ব তথাকথিত মুসলমানেরা সদা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবং একটু সুযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মেতে উঠে।

সম্ভবতঃ বিশ্বে এমন কোন জাতি নেই যারা নিজেদের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে না। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও ইহা সত্য যে, পূর্ব্বোল্লিখিত এই নাম সর্বস্বরা বিজাতীয়/বিধর্মীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়েই গর্ববোধ করতে লজ্জাবোধ করেনা। এই সব ইসলামী জ্ঞান তথা কোরআন, হাদিস, আল্লাহ, রাছুল (ছাঃ) সম্পর্কিত জ্ঞান বিবর্জিত নামধারী মুসলমানরাও যাতে নিজ ধর্মের উৎস/ভিত্তি আল-কোরআনের মহিমা, মহত্ব, অলৌকিকত্ব এবং কোরআনের আলোকে নিজেদের অবস্থান ও পরিণতি এবং এতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী/প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা এবং ইহার প্রত্যক্ষ ও বিস্ময়কর বাস্তবায়ন, কোরআনের বাহক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথে মহান স্রষ্টা আল্লাহ'র জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা হলেও পরিচিত এবং ওয়াকেফহাল হতে পারে, আমার এ লেখার এটাও আর একটা উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, এখানে নির্দিষ্ট ভাবে কাহাকেও কোন কটাক্ষ বা আক্রমণ করে বা কারো সমালোচনা করে কোন কথা বলা হচ্ছে না বা কোন রাজনৈতিক বক্তব্যও দেয়া হচ্ছে না। প্রভাব ও বিদ্বেষ মুক্ত, নিরপেক্ষ ও খোলা মনের অধিকারী সাধারণ প্রত্যক্ষদর্শিরা বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করছে এবং ধর্মীয়ভাবে সচেতন ব্যক্তিগণ যা তাদের চোখের সম্মুখেই দেখতে পাচ্ছে, যা অলিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার কোন সুযোগ নেই, শুধু তাই উল্লেখ করা হচ্ছে মাত্র।

ইহা খুবই আফসোস ও আক্ষেপের ব্যাপার এই যে, এরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও আজ নিজ ধর্ম ইসলাম থেকে দূরে পড়ে রয়েছে। এদের কাছ থেকে বিশ্ব জুড়ে

www.pathagar.com

মুসলমানেরা যেখানে আশা করছিল যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবের যে আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিপ্লব ও পুনর্জাগরণকে বেগবান করে তারা পরিপূর্ণ রূপ দিবে, সেক্ষেত্রে তা না হয়ে বরং উল্টোটাই হচ্ছে অর্থাৎ খোদ মুসলমানেরাই এদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছেন যা ইসলামে অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয়। আসলে এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং অনাদিকাল থেকেই চলে আসা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঈহুদী, নাসারা (খৃষ্টান) কাফের, মুশরিক, মুনাফেক ও নাস্তিক জড়বাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। এইসব নামধারী মুসলমানেরা উল্লিখিত নাস্তিক জড়বাদীদের প্রভাবে স্রষ্টার বিধানকে পাশ কাটিয়ে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন ইজম, মতবাদ/মতাদর্শ বা তন্ত্রে মন্ত্রে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখে নিজেদেরকে নিজ ধর্মেরই প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছে। শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেরই নহে বরং নিজেদের অতীত গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস জ্ঞানের প্রতিও চরম অনিহা ও অভাবও যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও এ পরিস্থিতির জন্য অনেকটা দায়ী।

এরা খবর রাখে না যে, নিজেদের জাত ভাইয়েরাই অতিতে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি না করে গেছেন। তারা জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না যে, এদেরই জাত ভাই মুসলমানেরা একটানা আটশত বৎসর বর্তমান সভ্যতার দাবীদার ইউরোপের শিক্ষাগুরু হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এরা যদি জানত যে, তাদেরই জাত ভাই, এই মুসলমানেরা অতীতে সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমরক্ষেত্রে কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করে গেছেন, তবে নিজেদেরকে জেহাদী জাতি ভেবে শির উঁচু করেই দাঁড়াত এবং নিজেদেরকে কাফের, মুশরিক, মুনাফেকদের পদলেহী দালাল, সেবাদাস রাম ও বামপন্থী নামে অভিহিত হতে দেখে লজ্জায় ঘৃনায় মরে যেত। এরা যদি প্রকৃত, মুসলিম বা মর্দে মুমিন হতে পারত তাহলে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় গর্জন করে বলে উঠতো, 'ধর্মের নামে শহীদ আমরা-আমরা সে সেই জাতি'।

এই শহীদি ও জেহাদী জাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ আল-কোরআনে যা বলেছেন তার আরো দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যেতে পারে। যেমন, আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাছুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন (তিনি) উহাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ'র সাক্ষ্যই যথেষ্ট' (সূরা- ফাতহ, আয়াত- ২৮)। আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ ওয়াদা (অংগীকার) করছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে (বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং সৎ কাজ করেছে, নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য প্রদান করবেন, যেমনভাবে তিনি তাদের পুর্ববর্তীদেরকে আধিপত্য দান করেছিলেন-- (তবে শর্ত এই যে,) তারা একমাত্র আমারই উপাসনা (এবাদত) করবে এবং আমার সহিত কোন অংশী স্থির করবে না (শেরেকি করবে না)।" (সূরা- নূর, আয়াত- ৫৪ অংশ)। মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগীকার করেছেন যা পরবর্তীতে অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল মুসলমানদের বিশ্ববিজয়ের মাধ্যমে।

আল্লাহর ওয়াদা চিরন্তন এবং কখনই ভঙ্গুর নহে। চিরস্থায়ী এই ওয়াদার উদ্দেশ্য ও বিধেয় জেনে বুঝে বর্তমানেও ওয়াদা প্রাপ্তদের সর্বপ্রকার দ্বিধাদ্বন্ধ পরিহার করে,

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী শক্তি সমূহের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ না হয়ে, পূর্বের সেই জেহাদী স্পিরিট/মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়।

সামনে অগ্রসর হতে হলে পিছনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে আনা প্রয়োজন। তখনকার সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহ'র ওয়াদা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের প্রকৃতি/ধরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বিশ্বব্যাপী বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলায় পথ নির্দেশ/ আলোকবর্তীকাবাহী হিসাবে কিছুটা হলেও কাজ করতে পারে বলে আমার ধারণা।

ইহা ছাড়া এ পুস্তকে বর্ণিত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবিত থাকাবস্থায় প্রতিশ্রুত ঘটনাসমূহ যা তাৎক্ষণিকভাবে বা তৎপরবর্তীতে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল তা থেকে মুসলিম/অমুসলিম সকলেই আল-কোরআনের মর্ম, রাছুল (ছাঃ)-এর জাহেরী ও বাতেনী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পরিচয় এবং রাছুল (ছাঃ)-কে আল্লাহর সরাসরি সাহায্য করার ধরণ/প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকেফহাল হতে পারেন এবং দুনিয়াতে আখেরাতে নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় করণীয় ও বর্জনীয় পথে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হতে কিছুটা অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম হলেই আমার এই গ্রন্থ লিখার প্রচেষ্টা সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

ইতি

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

আল-কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী
ও
প্রতিশ্রুতির বিস্ময়কর বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

"ই'লমুল গায়েব" তথা অজ্ঞাত/অদৃশ্যের সংবাদ/জ্ঞান সম্পর্কে কোরআন

'গায়েব' শব্দটি একটি আরবী শব্দ। শব্দটি আরবী হলেও এর পূর্নভাব ও অর্থসহ বাংলা ভাষাভাষী এদেশের মানুষের নিকট বহুল প্রচলিত এবং ব্যবহৃত। 'গায়েব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য যা দৃষ্টির অগোচরে। ইহা এমন বিষয়বস্তু যা অজানা, অজ্ঞাত, অনুপস্থিত, মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের অতীত, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং ইহা মানুষের জ্ঞানের সীমা পরিসীমারও উর্দ্ধে।

'ই'লম'/'ইলমুন' শব্দটিও একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলা ভাষায় এই শব্দটিও "এলেম" হিসাবে বহুল প্রচলিত এবং যে এই 'এলেম' লাভ করে বা হাসিল করে তাকে 'আলেম' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। একইভাবে যারা 'এলেম' সন্ধান, তালাশ বা আহরণে নিযুক্ত থাকে তাদেরকে 'তালেব-এ-এলেম' বলা হয়ে থাকে। এখন স্বভাবতই "ই'লমুল গায়েব" হচ্ছে উপরোল্লিখিত অজানা, অদৃশ্যের জ্ঞান। আর সেসব অজানা, অদৃশ্য গায়েবী জ্ঞানের অধিকারিই হচ্ছে "আ'লেমুল গায়েব"।

পক্ষান্তরে 'গায়েব'-এর বিপরীতে আরবী শব্দ হচ্ছে 'শাহাদাত' যা বাংলা ভাষায় প্রকাশ্য, দৃশ্যমান, উপস্থিত, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অন্তর্গত। গায়েব হচ্ছে ঃ

"মূলতঃ গায়েব বলতে বুঝায় কোন জিনিসের লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা, যা কিছুই দৃশ্যমান নয়- যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা তা-ই গায়েব" (কোরআনে নবুয়ত ও রিসালাত-মৌলানা আবদুর রহীম প্রণীত - পৃঃ ১৯৩)।

গায়েব দুই প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ একটি হচ্ছে পুরোপুরি গায়েব বা নিরংকুশ গায়েব, অপরটি হচ্ছে তুলনামূলক গায়েব বা আপেক্ষিক গায়েব। নিরংকুশ গায়েব হল যা কোনক্রমেই দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হবার নহে। আর আপেক্ষিক গায়েব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ বা তারতম্য হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির জন্য যা গায়েব/অদৃশ্য তা অপর কোন ব্যক্তির জন্য অদৃশ্যমান/গায়েব না-ও হতে পারে। যেমন, একটি কলেরার জীবাণু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে গায়েব বা অদৃশ্য। কিন্তু একজন প্যাথলজিষ্ট, যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগ জীবাণু পরীক্ষা করে থাকে, তার নিকট অদৃশ্যমান বা গায়েব নহে যদিও তা যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে আম, জাম, কাঠাল, শীল কড়ই, সেগুন বা বটগাছের বিচি সামনে রেখে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, এই বিচিগুলির প্রত্যেকটিই এক একটা প্রকান্ড বৃক্ষ যার কতকের মধ্যে আবার গায়েবী অবস্থায় রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ফল-মুল। মাটির সংস্পর্শে এসেই শুধু এগুলি প্রথমে চারা, পরবর্তীতে এক একটি বিরাট গাছে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র বিচিগুলিই ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য গাছপালা ও ফল-মূল।

www.pathagar.com

একইভাবে আসমানে ও জমিনে, ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে এমন অসংখ্য অদৃশ্য/গায়েবী বস্তু রয়েছে যা এক সময় গায়েব ছিল বর্তমানে আর গায়েব নাই, বা বর্তমানে গায়েব/অদৃশ্য অবস্থায় আছে ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে। বিজ্ঞানীদের নূতন নূতন আবিস্কারের ফলে হচ্ছেও তাই।

অধিকন্তু, এমন বস্তুও রয়েছে যা কোন সময়ই দৃশ্যমান হবে না বা হওয়া সম্ভবও নহে। এতব্যতিত অতীত/পূরাকালের বা ভবিষ্যতের এবং পরকালের বিষয়ও গায়েব/অদৃশ্যমানও অজানা ও অতিন্দ্রিয়। গায়েবী জ্ঞানের নিরংকুশ, একচ্ছত্র ও চূড়ান্ত অধিকারী ছাড়া এরূপ অদৃশ্য অজানা বিষয় সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানদান করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আল-কোরআনে গায়েব এবং গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে এবং অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ইহা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অজানা অদৃশ্য অর্থাৎ গায়েবী জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। অন্য কেহই এই জ্ঞানের অধিকারী নন এবং হতেও পারে না, এমনকি নবী রাছুলগণও নয়। তবে তিনি তাঁর মনোনীত নবী/রাছুল বা প্রিয় পাত্রদেরকে গায়েবী বিষয় যতটুকু জানান, অবহিত করান, ততটুক ব্যতিরেকে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহই যে দৃশ্য, অদৃশ্য, অজানা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী এ সম্পর্কে আল-কোরআনে উল্লেখিত আল্লাহর ঘোষণার কতিপয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল। উল্লেখ্য যে, আয়াতগুলি এতই সুস্পষ্ট যে এইগুলির প্রাসংগিক তফসীর উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

১। **তিনিই আল্লাহ যাকে ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নাই, তিনি "গায়েব" ও "শাহাদাত" - অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা-হাশর, আয়াত-২২)।**

২। **"(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, আসমান ও যমিনে কেহই গায়েব জানে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।" (সূরা- নমল, আয়াত-৬৫)।**

৩। **"গাযেব এর সমস্ত চাবি-কাঠি কেবল তাঁরই (আল্লাহরই) নিকট সংরক্ষিত তা কেউ জানে না, একমাত্র তিনি ছাড়া"। (সূরা আন-আম, আয়াত-৫৯)।**

৪। **"তোমাদের কি বলিনি যে, আসমান ও যমীনের 'গায়েব' আমিই জানি, আর জানি যা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর।" (সূরা বাকারা- আয়াত-৩৩)।**

৫। **'গায়েব' ও 'শাহাদাত' যা কিছু অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান সব কিছুর জ্ঞানেই জ্ঞানবান তিনি এবং তিনিই সুবিজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত (সূরা আন-আম- আয়াত-৭৪)।**

৬। **"নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের গায়েব সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানী (আলেম) এবং কেবল তিনি জানেন যাহা দিলসমূহে সংগোপনে (লুক্কায়িত) রয়েছে।" (সূরা-ফাতের- আয়াত- ৩৮)।**

www.pathagar.com

৭। "অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে গায়েব ও শাহাদতের (অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের) জ্ঞানীর (আল্লাহর) নিকট"। (সূরা- তওবা- আয়াত- ৯৪)।

৮। "এবং তোমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে গায়েব ও শাহাদতের আলেমের (আল্লাহর) নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল (কৃতকর্ম) সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।" (সূরা তওবা- আয়াত-১০৫)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ইহা পরিস্কার যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পর্কিত জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। অন্য কেহই এর অংশীদার নন। এমনকি নবী-রাছুলগণও গায়েবের খবর সম্পর্কে অবহিত নন বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে এর কতিপয় দৃষ্টান্ত দেয়া হল ঃ যেমন- রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জবানীতে কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

১। "আমি রাছুল (ছাঃ) যদি গায়েব জানতাম তবে নিজের জন্য অনেক বেশী কল্যাণ আয়ত্ত্ব করে নিতাম এবং কোন অনিষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো আর কিছুই নই, শুধু সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা আরাফ, আয়াত-১৭৭)।

২। "আর আমি (নবী করীম (ছাঃ)) তোমাদের বলছি না যে, আল্লাহর ধন ভান্ডারসমূহ আমার নিকট রয়েছে এবং আমি 'গায়েবও' অবহিত নই।" (সূরা হুদ-আয়াত-৩৯)।

৩। "যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাছুলগণকে একত্রিত করবেন, পরে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে ? তাঁরা সকলে বলবে ঃ আমাদের কিছুই জানা নেই, কেবল্ তুমিই- হে আল্লাহ্ সমস্ত গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত-১০৯)।

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ঠ যে সর্বশেষ মহানবী (সাঃ)ও নিজের থেকে গায়েবী খবর জানতেন না। তাঁকে আল্লাহ স্বয়ং প্রয়োজনীয় গায়েবী সংবাদ জানিয়ে দিতেন। উল্লেখ্য যে, কাফের-মুশরিকরা বিভিন্ন সময় রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অজানা, অজ্ঞাত ও জটিল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে নিজ থেকে চট করে ঐসব অজানা-অজ্ঞাত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে গায়েবী সংবাদ/অহি প্রাপ্তীর জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে অহি লাভের জন্য দিনের পর দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আল্লাহর নিকট থেকে গায়েবী সংবাদ পাওয়ার পরই শুধু তিনি সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আল-কোরআনের বিভিন্ন সূরা/আয়াতের "শানে-নজুল" বা সূরা নাজিলের পটভূমি থেকেই ইহা সুস্পষ্ট। আল-কোরআনের বহু আয়াত বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের/জিজ্ঞাসার জবাবে এবং বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নিকট অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যত কাল বলে ভিন্নভাবে কোন কালই নেই। তাঁর নিকট সমস্ত কালই বর্তমান কাল। অনুরূপভাবে আল্লাহর নিকট ডান/বাম বা অগ্র-পশ্চাত বলতেও কোন দিক নাই। তাঁর নিকট সব কিছুই বর্তমান এবং তাঁর সম্মুখে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে বিরাজমান ও সদা উপস্থিত। আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

"তিনি জানেন তাদের (অর্থাৎ সমুদয় সৃষ্টির) উপস্থিত অনুপস্থিত অবস্থাবলী, আর তাঁর এই সৃষ্টরা তাঁর এলেমের (জ্ঞানের) কোন বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না, তবে হাঁ, যে পরিমাণ (জ্ঞান প্রদান করতে) তিনি ইচ্ছা করেন (তা ছাড়া।") (সূরা বাকারা- আয়াত-২৫৫)।

"তিনি তো গায়েব অবহিত, স্বীয় গায়েব সম্পর্কে তিনি কাউকেই অবহিত করেন না সেই রাছুল ছাড়া যাঁকে তিনি (গায়েবী ইল্‌ম দেয়ার জন্য) পছন্দ করে নিয়েছেন। তখন তাঁর সম্মুখে ও পিছনে তিনি প্রহরা লাগিয়ে দেন যেন সে জানতে পারে যে, তারা তাদের রব্ -এর পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছে এবং তিনি তাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছেন এবং এক একটি জিনিষকে গুনে গুনে রেখেছেন।" (সূরা জ্বিন- আয়াত-২৫-২৬)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অদৃশ্যমান, অজ্ঞাত অতীতের অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ও গায়েবের অন্তর্গত। সুদূর অতীতের ঘটনাবলী যা ইতিহাস বা অন্য কোন মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সে সব বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তাঁর নবী-রাছুলগণকে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়াবলীও অতি চমকপ্রদভাবে জ্ঞাত করে দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে সুদূর অতীতের কতিপয় ঘটনা যা আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী হযরত রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১। হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও হযরত মরিয়মের কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

" ইহা গায়েব পর্যায়ের খবর, অহীর সাহায্যে আমরা ইহা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি এই লোকদের আশে-পাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা এই কথা ঠিক করার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল যে, মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে। আর না তুমি তখন উপস্থিত ছিলে যখন তারা ঝগড়া করতেছিল।" (সূরা ইমরান- আয়াত-৪৪)।

২। হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর কাহিনী বর্ণনার পর বলা হয়েছে –

"ইহা গায়েবের খবর, ওহীর সাহায্য ইহা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাদের (ইউসুফ (আঃ) -এর ভাইদের) পাশে কোথায়ও উপস্থিত ছিলে না , যখন তাঁরা নিজেদের কৌশলে একমত হয়েছিল এবং যখন তারা সেই কৌশল প্রয়োগ করতেছিল।" (সূরা ইউসূফ- আয়াত-১০২)।

www.pathagar.com

৩। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ) -এর বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"এই খবরাদি গায়েবের বিষয়। ইহা আমরা তোমাকে অহীর সাহায্যে জানিয়ে দিচ্ছি। এ বিষয়ে তোমার ও তোমার জাতির লোকদের কিছুই জানা ছিল না" (পারা ঃ ২০, সূরা হুদ- আয়াত-৪৯)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীরসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহতায়ালা গায়েবী বা অজানা অদৃশ্য খবরের পরিপূর্ণ, নিরংকুশ ও চূড়ান্ত অধিকারী হয়েও নবী রাছুলগণসহ তাঁর অন্যান্য প্রিয় পাত্রগণকে প্রয়োজনবশতঃ গায়েবী সংবাদ জানিয়ে দিয়ে থাকেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাছুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ)-কেও তেমনিভাবে অতীত, নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী ভবিষ্যতে অনিবার্য্যভাবে ঘটিতব্য অসংখ্য অজানা, অজ্ঞাত ঘটনা/বিষয়ে আল্লাহ অহির (কোরআনের) মাধ্যমে অথবা ভিন্নতর উপায়ে অবহিত করেছিলেন।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায় যে সকল ঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে অহির মাধ্যমে তাঁকে অগ্রিম জ্ঞাত করেছিলেন, পরবর্তীকালে সে সব ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকরভাবে তাঁর এবং সাহাবাগণের জীবদ্দশায় তাঁদের চোখের সম্মুখেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যে সকল কাফের-মুশরিক, মুনাফেক, নাসারা, খৃষ্টান, ইহুদী ঐ সব ঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে অবিশ্বাস/ সন্দেহ করত তারাও নিজ জীবনে, নিজ চোখেই সে সবের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে গেছে।

এতসব নিদর্শন নিজ জীবনে, নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করার পরও বা অবহিত হবার পরও যাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ থেকে গেছে অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ **"এবং যারা অবিশ্বাস করে•এবং আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে তারাই জাহান্নামের (নরকের) অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানে অবস্থান করবে"**। (সূরা বাকারা- আয়াত-৩৯)।

www.pathagar.com

আল-কোরআনে প্রদত্ত ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি/বাণী (ভবিষ্যদ্বাণী) সম্পর্কে খোদ কোরআন

মহা ঐশীগ্রন্থ আল্-কোরআনে মহান শ্রষ্ঠা আল্লাহ্তায়ালার বহু বাণী/ভবিষ্যদ্বাণী/ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে বলে খোদ কোরআনেই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল প্রতিশ্রুতি/ভবিষ্যদ্বাণী/ঘোষণা মহান প্রতিপালকের ওয়াদা মোতাবেক যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তাবায়িত হবে বলে খোদ কোরআন যে ঘোষণা দিয়েছে, তারই কতিপয় এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

১। **"এবং এই কোরআন যথার্থ সুনিশ্চত বাণী" (সূরা- হাক্কাহ, আয়াত-৫১)।** তাফসীর ঃ (হে কাফেরবৃন্দ) তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, বিশ্বাসী ও ধর্মভীরুগণের জন্য ইহা (কোরআন) সদুপদেশ ও কল্যাণকর এবং আমার এই অবশ্যম্ভাবি সুনিশ্চিত সত্য বাণী কখনই ব্যর্থ হবে না (তফসীরে কোরান শরিফ)।

২। **"ইহা আল্লাহ্রই অঙ্গীকার, আল্লাহ্ স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানব তা অবগত নহে"। (সূরা- রুম, আয়াত-৬)।**

৩। **"আল্লাহর বাক্যের (ঘোষণার) পবির্তন হয় না" (সূরা- ইউনুস, আয়াত-৬৪)।**

৪। **"আল্লাহ্র কথা/বাক্য কেহই পরিবর্তন করতে পারে না"। (সূরা- কাহাফ, আয়াত-২৭)।**

৫। **"তোমাদের নিকট প্রদত্ত ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে"। (সূরা- মুরসালাত, আয়াত-৭)।**

৬। **"নিশ্চয়ই তুমি ভংগ কর না অঙ্গীকার"। (সূরা- ইমরান, আয়াত-১৯৪)।**

৭। **"নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভংগ করেন না"। (সূরা- রায়াদ, আয়াত-৩১)।**

৮। **"প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে এবং অচিরেই তোমরা অবগত হবে"। (সূরা- আনআম, আয়াত-৬৭)।**

তফসীর ঃ দুর্বিনীত অবিশ্বাসীরা হযরত রাছুলুল্লাহ্কে এরূপ কথাও বলত যে, কবে আমাদের উপর (ঘোষিত) শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলুন, যদি বাস্তবিকই সেদিন শাস্তি উপস্থিত হয় তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস করে সত্যধর্ম গ্রহণ করব। তদুত্তরে আল্লাহ্তা'লা হযরত রাছুলুল্লাহ্কে (ছাঃ) বললেন- তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বলে দাও যে, আমি যা প্রচার করছি, তা নিশ্চয় সত্য। যদি তোমরা এই সত্য গ্রহণ না কর, তবে তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হব না এবং তোমাদিগকে স্বীয় অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদান সম্বন্ধেও আমার কোন দায়িত্ব বা অধিকার নাই। তবে ইহাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত, সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে উহা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং তখন তোমরা আল্লাহ্র বাণীর সত্যতা ও শাস্তির আস্বাদ উত্তমরূপেই অনুভব করতে পারবে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

www.pathagar.com

৯। **"হে মানবজাতি তোমাদেরকে যে সকল ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সত্য, কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে" (সূরা- ফাতির আয়াত-৫)।**

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ স্বয়ং স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তাঁর বাণী/প্রতিশ্রুতি/ওয়াদা/ঘোষণা অভ্রান্ত এবং তৎকর্তৃক ঘোষিত সংগঠিতব্য প্রত্যেক ঘটনাই যথাসময়ে সংগঠিত হবে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তবে আল্লাহ্'র প্রত্যেক ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যার জ্ঞান শুধু স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার নিকটই রয়েছে বলে আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ধরাতলে সময় সময় হেদায়েত তথা-শরিয়তী বিধানমালা/আসমানী কিতাব প্রেরণের আগাম ঘোষণা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা ধরাতলে তাঁরই খলিফা বা প্রতিনিধি তথা মনুষ্য জাতি প্রেরণের প্রাক্কালে বলে দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে সঠিকভাবে এবং তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবন পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য স্বয়ং স্রষ্টার তরফ থেকে সময় সময় হেদায়েত বা পথ নির্দেশ আসতে থাকবে। বিশ্ব-মাঝে মানুষকে স্রষ্টা প্রদর্শিত সুনির্দিষ্ট পথে চলার জন্যই পাথেয় বা বিধানমালা (জীবন বিধান) প্রেরণের এই ব্যবস্থা। বিধাতা প্রদর্শিত নিয়ন্ত্রিত জীবনের ব্যতিক্রম বা প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী যে কোন কর্মতৎপরতা স্রষ্টার নিকট শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দুনিয়াতে মনুষ্য প্রেরণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে বলে স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষকে আল-কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, **"আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার এবাদত ছাড়া অন্য কিছু করার জন্য সৃষ্টি করিনি"। (সূরা- যারিয়াত, আয়াত-৫৬)।** স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ অন্য এক জায়গায় বলেছেন, **"তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করছেন যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিকতর সৎকার্য্যকারী" (সূরা- মূলক, আয়াত-২)।** কোরআনের অনেক স্থানেই আল্লাহ্র বিশ্ব সৃষ্টি ও উহাতে মনুষ্য প্রেরণের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে- যা থেকে ইহা অত্যন্ত পরিস্কার যে, বিশ্বে মানুষকে স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন-যাপন করতে হবে। স্রষ্টার প্রদর্শিত পথে না চললে তার পরিণতি কি হবে তাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

১। **"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে (পৃথিবীতে) নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত (পথ নির্দেশ তথা-জীবন বিধান) পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) সে চিন্তাগ্রস্থ ও সন্তপ্ত হবে। আর যারা তা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে (আয়াতগুলোকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী (দোজখবাসী) অনন্তকাল**

www.pathagar.com

সেখানে তারা থাকবে"। (সূরা- বাকারা, আয়াত ৩৮-৩৯, (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

তফসীর ঃ অর্থাৎ আমি তাদের সবাইকে জান্নাত (বেহেশত) থেকে নীচে (পৃথিবীতে) নেমে যেতে বললাম (এবং সে সাথে জানিয়ে দিলাম যে) পরে (সেখানে) যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত (অর্থাৎ অহির মাধ্যমে কোন শরিয়তী বিধানমালা) পৌছে তখন যে ব্যক্তি আমার এই হেদায়েত অনুসরণ করবে তার কোন ভয়ের কারণ থাকবে না এবং পরিণামে সে সন্তাপগ্রস্থও হবে না। আর যারা কুফরী (অবিশ্বাস) করবে এবং আমার বিধানমালাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী (আগুনের অধিবাসী)। অনন্তকাল তারা সেখানে অবস্থান করবে (তফসীরে- মা'রেফুল কোরআন)।

ভূপৃষ্ঠে আদীমানব আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত কালে কালে, যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাছুল প্রেরণের মাধ্যমে সেই পূর্ব ঘোষিত পথ-নির্দেশ, জীবন-ব্যবস্থা বা শরিয়তী বিধানমালা প্রেরিত হয়েছে। আর আল-কোরআনই হচ্ছে মানবজাতির জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ্'র তরফ থেকে অবতারিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ পূর্নাংগ জীবন বিধান তথা-মহাঐশী গ্রন্থ।

অতএব, দেখা যায় যে, আসমানী কিতাব বা নাজিলকৃত (অবতারিত) ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ নহে, বরং ধরাতলে মনুষ্য আগমনের সূচনা লগ্ন থেকেই ঐশীগ্রন্থ/ছহিফা (ছোট আকারের ঐশীগ্রন্থ) সমসাময়িক কালের চাহিদা/প্রয়োজন মোতাবেক নাজিল হয়ে আসছিল।

পৃথিবীতে স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আসমানী কিতাব নাজিলের চিরন্তন নিয়মনীতি এই যে,যখনই কোন মানব সমাজ বা মানব গোষ্ঠী অভিশপ্ত শয়তানের ধোকাবাজীতে পড়ে জড়জগতের মহব্বতে বা পার্থিব জীবনের লোভ-লালসায় অথবা নফ্স্ তথা-প্রবৃত্তির তাড়নায় আসক্ত হয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে একমাত্র স্রষ্টা ও উপাস্য আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে এবং একমাত্র তাঁর উপাসনা বা এবাদত করার পরিবর্তে মনুষ্য সৃষ্টি ও মনুষ্য কল্পিত বিভিন্ন প্রকার মূর্তী ও পশুপক্ষি, দেবদেবী, প্রতিমা, জ্বিন-পরী অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ত, কুফরী, শেরেকী, মুনাফেকিতে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে অত্যাচার-অনাচার ব্যাভিচার অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ত, তখনই মহান আল্লাহ্ নবী-রাছুলগণের মাধ্যমে মানুষের ইহকাল ও পরকালের মংগলের জন্য চলার পথের পাথেয় স্বরূপ আসমানী কিতাব বা শরিয়তী বিধানমালা প্রেরণ করে থাকতেন।

নবী-রাছুল ও তাঁদের মাধ্যমে সৎপথ/হেদায়েত বা শরিয়তী বিধানমালা প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন ঃ

২। **"আর ইহা আমি নাজিল করেছি এই জন্য যাতে এমন যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর যখন কোন মুসীবত এসে পড়বে**

www.pathagar.com

তখন বলবেঃ হে রব (তুমি আমাদের প্রতি কোন রাছুল পাঠালে না কেন, তাহলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম"। (সূরা- কাছাছ, আয়াত- ৪৭)।

নবী-রাছুলগণের প্রদত্ত শিক্ষা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং উহাতে গুমরাহীর বিষয়াদি মিলেমিশে এমনরূপ ধারণ করে যে, উহা দ্বারা হেদায়েত (সৎপথ) লাভ করা আর সম্ভব নয়, তা হলে, তখন লোকদের পক্ষে এই ওজর পেশ করার সুযোগ হয় যে, হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) পার্থক্য করার ও সঠিক নির্ভুল পথ বলে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কাজেই আমাদের পক্ষে হেদায়েত লাভ সম্ভব হয় নাই। এ ওজর পেশ করার পথ বন্ধ করার জন্যই এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা নবী-রাছুলগণ পাঠিয়ে থাকেন, যেন অতঃপর যে ব্যক্তিই ভুল পথে চলবে তাকে তার নিজের ভুলের জন্য দায়ী বানানো যায়। (তফসীরে- মা'রেফুল কোরআন)।

অর্থাৎ বিশ্ব- মাঝে মনুষ্য প্রেরণের পর থেকেই যুগে যুগে, কালে কালে মানুষকে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট সু ও সৎ পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে। সঠিক পথের সন্ধান না দিয়েই সে পথ অনুসরণের কথা বলা বা নির্দেশ দেয়া যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে মানুষের জন্য এরূপ একটি ওজর, আপত্তি বা বাহানা পেশের সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে যে, কোন পথে চলতে হবে তা তো জানতে পারলাম না। এ অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হয়, মানুষ যাতে বিধান মোতাবেক সৎপথে না চলার কোন বাহানা পেশ করতে না পারে, সেজন্যই যুগে যুগে মানুষকে স্রষ্টার দেখানো পথে চলার নিমিত্তে আসমানী কিতাব বা শরিয়তী বিধানমালা প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেন, **"মানুষকে পথ দেখানোর দায়িত্ব আমারই"। (সূরা- লাইল, আয়াত-১২)**। তা ছাড়া সঠিক পথ অনুসরণ না করার কারণে নিজেদের কৃত অপকর্মের প্রতিফল স্বরূপ কোন মুসিবত, শাস্তি বা বিপত্তি এসে পড়লে যাতে অজ্ঞাত থাকার কোন ওজর পেশ করার কোন সুযোগ না থাকে, সে জন্যও তাকে যথাসময়ে যথাযথভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, ইসলামে জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা দায়িত্বহীনতার নামান্তর যা অগ্রহণীয় ও অমার্জনীয় বলে বিবেচিত।

মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে এভাবে যুগে যুগে অসংখ্য নবী/রাছুল বিশ্ব-মাঝে প্রেরিত হয়েছে। যাদের মাধ্যমে যুগে যুগে এসব জীবনবিধান, আসমানী কিতাব বা শরিয়তি বিধানমালা প্রেরিত হয়েছে তাদের কতকের নাম আল্লাহ্তায়ালা আল-কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এসেছিলেন শুধু তাঁদের নিজেদের নির্দিষ্ট গোত্রের বা সম্প্রদায়ের জন্য বা সমসাময়িক কালের জন্য। কিন্তু সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাছুল হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এসেছিলেন সর্বকালের সর্ব মানুষের জন্য বিশ্বনবী হিসাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে সর্বশেষ নবী হিসাবে ঘোষণা করে বলেন, **"মোহাম্মদ তোমাদের অন্তর্গত কোন লোকের (পুরুষের) পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাছুল এবং নবীগণের শেষ এবং আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী" (সূরা- আহযাব, আয়াত-৪০)।**

উপরোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-ই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন পরবর্তী সর্বকালের সর্ব মানুষের জন্য। আল-কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই রাছুল, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাছুলের কতিপয় সুস্পষ্ট ঘোষণা এখানে উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্ বলেন (রাছুল (ছাঃ) -এর জবানীতে) ঃ

১। **"হে মানুষেরা। আমি তোমাদের সকলের প্রতিই আল্লাহ্র রাছুল (ছাঃ) হিসাবে প্রেরিত।" (সূরা- আরাফ, আয়াত-১৫৮)।**

২। **"এই কুরআন আমার (রাছুলের) প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে, যেন উহার সাহায্যে আমি ভয় দেখাই তোমাদের এবং আর যার নিকট ইহা পৌছবে তাকে।" (সূরা- আনআম, আয়াত-১৯)।**

৩। **"আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি"। (সূরা- সাবা, আয়াত-২৮)।**

৪। **এবং আমরা তোমাকে সমগ্র জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। (সূরা- আম্বিয়া, আয়াত-১০৭)।** নবী করিম (ছাঃ) এই কথাটিই বারবার নিজের ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন, **"হে মানুষেরা কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ সকলের প্রতিই আমি প্রেরিত হয়েছি।"** নবী করিম (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন ঃ

১। পূর্বে একজন নবী তাঁর নিজের লোকদের/গোত্রের নিকট বিশেষভাবে প্রেরিত হতেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি। (বুখারী, মুসলিম)।

২। তিনি আরও বলেছেন ঃ আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছি, আর আমার আগমনে নবীগণের আগমন বন্ধ ও সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। (মুসলিম) (তফসীরে-তাফহীমুল কোরআন)।

পূর্বে নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে হযরত দাউদ (আঃ) -এর উপর নাজিলকৃত 'যবুর', হযরত মুছা (আঃ) -এর উপর নাজিলকৃত "তৌরাত" এবং হযরত ঈছা (আঃ) (যীশু খৃষ্টের) উপর নাজিলকৃত "ইন্জিল" বা বাইবেল। পূর্বে নাজিলকৃত ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে হিন্দুদের বেদ/পুরানও থাকতে পারে, যদিও তাদের এসব ধর্মগ্রন্থ কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে, কার উপর অবতারিত/নাজিল হয়েছিল বা আদৌ নাজিল হয়েছিল কিনা তা উহার অনুসারী খোদ হিন্দুরাও সুস্পষ্টভাবে কোন ধারণা দিতে

www.pathagar.com

পারে না। তবে এসব গ্রন্থ অবতারিত বা নাজিল হবার একটা স্পষ্ট লক্ষণ এই যে, এসব ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) -এর পৃথিবীতে আগমনী-বার্তা অতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক/পাঠিকাকে জনাব মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা সাহেব কর্তৃক প্রণীত "পর ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)" গ্রন্থখানি পড়ে দেখার জন্য আহবান জানাচ্ছি যার মধ্যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশদভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অবতারিত ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র আল-কোরআন ছাড়া অন্য কোন ঐশী গ্রন্থই বর্তমানে সম্পূর্ণ আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় আর নাই। সেগুলি যুগে যুগে, কালে কালে মানুষের হস্তক্ষেপের পর হস্তক্ষেপ, অনুবাদের পর অনুবাদিত হয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরিত হয়ে উহাদের আদি ও আসল রূপ বহু পূর্বেই বিলীন হয়ে গেছে। শুধু তাই নহে, যে ভাষায় ঐসব ধর্মগ্রন্থ নাজিল হয়েছিল সেসব আদি ভাষার অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কিনা তাও কেহ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কিন্তু আল-কোরআন এরূপ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোরআন সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ- মুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট, অক্ষয়, অম্লান ও নির্ভুল রয়েছে এবং চিরকালই স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক নিরাপদে সংরক্ষিত থাকবে বলে ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ- **"আমিই এ উপদেশ গ্রন্থ নাজিল করেছি এবং আমিই এর সুনিশ্চিত সংরক্ষক"**। **(সূরা- হিজর, আয়াত-৯)**। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল-কোরআনই হচ্ছে সর্বশেষ অবতারিত গ্রন্থ এবং উহা নাজিল হয়েছে উহা নাজিলের পরবর্তী সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য। **"ইহা তো সমগ্র বিশ্বের জন্য মহান উপদেশ"**। **(সূরা- তাকভীর, আয়াত-২৭)**। কোরআন হচ্ছে প্রতিশ্রুত নবীর উপর প্রতিশ্রুত ঐশী-আসমানী কিতাব। কারণ শেষ নবী (ছাঃ) এবং সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থের অবতরণ বার্তা অন্যান্য অবতারিত গ্রন্থসমূহে পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছিল যা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ **"এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রাছুল আগমন করবে, আমি (ঈশা আঃ) তার সুসংবাদ প্রদানকারী"**। **(সূরা- ছফ, আয়াত-৬)**।

সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ কোরআন নাজিল হবার পর উহার পূর্বের বা পরের সকল ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থই বাতিল ও রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে সেগুলি আর অনুসরণীয় বা অনুকরণীয় নহে। যেটা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন ঃ **"আমি কোরআন নাজিল করেছি সমগ্র বিশ্বের জন্য সদুপদেশ ব্যতিত নহে" (সূরা- কলম, আয়াত-৫২)**। কাজেই পূর্ববর্তী গ্রন্থের ন্যায় কোরআন কোন গোত্র, দল বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয় নাই বরং ইহা সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে আল্লাহ আরও বলেন ঃ **"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম"**। **(সূরা- ইমরান, আয়াত-১৯ অংশ)**।

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ- **"হে বিশ্বাসীগণ তোমরা প্রকৃত ভীতিসহকারে আল্লাহ্কে ভয় কর, আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ো না" (সূরা- ইমরান, আয়াত-১০২)**।

আল্লাহ আবারো বলেন ঃ **"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য 'ইছলামকে' তোমাদের একমাত্র দ্বীন হিসাবে কবুল করে দিয়েছি"**। (সূরা- মায়েদা, আয়াত-৩ (অংশ)।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীর থেকে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, স্রষ্টা পৃথিবীতে মনুষ্য প্রেরণের পর তার চলার পথের পাথেয় স্বরূপ হেদায়েত বা শরিয়তী বিধানমালা প্রেরণের যে আগাম ঘোষণা দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তাবায়িত হয়েছে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর মাধ্যমে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল-কোরআন' প্রেরণের/নাজিলের উক্ত ঘোষণার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং এর মাধ্যমে একমাত্র ইসলাম ছাড়া, নূতন কোন দ্বীন, ধর্ম, পথ বা মতাদর্শ, ইজম প্রবর্তনের ধারা চিরতরে রুদ্ধ ও রহিত হয়ে গিয়েছে।

এভাবেই যুগে যুগে, কালে কালে ধরাপৃষ্টে মানুষের জন্য হেদায়েত প্রেরণের আল্লাহ্র উল্লেখিত অগ্রিম ঘোষণাটি অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর উপর গুরুভার ও দুর্বহ কালাম (কোরআন) নাজিল হতে যাচ্ছে বলে অগ্রিম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বয়স ৪০বৎসর পুরো হবার সাথে সাথে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। 'হেরা' পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় অহি বাহক জিবরাইল (আঃ) এসে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম সূরা 'ইকরার' ৫টি আয়াত প্রদান করেছিলেন। প্রথম অহি সূরা ইকরার উপরোক্ত আয়াতগুলি কিভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রদান করেছিলেন তা হাদিস গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, আকস্মিকভাবে জিবরাঈল (আঃ) এসে যখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন 'পড়' তখন তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবেই বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না"। প্রথম প্রচেষ্টায় অহি গ্রহণ করাতে সক্ষম না হওয়ায় পরবর্তী প্রচেষ্টায় জীবরাঈল (আঃ) ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাঁকে সক্ষম করে তুলেন এবং উল্লেখিত আয়াতসমূহ গ্রহণ করান। প্রথম অহি প্রাপ্তির ঘটনার আকস্মিকতায় রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বিস্ময়ে এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছুটে গিয়ে তাঁরই সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন হজরত খাদিজা (রাঃ)-কে বলেছিলেন "আমাকে ঢাক, আমাকে ঢাক"। রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) সুস্থির হলে ঘটনাটি সম্পর্কে জানার জন্য খাদিজা (রাঃ) -এর চাচাত ভাই নওফলের কাছে যান। উক্ত ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম অহি নাজিলের ঘটনাটি ছিল রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকট সম্পূর্ণ আকস্মিক। অর্থাৎ অহি বা কোরআন নাজিলের ব্যাপারটি তিনি পূর্ব থেকে মোটেই অবহিত ছিলেন না। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৪০ বৎসর পর্যন্ত তাঁর মুখে কেহ কখনও শুনে নাই বা তাঁর আচার-আচরণে গুণাক্ষরেও ইহা প্রকাশ পায় নাই বা ইহা কেহ একটুকুও আঁচ করতে পারে নাই যে, এই লোকই শেষ নবী হতে যাচ্ছেন অথবা তাঁর উপরই সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ 'আল-কোরআন' নাজিল হতে যাচ্ছে। আর আল্লাহ্ও অহি/সূরা নাজিলের প্রাথমিক অবস্থাই তাঁকে বলে দিতেন না যে, আমি আপনার উপর **"ভারী কালাম নাজিল করতে যাচ্ছি" (সূরা- মুজাম্মেল আয়াত-৫)**। এবং সে সাথে উহা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিতেন না। যা সংশ্লিষ্ট সূরায় বর্ণিত হয়েছে। (সংশ্লিষ্ট সূরা/আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীর, শানে নজুলসহ)।

১। "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ২। অল্পাংশ ব্যতীত নিশীথে দন্ডায়মান হও। ৩। অর্ধাংশ অথবা উহা অপেক্ষা কিছু কম কর। ৪। অথবা তদপেক্ষা বর্ধিত কর এবং তরতীলের সহিত ধীরে ধীরে কোরআন আবৃত্তি কর। ৫। নিশ্চয় আমি অচিরেই তোমার প্রতি গুরুভার বাণী প্রেরণ করব। ৬। নিশ্চয় রাত্রে গাত্রোত্থান করা একান্ত আত্মসংযম ও বাক্য সংশোধনকারী। ৭। নিশ্চয় দিবসে তোমার জন্য বিষয়-কর্ম রয়েছে। ৮। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর প্রতি সংক্ষিপ্ত হও" (সূরা- মোজাম্মেল আয়াত ১-৮)। শানে নজুলসহ তফসীর ঃ

শানে নজুল (সূরা অবতীর্ণের পটভূমি) ঃ (ক) হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জোবায়ের, বায়হাকী প্রমুখ হাদিস বেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই পবিত্র সূরা মক্কা

www.pathagar.com

শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। একদা অবিশ্বাসী কোরেশগণ 'দার-উন্-নদুয়ায়' (পরামর্শ কক্ষে) সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, লোকে যাতে হযরত মুহাম্মদের কথা শুনে বিশ্বাস না করে, তজ্জন্য তাঁর কোন হীনতাজ্ঞাপক বিকৃত নাম স্থির করা হউক। তদনুসারে কেহ তাঁকে 'কাহেন' অর্থাৎ (কাহিনীকার) 'গণক', কেহ 'মজনুন' অর্থাৎ উন্মাদ এবং কেহ 'ছাহের' অর্থাৎ 'যাদুকর' বলে অভিহিত করবার জন্য মত প্রকাশ করল, কিন্তু ইহারা কোন উপাধিই সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করতে না পারায় অবশেষে তারা উঠে চলে গেল। হযরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) কোরেশদিগের এই দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র অবগত হয়ে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হলেন এবং মনের দুঃখে সুদীর্ঘ চাদরে দেহ আবৃত করে শুয়ে পড়লেন। সেই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্বোধনপূর্বক বললেন– হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ, উঠ এরূপ ক্ষুন্নমনে শুয়ে থেকো না। বরং তুমি রজনীর অধিকাংশ সময় দন্ডায়মান হয়ে উপাসনা কর। কারণ অচিরেই তোমার প্রতি অতি কঠোর কর্তব্যস্বরূপ সুমহান আল্লাহ্র বাণী (প্রেরণ) ও প্রচারের গুরুভার অর্পিত হবে। ফলতঃ উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষেই হযরত রাছুলুল্লাহ্র প্রতি নবুয়তের সুমহান দায়িত্ব অর্পনের স্বর্গীয় সুসংবাদসহ এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সূরার প্রথমেই করুণাময় আল্লাহ্তায়ালা, হযরত জিবরাঈল প্রমুখ তাঁর প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে বলছেন যে, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ, অবিশ্বাসীদের অলীক (অসার) উক্তিতে ক্ষুন্ন হয়ে তুমি এরূপভাবে শুয়ে থেকো না, বরং তুমি রজনীর অধিকাংশ সময় দন্ডায়মান হয়ে আমার উপাসনা কর। কিন্তু যদি তুমি অধিকাংশ রজনী জাগ্রত থেকে, দন্ডায়মান অবস্থায় উপাসনা করতে সমর্থ না হও তবে রজনীর অর্ধাংশ অথবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী বা কম সময় দন্ডায়মান হয়ে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে পবিত্র কোরআন আবৃত্তি কর। কারণ অচিরেই আমি তোমার প্রতি আমার রছুল ও নবীরূপে মনোনতী করব এবং তোমার উপর সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতির মধ্যে সত্যধম প্রচারের গুরুতর দায়িত্ব অর্পন করব। হে রাছুল, এই কঠোর কর্তব্য ও গুরুভার দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য তোমাকে অতি কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি করে নিতে হবে। কিন্তু শুধু দিবসে উপাসনা-আরাধনা করে তুমি কখনই নবুয়তের এই গুরুভার কঠোর কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অথবা পূর্ণ শক্তি অর্জন করতে পারবে না। কারণ দিবসে তোমাকে ধর্ম-কর্ম ও সংসার জীবনের আরও বহু অপরিহার্য কর্তব্য পালন করতে হবে। অতএব তুমি অলস নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত না করে তোমার মহান প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও এবং সেই সর্বশক্তিমান সর্বজগতের অধিপতি ও প্রতিপালক সুমহান প্রভুর নামের মহিমা বর্ণনাপূর্বক কাহারও কোন বানোয়াট কথা না শুনে এবং সংসার জীবনের সমস্ত যশ-মান, কামনা-বাসনা ও সুখ-সম্পদ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পনপূর্বক তাঁকেই নিজের পূর্ণ প্রতিভূরূপে পরিগ্রহণ কর। তিনি ভিন্ন জগতে আর কোন উপাস্য নাই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে নবুয়তের কর্তব্য পালনের পূর্ণ শক্তি প্রদানপূর্বক তোমার সাধনাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমন্ডিত করে দেবেন।' (তফসীরে- কোরান শরিফ)।

www.pathagar.com

(খ) "আমরা তোমার উপর একটা দুর্বহ কালাম নাযিল করব" -এ কথার তাৎপর্য হল রাত্রিকালে নামাজ পড়ার এ নির্দেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, আমরা একটা 'ভারী ও দুর্বহ বাণী' তোমার উপর নাজিল করতেছি, যার বোঝা বহনের শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্ট ও সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। আর এ শক্তি তোমার মাঝে অর্জিত ও সঞ্চারিত হতে পারে এভাবে যে, তুমি রাত্রিকালে নিজের বিশ্রাম পরিহার করে উঠবে এবং নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে, আর অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত কিংবা উহার কিছু কম বা কিছু বেশী সময় ইবাদতে অতিবাহিত করে দিবে। কোরআন মজিদকে 'ভারী দূর্বহ বোঝা' বলা হয়েছে। এর আর একটি কারণ হল, এর আদেশ ও বিধানসমূহ পালন করা উহার উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে উহার বাস্তব রূপ দেখিয়ে দেয়া, উহার দাওয়াত নিয়ে সমগ্র বিশ্বের বিপরীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাওয়া, উহাতে বলে দেয়া আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-মতবাদ, নৈতিকতা ও আচার-আচরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমগ্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করা, এমন একটা মহা সাধনা যার অপেক্ষা বড় ও দুঃসাধ্য কাজ কল্পনাও করা যায় না। উহাকে দুর্বহ কালাম বলার আরও একটি কারণ রয়েছে। উহার নাজিল হওয়াটা ও উহাকে নিজের মধ্যে ধারণ করা অতিশয় কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেছেন ঃ একবার রাছুলে করীমের (ছাঃ) -এর উপর অহী নাজিল হচ্ছিল। এ সময় তিনি স্বীয় উরু আমার উপর রেখে শয়ন করেছিলেন। তখন আমার উরুর উপর এমন চাপ অনুভব করলাম যাতে উহা চুর্ণ হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা হচ্ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি তীব্র তুহিন শীতকালেও নবী করীমের (ছাঃ) -এর উপর অহী নাজিল হতে দেখেছি। তাঁর কপোলদেশ থেকে এ সময় ঘাম ঝরে পড়তেছিল'। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)।

অপর একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাছুলে করীম (ছাঃ) উষ্ট্রির উপর আরোহণ থাকা অবস্থায় তাঁর উপর অহী নাজিল হতে থাকলে উষ্ট্রি স্বীয় বক্ষ মাটির সহিত মিশিয়ে দিত এবং অহী নাজিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত উষ্ট্রিটি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতে পারত না। (মুসনাদে আহমদ, হাকেম, ইবনে জরীর) (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

সূরা মুজাম্মেলের উপরোক্ত আয়াতসমূহের তরজমা ও বিস্তারিত তফসীরসমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে অহি/কোরআন অবতরণ শুরু হবার অতি প্রাথমিক পর্যায়েই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রিম জ্ঞাত করে দিলেন যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর উপর এক 'গুরুভার কালাম' আল্লাহ্'র ভাষায় " কাউলান সাকিলান" অর্থাৎ মহাঐশী গ্রন্থ 'আল-কোরআন' অবতরণ নাজিল করতে যাচ্ছেন। সে সাথে ইহাও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের ইহ ও পরকালীন জীবনের পাথেয় স্বরূপ এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা শরিয়তী বিধানমালা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাঁকে কিরূপভাবে শারিরীক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

অহী/কোরআন/কোরআনের আয়াত নাজিল হবার শুরুতেই শীঘ্রই "তোমার উপর প্রাপ্তির পর পরই গুরুভার ভারী কালাম নাজিল হতে যাচ্ছে," রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকট এরূপ অগ্রিম ঘোষণা দেয়ার বা প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে আল-কোরআনের মত একটা মহাঐশী গ্রন্থ যে তাঁর উপর নাজিল হতে যাচ্ছে এবং তাঁর উপরই যে সর্বশেষ নবীর দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন না, যদিও তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই নবুয়তের যাবতীয় গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

হেরা পর্বতের সেই নির্জন নিভৃত গুহায় যেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করতেন, সেখানে যখন সর্বপ্রথম অহি তথা সূরা 'ইকরার' ৫টি আয়াত নাজিল হল, তখন তিনি ঘটনার আকস্মিকায় এতই বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছুটে গিয়ে তাঁরই সহধর্মিনী বিবি খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন, "আমাকে ঢাকো, আমাকে ঢাকো।" বোখারী শরীফে ঘটনাটি যেভাবে উল্লেখ আছে তা এরূপ ঃ

"ভয়াল দৃশ্যে এবং অহীর চাপে ও ফেরেশতা জিব্রাইলের আলিংগন-সৃষ্ট শিহরণ এবং বিশাল দায়িত্বের গুরভারবোধে সৃষ্ট শংকা ও ভীতিসহ হেরা গুহার সর্বপ্রথম অবতারিত, **"ইকরা বিস্‌মে রাব্বিকাল্লাজি খালাকা---"** পবিত্র কোরআনের পাঁচটি আয়াত নিয়ে নবীজী মোস্তফা (ছাঃ) গৃহে ফিরে আসলেন এবং গৃহের লোকজনসহ খাদিজা (রাঃ)-কে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমাকে আবৃত কর- আমাকে আবৃত কর।' গৃহের সকলে নবীজী (ছাঃ) -কে কম্বলে আবৃত করে দিলেন। ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর শিহরণ ও কম্পন দূরীভূত হল। তিনি স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন- 'হে খাদিজা! অসাধারণ আশ্চার্য্যজনক অবস্থা আমার উপর প্রবর্তিত হয়েছে। এই বলে সকল বৃত্তান্ত তিনি খুলে বললেন।' (বোখারী শরীফ- ৫ম খন্ড, সীরাতুন্নবী সংকলন- পৃঃ ১২০-১২১)।

দীর্ঘকালব্যাপী অহীর মাধ্যমে 'আল-কোরআনের' মত একটা মহাঐশী গ্রন্থ বা আসমানী কিতাব যে তাঁর (ছাঃ) -এর উপর নাজিল বা অবতাড়িত হতে যাচ্ছে এবং তিনি যে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন অথবা তাঁকে যে অনবহিত/অজ্ঞাত রাখা হয়েছিল তার স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন, **'হে রাছুল! আপনি তো জানতেন না কিতাব কাকে বলে (এবং) ঈমান কি জিনিস'। (সূরা-শূরা, আয়াত-৫৩)**। তফসীর ঃ

অর্থাৎ নবুয়তের মর্যাদায় অভিসিক্ত হবার পূর্বে নবী করিম (ছাঃ) -এর মনে এ ধারণা কখনো আসে নাই যে, তাঁকে কোন কিতাব দেয়া হবে বা তাঁর কোন কিতাব পাওয়া উচিৎ। তিনি আসমানী কিতাব ও উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান তো ছিল, কিন্তু আল্লাহর সম্পর্কে মানুষের কি কি বিশ্বাস করা ও মেনে চলা উচিৎ তা বিস্তারিতভাবে ও সচেতনভাবে তাঁর জানা ছিল না। সে সংগে ফিরিশ্‌তা, নবুয়ত, আল্লাহ্'র কিতাব ও পরকাল সম্পর্কেও যে অনেক কথা মেনে নিতে হবে তাও তাঁর জানা ছিল না। এই দুটি কথা এমন, যে বিষয়ে মক্কার

www.pathagar.com

কাফেরগণও অনবহিত/অজ্ঞাত ছিল না। মক্কার কোন ব্যক্তিও এই সাক্ষ্য দিতে পারে না যে, নবুয়তের আকস্মিক ঘোষণার পূর্বে নবী করিম (ছাঃ) -এর মুখ থেকে কখনো আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন উল্লেখ শুনতে পেয়েছে কিংবা লোকদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে ঈমান আনতে হবে সে সম্পর্কিত কোন কথা শুনতে পেয়েছে। কেননা কোন ব্যক্তি যদি নবী হবার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে তা হলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দিন রাতের সংগী সাথীরা তাঁর মুখ থেকে কখনো কিতাব ও ঈমানের শব্দও শুনতে পাবে না, আর বয়স চল্লিশ পার হবার পর সহসা সে এসব বিষয়ে ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা-ভাষণ শুরু করে দেবেন ইহা কিছুতেই হতে পারে না। (তফসীরে- তাফহীমুল কোরআন- ১৪ খন্ড)

উপরোক্ত তফসীর থেকে ইহা স্পষ্ট যে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) নিজে এবং তাঁর সমসাময়িক লোকজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁর নবুয়ত বা তাঁর উপর যে কোরআন নাজিল অথবা কোরআনের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে সর্বশেষ আসমানী কিতাব বা শরিয়তী বিধান মালা প্রেরিত হতে যাচ্ছে তা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন না। তিনি সর্ববিধ বিবেচনায় তৎকালীন আরব সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ফলে 'আইয়ামে জাহেলীয়াত' বা অজ্ঞতার অন্ধকার যুগেও তাদের মধ্য থেকেই তিনি "আল-আমীন" উপাধী পেয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়া যায় সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন বটে, কিন্তু তিনি যেন প্রকৃত পথের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। আল্লাহ্ বলেন, **"আল্লাহ্ আপনাকে তো পথহারা বা পথ অনুসন্ধিৎসুরূপে পেয়েছেন (এবং পরে) পথের সন্ধান দিয়েছেন"**। **(সূরা- দোহা আয়াত-৭)**।

উল্লেখিত বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন নাজিলের ঘটনাটি অ-প্রকাশিত ছিল এবং তাঁর ৪০ বৎসর পূর্তির পর পরই যথাসময়ে যথাযথভাবে উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালা আগাম জানিয়ে দিলেন যে, (তিনিই আল্লাহ'র মনোনীত (রাছুল) এবং তাঁর উপরই 'গুরুভার' -কোরআন ('কাউলান সাকিলান') -(গুরুভার-বাণী/কালাম) নাজিল হতে যাচ্ছে। ফলে নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর ২৩ বছরব্যাপী জীবনে পর্যায়ক্রমে নাজিলকৃত মানব জাতির জন্য পূর্নাংগ জীবনবিধান মহাঐশী গ্রন্থ 'আল কোরআনই' হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপরোক্ত অগ্রিম ঘোষণার প্রত্যক্ষ ও বিস্ময়কর বাস্তবায়ন।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে আল-কোরআনের সূরা-আয়াত মুখস্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়ে দেয়ার চাঞ্চল্যকর ঘোষণা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আরবীতে যাকে বলে "আশরাফুল মাখলুকাত"। সৃষ্টির সেরা এই মানুষেরাও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রভেদের সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের 'জ্ঞান'। আর এই জ্ঞানবান মানুষের আর একটি বড় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার স্মরণশক্তি এবং কল্পনা বা পরিকল্পনাশক্তি। মানুষের এই বিশেষ গুণ স্মরণশক্তির বলে মানুষ অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলী বর্তমানে এবং বর্তমানে সংঘঠিত ঘটনাবলী পরবর্তীতে স্মরণ করতে সক্ষম। ইহা ছাড়া তার কল্পনাশক্তির বদৌলতে সে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কল্পনা/পরিকল্পনা করতেও সক্ষম। আবার মানুষে মানুষে স্মরণশক্তির মধ্যেও তারতম্য বা প্রভেদ রয়েছে। অর্থাৎ সকল মানুষের স্মরণশক্তি সমান নহে। কারো স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর আর কারো স্মরণশক্তি তুলনামূলকভাবে কম ও দুর্বল। সাধারণতঃ অল্প বয়সের লোকদের চেয়ে বেশী বয়সের লোকদের স্মরণশক্তি কম বা দুর্বল হয়ে থাকে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় একটি অল্প বয়সের ছেলে/মেয়ে অধিক বয়সের একজন লোকের চেয়ে অল্প সময়ে কোন পাঠ/বিদ্যা বা বিষয় মুখস্ত করতে এবং স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়। বাস্তবক্ষেত্রে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, অল্প বয়সের ছেলে/মেয়েরা পাঠ্য পুস্তকের কবিতা/গল্প বা কোরআনের সূরা, আয়াত যত তাড়াতাড়ি এবং যত সহজে মুখস্থ করতে এবং বলতে পারে, একজন বেশী বয়স্ক বা বৃদ্ধ লোক তত সহজে তা করতে পারে না।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে সৎপথ (হেদায়েত) প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে নবী রাছুলগণের উপর শরীয়তি বিধানমালাস্বরূপ আসমানী কিতাব/গ্রন্থ নাজিল করেছেন। এইসব আসমানী কিতাব বা অবতারিত গ্রন্থসমূহ পুরোটাই একদিনে বা এক রাত্রে নাজিল করে দেন নাই। বিশেষ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাছুল হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর উপর আল-কোরআন নাজিল করেছেন তা পূর্ণ হতে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর সময় লেগেছে। ইহা সূরা/আয়াত আকারে অল্প অল্প করে প্রয়োজানুসারে নাজিল করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ইহা একটি অবতারিত ঐশী মহাগ্রন্থ এবং ফিরিশতা জীবরাঈল (আঃ) -এর মাধ্যমে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ইহার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সূরা/আয়াতসমূহ গ্রহণ করতেন, সেহেতু স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় কোরআনের ক্ষুদ্র/বৃহৎ সূরা/আয়াত গ্রহণ করতেন। প্রশ্নটি অত্যন্ত ঘোরতর। কারণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়স তখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এরূপ বেশী বয়সে কোন কিছু মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখা খুবই কঠিন (যে কোন পাঠক কোন কিছু মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে ইহা নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। তখন ক্ষুদ্রতম তিন আয়াতের সূরা থেকে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ পঞ্চাশ বা ততোধিক আয়াতের সূরাগুলি নাজিল হতে থাকে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (তফসীর) তো দূরের কথা সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলি মুখস্থ করে সংগে সংগে সেগুলি শ্রুতলিপির মাধ্যমে লিখনের

www.pathagar.com

কথা বলা নিতান্ত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নহে। এমতাবস্থায় কাহারো মনে এরূপ ধারণা জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, হয়ত কোন সূরা/আয়াত নিয়ে এসে জীবরাঈল (আঃ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুখস্থ করাতে থাকতেন এবং যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্ত ইহা মুখস্থ না হত ততক্ষণ বা ততদিন পর্যন্ত তিনি রাছূল (ছাঃ) -এর সাথে অবস্থান করতেন এবং সূরা/আয়াত সম্পূর্ণ মুখস্থ বা হেফজ হলেই শুধু জীবরাঈল (আঃ) প্রস্থান করতেন। কিন্তু কোরআনের সূরা/আয়াত নাজিলের প্রকৃতি/ইতিহাস এরূপভাবে রাছুল (ছাঃ) কর্তৃক কোরআন গ্রহণের ধারণা দেয় না। কিভাবে অহি নাজিল হতো, এবং তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর চেহারার অবস্থাই বা কি আকার ধারণ করতো তা হাদিস গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। অত্র গ্রন্থের অন্যত্র এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আল-কোরআন -এর সূরা/আয়াত কিভাবে মুখস্থ করতেন বা কিভাবে তা গ্রহণ করতেন অথবা ইহা মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখার জন্য মোটেই কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল কিনা তার স্পষ্ট উত্তর কোরআনেই নিহিত রয়েছে।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত আল-কোরআনের সূরা/আয়াতের তরজমা ও তফসীর থেকে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কোরআনের সূরা/আয়াত মুখস্থ করার কোন প্রচেষ্টা না চালানোর জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রতি পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ফিরিশতা জীবরাঈল (আঃ) কোরআনের আয়াত পড়ার সময় মনোযোগ সহকারে শুধু শুনলেই তা আপনা-আপনিই রাছুল (ছাঃ)-এর মন-মগজে/স্মৃতিপটে প্রোথিত হয়ে যাবে বা গেঁথে যাবে, যা তিনি আর কখনও ভুলবেন না। সংশ্লিষ্ট সূরা/আয়াতসমুহের তরজমা ও তফসীরসমূহ ঃ-

১। **"হে নবী। এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেবার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেন না। উহা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব। কাজেই আমি যখন উহা পড়তে থাকি তখন আপনি উহার পাঠককে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে উহার তাৎপর্য বুজিয়ে দেয়াও আমারই দায়িত্বে রয়েছে"। (সূরা- কিয়ামাহ, আয়াত-১৬-১৯)।**

(ক) 'হে নবী। এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে লওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের জিহ্বা নাড়বেন না' সূরা কিয়ামার এ আয়াত থেকে পরে উহার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে, পর্যন্ত সমস্ত কথাই সূরার মাঝখানে বলা একটা কথা। পূর্ব থেকে বলে আসা কথার ধারাবাহিকতা ভংগ করে নবী করীম (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে এ কথাটি বলা হয়েছে। নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (ছাঃ) অহী গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারেননি। এ অবস্থায় যখনই তাঁর প্রতি অহী নাযিল হত তখন জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্র যে কালাম পাঠ করে শুনাতেন তা তিনি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে স্মরণ করে রাখতে পারবেন কিনা, এই বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট আশংকা দেখা দিত। এই কারণে তিনি অহী শ্রবণের সংগে সংগে উহা মুখস্থ করে রাখতে চেষ্টা করতেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন সূরা 'আল-কিয়ামাহ' পাঠ করে তাঁকে শুনাচ্ছিলেন, সে সময়ও এরূপ অবস্থারই উদ্ভব হয়েছিল। এই জন্য প্রসংগ কথা বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে সংগে সংগেই তাঁকে এ হেদায়েত দেয়া হল যে, 'আপনি এখনই অহীর শব্দ ও ভাষা মুখস্থ করার জন্য চেষ্টা করবেন না, বরং আপনি মনোযোগ সহকারে ইহা শুনতে থাকুন। উহা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পরে উহা যথাযথভাবে পড়িয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব। আপনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কালামের একটি শব্দও আপনি ভুলে যাবেন না। উহা পাঠ ও উচ্চারণ করতেও আপনি কখনও এক বিন্দুও ভুল করবেন না।' এই উপদেশ দেয়ার পরই পুনরায় প্রসংগ কথা শুরু করেছেন এই বলে 'কখনও নয়, আসল কথা হল'....। এ পটভূমি যাদের জানা নেই তারা এখানে এ বাক্যগুলো দেখে এ প্রসংগে এই কথা কয়টি সম্পূর্ণ বেখাপ্পা ও অপ্রাসংগিক বলে মনে করেন। কিন্তু এই পটভূমি বুঝে যাবার পর উহাকে কেউ পূর্বের ন্যায়, বেখাপ্পা বা অপ্রাসংগিক মনে করবেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ বাচনভংগীর বিশেষত্ব বুঝানো যেতে পারে। একজন শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে পড়াতে পড়াতে একটি শিক্ষার্থীকে অন্যদিকে মনোনিবেশকারীরূপে দেখতে পেলেন। তিনি তখনই পাঠদান থামিয়ে প্রসংগ ভংগ করে ছাত্রটিকে বললেন ঃ 'আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর'। এরপর তিনি তাঁর শিক্ষাদান প্রসংগের কথা আবার বলতে শুরু করে দিলেন। এ পাঠক্রম যদি হুবহু লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়, তাহলে এ পটভূমি জানেনা এমন লোকেরা পাঠ দান প্রসংগে উক্ত বাক্যটিকে নিতান্তই 'অপ্রাসংগিক' ও 'বেখাপ্পা' বলে অভিহিত করবে। কিন্তু যে লোক এই সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত, এই কথাটি মাঝখানে কোথা হতে কেমন করে বলা হল তা বুঝতে তার কিছুমাত্র অসুবিধা হবেনা। সে নিশ্চিন্তভাবেই মনে করতে পারবে যে পুরো ঘটনাটিই যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে, এতে কোন কাটছাট বা কমবেশী করা হয়নি। আমরা এখানে উক্ত বাক্যটি মাঝখানে বলা কথা বলে আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংগতি দেখাবার জন্য যা কিছু বললাম, তা আমাদের মনগড়া বা 'নিছক কল্পনা' নয়। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে এই কারণটার কথাই বলা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জরীর, তাবরানী, বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বহু সনদসূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন। বর্ণনাটি হল, নবী করিমের (ছাঃ) -এর প্রতি যখন কোরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন কোন শব্দ বা কথা ভুলে যাবার ভয়ে তিনি জিবরাঈল (আঃ) -এর সাথে সাথে অহীর শব্দসমূহ আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁকে বলা হল ঃ **"হে নবী। এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে লওয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেন না"**। শাবী, ইবনে জায়দ, দাহ্হাক, হাসান বছরী, ফাওদা, মুজাহিদ ও অন্যান্য বড় বড় মুফাসসিরগণও এ মতই প্রকাশ করেছেন।

রাছুলে করিম (ছাঃ)-কে কোরআন পাঠ করে শুনাতেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। কিন্তু এই কোরআন পাঠ হযরত জিবরাঈলের নিজস্ব ব্যাপার ছিল না, নিজ থেকে তিনি উহা পাঠ করতেন না। পাঠ করতেন মূল কালামের রচয়িতা মহান আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে ঃ 'আমরা যখন উহা পাঠ করতে থাকি'।

এই থেকে ধারণা জন্মে যে, অহী নাযিল হবার সময়ই রাছুলে করীম (ছাঃ) কোরআনের কোন আয়াত বা কোন শব্দ কিংবা কোন নির্দেশের তাৎপর্য হযরত

www.pathagar.com

জিবরাঈল (আঃ)-এর নিকট থেকে বুঝতে চেয়েছিলেন। বড় বড় কয়েকজন মুফাচ্ছিরও এই ধারণাই প্রকাশ করেছেন। ইহা সম্ভবতঃ প্রাথমিক কালের একটি ঘটনা। এ প্রসংগেই এখানে রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে হেদায়েত করা হয়েছে এই বলে যে, অহী নাযিল হওয়াকালে আপনি নীরব থেকে উহা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। এর এক একটি শব্দ তাঁর মন-মগজে পুরোপুরি ও যথাযথ সংরক্ষিত করে দেবার নিশ্চয়তাই শুধু দেয়া হয়নি বরং উহা যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবেই উহা পড়তে পারা সম্পর্কেই তাঁকে পূর্ণমাত্রায় আশ্বস্ত করে দেয়া হয়েছে। সে সংগে তাঁর নিকট এই ওয়াদাও করা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালার প্রত্যেকটি বাণী ও প্রত্যেকটি নির্দেশের প্রকৃত তাৎপর্য ও বক্তব্য তাঁকে যথার্থ ও যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

বস্তুতঃ ইহা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ থেকে কতিপয় নীতিগত কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। এ নীতিকথা কয়টি ভালভাবে বুঝে নিতে পারলে এমন অনেকগুলো বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে- যা কোন কোন লোক পূর্বেও প্রচার করেছে, ছড়িয়েছে আর এখনও প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

প্রথম, এই আয়াতটি হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাছুলে করীমের (ছাঃ)-এর প্রতি কেবল সে অহীই নাযিল হতনা যা কোরআন মজীদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, বরং উহা ছাড়াও অহীর মাধ্যমে তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হত যা কোরআনে লিপিবদ্ধ নেই। কেননা কোরআনের আদেশ-নিষেধ, আহকাম ও ফরমানসমূহ, উহার ইশারা-ইংগিতসমূহ উহার শব্দ বাক্য ও উহার বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দসমূহের যে তাৎপর্য অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে বুঝানো হত তা যদি কোরআনেই শামিল হয়ে থাকত, তা হলে উহার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া বা উহার ব্যাখ্যা করাও আমারই দায়িত্বে এ কথা বলার কোনই প্রয়োজন থাকে না। কেননা উহা তো মূল কোরআনেই দেখতে ও পড়তে পাওয়া যেত। কাজেই কোরআন বোঝানো ও উহার ব্যাখ্যাদান প্রসংগে আল্লাহ্তায়ালা যা কিছু বলতেন তা অবশ্যই কোরআনের মূল শব্দ ও ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে, ইহা মেনে লওয়া ছাড়া কোনই উপায় থাকতে পারে না। মূলতঃ ইহাও এক প্রকারের অহী এবং একেই বলা হয় 'অহীয়ে খফী'। 'অহীয়ে খফী' প্রচ্ছন্ন অহী'র ইহা আর একটি প্রমাণ এবং এই প্রমাণ কোরআন থেকেই প্রাপ্ত ও প্রমাণিত।

দ্বিতীয়, কোরআনের বক্তব্য ও তাৎপর্য এবং উহার আদেশ-নিষেধ, আহকামের ব্যাখ্যা রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে জানিয়েছিলেন এজন্য যে, সে অনুযায়ী তিনি নিজের কথা ও কাজ দ্বারা লোকদিগকে কোরআন বুঝিয়েছেন। উহার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমল করার নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। রাছুলে করীম (ছাঃ) কোরআন যেভাবে বুঝিয়েছেন তাই যদি উহার আসল বক্তব্য না হত এবং এই বোঝানো যদি কেবল তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকত, তা হলে ইহা ছিল একটি নিতান্তই অর্থহীন ও প্রয়োজনহীন কাজ। কেননা নবুয়্যতজনিত দায়িত্বাবলী পালনে ইহা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যেতে পারত না। কাজেই শরিয়ত প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত এই জ্ঞানদান শরিয়ত প্রণয়ন পর্যায়ে কোন গুরুত্বেরই অধিকারী নয়, এরূপ কথা কেবল অজ্ঞ-মুর্খ বা অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই বলতে পারে।

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা নিজেই সূরা নহল-৪৪ আয়াতে বলেছেন ঃ **"আর হে নবী! এ কিতাব তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে, যেন তুমি লোকদের সম্মুখে তাদের জন্য অবতীর্ণ সে আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পার"**।

কোরআনের চারটি স্থানে আল্লাহ্তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কেবল আল্লাহ্র আয়াত লোকদিগকে শুনিয়ে দেয়া রাছুলে করীমের (ছাঃ) কাজ নয়, উহার শিক্ষা দানও তাঁর কাজ (আল-বাকারা-১২৯, ১৫১ আয়াত, আল ইমরান-১৬৪ আয়াত, আল জুম্মা-২ আয়াত)। অতঃপর কোরআন মান্যকারী কোন ব্যক্তিই একথা মনে করতে কুণ্ঠিত বা অস্বীকারকারী হতে পারেনা যে, কোরআন মজীদের ছহীহ্ ও প্রামাণ্য সত্যিকারভাবে গ্রহণীয় ব্যাখ্যা কেবল তা-ই, যা রাছুলে করীম (ছাঃ) স্বীয় কথা ও আমল দ্বারা করেছেন। কেননা উহা তাঁর নিজস্ব বা স্বকল্পিত নয়, বরং কোরআন নাযিলকারী আল্লাহ্তায়ালারই দেয়া ব্যাখ্যা। উহা গ্রহণ না করতে কিংবা উহাকে বাদ দিয়ে কোরআনের কোন আয়াতের বা শব্দের কোনরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া এমন একটা দুঃসাহসিকতার কাজ যা কোন ঈমানদার ব্যক্তিই করতে পারে না।

তৃতীয়, কোরআন শরীফ শুধু সোজাসুজি পাঠ করলেও পরিস্কারভাবে অনুভব করা যায় যে, একজন আরবী ভাষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিও উহার শব্দ পড়ে উহার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারে না। উহাতে যে আদেশ আছে তা কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে তা বুঝতে পারাও শুধু আরবী ভাষা বুঝার যোগ্যতা দিয়েই সম্ভব হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "সালাত" (নামায) শব্দটি নিয়েই বিবেচনা করা যেতে পারে। কোরআন মজীদে ঈমানের পর যে আমলটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল এ "সালাত" (নামায)। কেবল আরবী অভিধানের সাহায্যে এর প্রকৃত তাৎপর্য কেউই বুঝতে পারে না। কোরআনে এ শব্দের বার বার উল্লেখ দেখে বড়জোর কেউ একথা বুঝতে পারে যে, আরবী ভাষার এ শব্দটি কোন বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। যার দ্বারা সম্ভবতঃ কোন বিশেষ কাজ বুঝানো হয়েছে এবং ঈমানদার লোকদিগকে তা করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। কিন্তু কোন আরবী ভাষাবিদ কেবল কোরআন পড়ে সেই বিশেষ কাজটির স্বরূপ ও উহা কার্যকর করার ধরণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় কোরআন প্রেরণকারী নিজেই যদি নিজের পক্ষ হতে কোন শিক্ষক পাঠিয়ে উহার যথার্থ পারিভাষিক অর্থ ও তাৎপর্য যথাযথভাবে বলে ও জানিয়ে না দিতেন এবং সালাত (নামায) সংক্রান্ত নির্দেশ পালনের নিয়ম ও পদ্ধতি পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে শিখিয়ে না দিতেন, তাহলে শুধু কোরআন পড়ে দুনিয়ার কোন দুইজন মুসলমানও কি একই ধরণে ও পদ্ধতিতে সালাত (নামায) কাজটির হুকুম পালন করতে পারত? অথচ দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা বংশানুক্রমে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে আসছে এবং দুনিয়ার প্রতিটি স্থানে কোটি কোটি মুসলমান নামায পড়ার আদেশ একই ধরনে ও নিয়মে পালন করছে। এর একমাত্র কারণ হল, আল্লাহ্তায়ালা রাছুলে করীমের (ছাঃ) প্রতি কোরআনের শব্দ ও ভাষাই শুধু অহীর মাধ্যমে নাযিল করেননি সে সাথে শব্দ ও ভাষার প্রকৃত তাৎপর্যও

www.pathagar.com

তিনিই তাঁর রাছুল (ছাঃ)-কে খুব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর রাছুল করীম (ছাঃ) তাই সে সব লোককে শিক্ষা দিয়েছেন যারা কোরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁকে আল্লাহর রাছুলরূপে মেনে নিয়েছে।

চতুর্থ- কোরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রাছুলকে বলে দিয়েছেন এবং রাছুল (ছাঃ) স্বীয় কথা ও কাজ দ্বারা উহার যে শিক্ষা তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন তা জানার একটি উপায়ই আমাদের নিকট রয়েছে। সে উপায়টি হল, হাদীস বা সুন্নাত। হাদীস বলতে সে বর্ণনাসমূহ বুঝায় যা রাছুলে করীমের (ছাঃ) কথা ও কাজ সম্পর্কে সনদ সহকারে সে কালের লোকদের থেকে এ কালের লোকদের পর্যন্ত পৌছেছে। আর সুন্নাত বলতে সে পন্থা ও পদ্ধতি বা নিয়মাদি বুঝায় যা রাছুলে করীমের (ছাঃ) মৌখিক ও বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে প্রচলিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে উহার বিস্তারিত বিবরণ সেকালের লোকদের নিকট থেকে পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌছেছে এবং পরবর্তী কালের বংশধররা পূর্ববর্তী লোকদিগকে উহা বাস্তবে অনুসরণ করতে নিজেদের চক্ষে দেখতে পেয়েছে। এ পর্যায়ে সঠিক জ্ঞানার্জনের এটাই একমাত্র উপায়। (তফসীর-তাফহীমুল কোরআন, (সংক্ষেপিত)।

(খ) এ পর্যন্ত (অর্থাৎ সূরা- কিয়ামাতের ১ হতে ১৫ আয়াত পর্যন্ত) কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে অহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আঃ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। কারণ, এক, কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই, কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাখ্যা স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু তা পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। এরপর বলেছেন আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) যখন কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না, বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের (আঃ) পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

www.pathagar.com

অবশেষে বলা হয়েছে "ইন্না আলাইনা বায়ানাহ" অর্থাৎ আপনি এ চিন্তা করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি ? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব।

তাই আপনি কোরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ্তায়ালাই সম্পন করবেন। (তফসীর- মা'রেফুল কোরআন) (সংক্ষেপিত)।

২। **"অচিরেই আমি আপনাকে পাঠ করাব তৎপর আপনি বিস্মৃত হবেন না, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন" (সূরা আ'লা আয়াতঃ ৬-৭)।**

(ক) তফসীর (শানে নযুলসহ)ঃ শানে নুযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ও উম্মত জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবা এবং বিশিষ্ট তফসীর কারকগণের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত রাছুলুল্লাহ্র (ছাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন বৃহৎ বৃহৎ সূরাসমূহ অবতীর্ণ হতে লাগল, তখন তার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, আমি কখনও লেখাপড়া শিখিনি। এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা ব্যতিত এ সকল সুবৃহৎ সূরা আমি কিরূপে স্মরণ করে রাখব এবং কিরূপেই বা তা নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করব। সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ্র (ছাঃ)-এর মনের কথা জানতে পেরে এ সূরা অবতারণপূর্বক তঁকে আশ্বাস দান করে বলে দিলেন যে, হে রাছুল (ছাঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালাই আপনার শিক্ষাদাতা। তাঁর ইচ্ছায় এটা অবতারিত ও পঠিত হবার সংগে সংগেই আপনার সুনির্মল স্মৃতিপটে সুরক্ষিত হবে এবং আপনি সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে পারবেন, আপনি এর একটি বর্ণও বিস্মৃত হবেন না এবং এজন্য আপনার কোনই চিন্তার কারণ নেই।

অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ্র (ছাঃ) ঐ চিন্তা ও আশংকার বিষয় অবগত হয়ে বলে দিলেন যে, 'আমিই আপনাকে কোরআন পাঠ করাব' এবং 'আমি যা ইচ্ছা করি তদ্ব্যতীত' অথবা 'আমার ইচ্ছা ব্যতিত' আপনি একবার এটা পাঠ করবার পর আর কখনই বিস্মৃত হবেন না।

তফসীরকারকগণ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের একাধিক মর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এটার প্রকৃত ও অভ্রান্ত মর্ম এই যে, আল্লাহতায়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ্কে (ছাঃ) সুনিশ্চিত আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলে দিলেন, হে রাছুল (ছাঃ), এই কোরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ জিবরাঈলের দ্বারা আমিই আপনাকে শিক্ষাদান করতেছি। এজন্য আমি আপনার হৃদয় এরূপ প্রশস্থ এবং আপনার স্মৃতিশক্তি এইরূপ প্রখর করে দিয়েছি যে, একবার মাত্র শ্রবণ বা পাঠ করা মাত্রই এটা আপনার স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য অংকিত হয়ে যাবে। সুতরাং আমার ইচ্ছা ব্যতিত আপনি এটার একটি বর্ণও বিস্মৃত হবেন না। নিশ্চয় তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞ প্রভু (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞান অতিক্রম করে আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না এবং তদীয়

www.pathagar.com

কোরআনের কোন বিষয় কখনই বিলুপ্ত হবে না। (তফসীরে কোরান শরিফ-সংক্ষেপিত)।

৩। "সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্র অহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন, (দোয়া করুন) হে আমার পালনকর্তা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন"। (সূরা-ত্বোয়াহা, আয়াত-১১৪)।

(ক) হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, অহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত নিয়ে এসে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো, আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের "লা তুহাররিক বিহী লিসানাকা" আয়াতে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়, এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈল -এর সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন, "রাব্বি জিদনী ইলমান" –হে আমার পালনকর্তা আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভূক্ত। (তফসীরে- মা'রেফুল কোরআন)।

(খ) আয়াতের শেষের অংশে কোন প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হবার পূর্বে তাড়াতাড়ি তা আবৃত্তি করতে অথবা তা পাঠ করে লোকদেরকে শুনাতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং এ আয়াতে হযরত রাছুলুল্লাহ্কে (ছাঃ) বলে দেয়া হয়েছে যে, অধিকতর প্রত্যাদেশ লাভ করে এবং তার অর্থ ও মর্ম অবগত হয়ে যদি আপনি স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চান, তবে তজ্জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করুন। (তফসীরে- কোরান শরিফ)।

উপরোক্ত আয়াত ও তৎসমূহের তরজমা ও তফসীর থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর অহী (আল-কোরআনের সূরা/আয়াত) নাযিল শুরু হবার প্রাথমিক পর্যায়ে অহী ভুলে যাওয়া কিংবা উহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ (তফসীর) প্রচার/প্রসার ইত্যাদিতে তিনি অসমর্থ হয়ে পড়বেন কিনা তার আশংকা করতেছিলেন। ফলে অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -এর নিকট থেকে আল্লাহ্ -প্রেরিত অহী গ্রহণকালে এটা তাৎক্ষণিকভাবে মুখস্থ করার মানসে ঘন ঘন জিহ্বা/ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর এরূপ প্রচেষ্টায় বাঁধা প্রদান করে ঘোষণা করে দিলেন যে, কোরআন মুখস্থ করার জন্য তাঁর ঘন ঘন জিহ্বা/ঠোঁট নাড়াবার কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে কোরআন (কোরআনের

www.pathagar.com

সূরা/আয়াত) শুধু মুখস্থ করিয়েই দিবেন না, বরং এটার প্রকৃত তরজমা/তফসীর (অর্থ, ভাবার্থ, মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, ও বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার) সবই অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিবেন।

বাস্তবক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। তা যদি না হতো তবে কোরআনের মত বিরাট একখানা বিরাট ঐশীগ্রন্থ রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর চল্লিশোর্ধ বয়সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচার-প্রসারসহ শব্দে শব্দে, অক্ষরে অক্ষরে পুরোপুরি মুখস্থ করা এবং এর সমস্ত প্রকার হুকুম/আহকাম/আদেশ-নিষেধ নিজ জীবনে অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভবপর হত কিনা সন্দেহ। এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজটা যে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে আল্লাহ্তায়ালার সরাসরি এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেই সম্পন্ন হয়েছিল তা একটু চিন্তা করলে যে কোন অর্বাচিন/নির্বোধ লোকও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম।

যে কোন বিষয় মুখস্থ করার একটা বয়স বা সময় আছে। সব বয়সেই সব কিছু সমভাবে যেমন মুখস্থ করা যায় না, তেমনি মুখস্থকৃত বিষয় স্মরণেও রাখা যায় না। বিশেষ করে বয়স যখন চল্লিখ পার হয়ে যায় তখন কোন কিছু মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখা যে খুবই কঠিন তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহারণস্বরূপ বলা যায় যে, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছেলে-মেয়েদেরকে কোন কিছু মুখস্থ করতে যেমন পদ্য, গদ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাবার্থ, সারাংশ, সারমর্ম রচনা, ব্যাখ্যা পত্র লিখন, অনুবাদ, শ্রুতলিপি ইত্যাদি দাড়ি-কমাসহ শব্দে শব্দে ও অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করার জন্য ঘন ঘন বারংবার ঠোট/জিহ্বা নেড়ে পড়তে দেখা যায়। একইভাবে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আল-কোরআন মুখস্থ করার সময়ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মুখস্থ করার জন্য একই পড়া বার বার, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দিনে রাতে পড়তে হয়। এত পরিশ্রম করে মুখস্থ করার পরও ঐসব ভুল করতে বা ভুলে যেতে দেখা যায়। ফলে মুখস্থ ধরে রাখার জন্য এরূপ শত প্রচেষ্টা সত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুখস্থ করা বিষয় উচ্চ-মাধ্যমিক বা আরো উচ্চ পর্যায়ে বা পরবর্তী জীবনে খুব কমই মুখস্থ থাকতে দেখা যায়।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বেলায়ই যদি এই অবস্থা হয়, তবে চল্লিশোর্ধ বয়স্ক একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে কোরআনের মত বিরাট একখানা গ্রন্থের বৃহৎ বৃহৎ সূরা/আয়াত অহীবাহক (ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর মুখে শুনা মাত্রই) মুখস্থ করতে ঘনঘন ঠোট/জিহ্বা না নেড়ে বা ঘন ঘন প্রচেষ্টা না চালিয়ে কিভাবে মুখস্থ করা এবং স্মরণ রাখা সম্ভব তা গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন নয় কি?

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, "কোরআনকে ধরে না রাখলে তা আলগা/বন্ধনমুক্ত উটের মত চলে যেতে পারে"। (মেশকাত শরীফ)।

তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কিছু মুখস্থ করা ছাড়াও/বারংবার পড়াশোনা করে যে কোন একটি বিষয়ে হুবহু কয়েক পৃষ্ঠা লিখতে গেলেও ভুল/ত্রুটি কাটাকাটি/ঘষাঘষি হতে দেখা যায়। এটা শুধু সব বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়ই নয়, বরং পূর্ণ বয়স্ক/প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যারা

www.pathagar.com

বই-পুস্তক লেখার কাজে নিয়োজিত বা অফিস/আদালতে কাজ করেন বা সংবাদপত্র/সাময়িকী অথবা যে কোন লেখালেখির কাজে জড়িত, তাদের পক্ষেও কাটাকাটি ছাড়া সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভূলভাবে একটানা লিখে যাওয়া শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভবও।

এভাবে স্কুল, কলেজ, অফিস আদালতে, সংবাদপত্রে বা সাময়িকীতে লেখার সময় কাটাকাটি, ঘষাঘষি, মুছামুছির অন্ত নাই। বর্তামানে এ বিজ্ঞানের যুগে এরূপ ঘষাঘষি, কাটাকাটি মুছে ঠিক করার জন্য কত রকম 'পেন্সিল ইরেজার, ইংক ইরেজার, কারেকটিং ফ্লুইড', ইত্যাদি বের হয়েছে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মুখস্থ করা বা লেখালেখির ক্ষেত্রেই যদি এরূপ ভুল-ত্রুটি হয় এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তবে চল্লিশোর্ধ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -এর মুখে শুনা মাত্রই দাড়ি-কমাসহ ক্ষুদ্র বৃহৎ সূরা/আয়াতগুলি পুরোপুরি মুখস্থ/কণ্ঠস্থ হয়ে সংগে সংগে তা হুবহু সম্পূর্ণ নির্ভূলভাবে আবৃত্তি করতে সক্ষম হওয়াটাই কি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক এবং অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না? এটা যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দূর নিয়ন্ত্রণের (রিমোট কন্ট্রোলের) মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতে পারেনা। ইহা বুঝতে তো একজন অর্বাচিন নির্বোধ লোকের পক্ষেও কঠিন হবার কথা নয়।

এটা সকলেরই জানা যে, রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর নবী। আল্লাহ্র ভাষায় **"নবী আল-উম্মি"**। (সূরা- আরাফ, আয়াত-১৫৮)। তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেননি। সুতরাং রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর মত চল্লিশোর্ধ বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে বিনা প্রচেষ্টায় ঘনঘন ঠোঁট, জিহ্বা না নেড়ে কোরআনের বড় বড় সূরা, আয়াতসমূহ মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রেখে হুবহু শুনানো ছিল অসম্ভব। বরং ভুলে যাওয়া, মনে না থাকা, স্মরণ করতে না পারা, একই বিষয় একবার এক রকম, দ্বিতীয়বার অন্য রকম বলা বা আবৃত্তি করা অর্থাৎ একই সূরা বা আয়াত একেকবার একেক রকম পড়া ও বলাই ছিল স্বাভাবিক।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীরসমূহ থেকেও এটা স্পষ্ট যে, রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) নিজেও এরূপ একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পতিত হবার আশংকা স্বাভাবিক মানবিক কারণেই করছিলেন। বিশেষ করে অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকরা ঐ সময় কোরআনকে আল্লাহর কালাম, বাণী বলে সন্দেহ ও অস্বীকার করে, এটাকে মানুষেরই কালাম তথা রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর বাক্য বা তাঁরই রচিত বলে প্রচার করতেছিল এবং তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করে তাঁকে কবি, যাদুকর, গনক, উন্মাদ, ইত্যাদি বলে হেয় প্রতিপন্ন করছিল। তারা কোরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি (?) ধরার জন্য এক পায়ে খাড়া ছিল। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কোরআনের সূরা, আয়াত ঠিকমত ও অভ্রান্তভাবে মুখস্থ না বলে উল্টাপাল্টাভাবে বলতে শুরু করলে তাঁর নবুয়ত, রিসালত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ধরাতলে আগমনের পর থেকে (এমন কি পূর্ব থেকেও) শত শত বৎসর ধরে বিশেষ করে বিগত ২/৩ শতাব্দী যাবত বিশ্বব্যাপী কত অগণিত কবি, সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ধর্মীয় নেতা প্রমোখ বিভিন শ্রেণীর লেখক লেখিকাগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন এবং অব্যাহত গতিতে লিখে চলেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাদের এতসব লেখালেখির ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বজুড়ে পুস্তকালয় ও গ্রন্থাগারগুলি বই-পুস্তকে ভরপুর অবস্থায় বিরাজমান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণীর এসব লেখক/লেখিকাগণের মধ্যে কতজন তাদের নিজেদের লিখিত, পুস্তকসমূহ দাড়ি-কমাসহ সম্পূণ নির্ভুলভাবে পুরোপুরি মুখস্থ করেছেন বা মুখস্ত রেখেছেন ও অন্যদেরকেও মুখস্থ পড়ে শুনিয়েছেন ? হয়ত একজনও নয়। তবে হয়ত কারো কারো তাদের নিজস্ব লেখার কিছু কিছু অংশমাত্র মুখস্থ করেছেন বা রেখেছেন)। কারণ, বিরাট একখানা পুস্তক (পদ্য বা গদ্য) লেখা যত সহজ এটা পুরোপুরি ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখা তত সহজ নয়। চল্লিশোর্ধ বয়স্ক কোন প্রিয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে বেশী নয় মাত্র ২০/৩০ ছত্রের কোন কবিতা/সাহিত্য পদ্য/গদ্য একবার মাত্র পাঠান্তে মুখস্ত করা এবং মুখস্ত রাখা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতেই অসুবিধা কোথায় ?

আমি (লেখক) নিজে আমার জানা ২/১ জন লিখককে তাদের লেখা মুখস্থ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা মুখস্থ তো দূরের কথা বরং এটা কিভাবে সম্ভব বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু নিরক্ষর নবী (ছাঃ) -এর পক্ষে এতবড় একখানা মহাগ্রন্থ কোরআন মুখস্থ করা কিভাবে সম্ভব হল প্রত্যেকেরই তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, তিনি অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -এর সাথে রমযান মাসে ২ বার করে কোরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। অর্থাৎ পুরো কোরআন শরীফ রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) পড়তেন আর জিবরাঈল (আঃ) শুনতেন, আবার জিবরাঈল (আঃ) পড়তেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) শুনতেন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা কোরআনকে মানব জাতির জন্য চূড়ান্ত জীবনবিধানরূপে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মাধ্যমে প্রেরণ করছিলেন। তাই রাছুল (ছাঃ)-কে কোরআনের সূরা, আয়াত সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অটুট ও নিখুঁত শব্দে শব্দে ও অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করিয়ে দেয়ার এবং এর অর্থ, মর্মার্থ, ভাব, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তফসীর ইত্যাদি করে দেয়াসহ(প্রচার/প্রসারের) পুরো দায়-দায়িত্বটাই স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করে কোরআনে উল্লেখিত ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর ২৩ বৎসরব্যাপী নবুয়তী জীবনে অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। যার ফলে আমাদের সম্মুখেই আজ বিরাজ করছে অম্লান, অক্ষয়, অটুট, নিখুঁত, নির্ভুল, পূর্ণাংগ ঐশি মহাগ্রন্থ আল-কোরআন।

এভাবে রাছুল (ছাঃ)-কে সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় কোরআন মুখস্ত, ব্যাখ্যাসহ প্রচার প্রসারের আগাম বিস্ময়কর ঘোষণার ততোধিক বিস্ময়কর বাস্তবায়নই বটে!

www.pathagar.com

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর আগমনী বার্তা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে বলে আল-কোরআনের ঘোষণা

মানুষকে ধরাতলে প্রেরণের সময় আল্লাহ্তায়ালা সুস্পষ্ট আভাস দিয়ে বলেছিলেন যে, মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসাবে চলার পথের পাথেয় বা দিক নির্দেশনাস্বরূপ মাঝে মাঝে হেদায়েত বা শরীয়তি বিধানমালা প্রেরিত হবে। (সূরা-বাকারা আয়াত -৩৮) সে মোতাবেক প্রথম মানব আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাছুল পৃথিবীতে এসেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য নবী-রসুলগণ যেখানে একটি এলাকা বা একটি গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন সেখানে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এসেছিলেন পরবর্তী সর্বকালের জন্য সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে। শুধু তাই নহে, তাঁর আগমনী বার্তা পুর্ববর্তী আসমানী কিতাব মারফত অগ্রিম জানিয়েও দিয়েছিলেন। ফলতঃ তিনি ছিলেন আগাম ঘোষিত বা প্রতিশ্রুত নবী যা অন্যান্য নবী-রাছুলগণের বেলায় প্রযোজ্য নহে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিলঃ হে বনী ইসরাঈল আমি তোমদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাছুল। সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পুর্বে এসেছে। আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাছুলের (ছাঃ) যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে- আহমাদ।" (সূরা- ছফ্ফ আয়াত- ৬-৭ অংশ)।

(ক) যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাঈল। আমি তোঁমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাছুল। আমার পুর্ববর্তী আসমানী কিতাব 'তওরাতের' আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাছুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম হবে 'আহমদ'। (এই সুসংবাদ যে ঈসা (আঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তা স্বয়ং খৃষ্টানদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে)। সে মতে খাযেনে 'আবু দাউদের' রেওয়াতক্রমে আবিসিনিয়ার সম্রাট 'নাজ্জাশীর' উক্তি বর্ণিত আছে যে, বাস্তবিকই হযরত ঈসা (আঃ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। 'নাজ্জাশী' খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সুপন্ডিতও ছিলেন। খাযেনে তিরমিযী থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তওরাতে রাছুলে খোদা (ছাঃ) -এর গুণাবলী উল্লেখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ঈসা (আঃ) তাঁর সাথে সমাধিস্থ হবেন। ঈশা (আঃ) তওরাতের প্রচারক ছিলেন, তাই এটা যেন ঈশা (আঃ) থেকেই বর্ণিত আছে। মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব "এযহারুল হকে" তওরাতের বর্তমান কপি থেকে একাধিক সুসংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্বিতীয় খন্ড, ১৬৪পৃঃ কনষ্টান্টিনোপলে মুদ্রিত)। বর্তমান ইঞ্জিল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। সে মতে 'ইউহান্নার' ইঞ্জিলের (যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও

www.pathagar.com

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত হয়) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছেঃ আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্যে উত্তম। কেননা, আমি না গেলে "ফারকিলিত" তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। "ফারকিলিত" শব্দটি "আহমদেরই" অনুবাদ। তখনকার কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত। ঈসা (আঃ) হিব্রু ভাষায় 'আহমদ' বলেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন "বিরকলুতুস" লিখে দেয়া হল। এর অর্থ 'আহমদ' অর্থাৎ বহুল প্রশংসিত ও খুব প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই 'ফারকিলিত' করে দেয়া হল। হিব্রু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত 'আহমদ' নাম বিদ্যমান রয়েছে। এই ফারকিলিত সম্পর্কে ইউহান্নার ইঞ্জিলে বলা হয়েছে ঃ তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সততা ও ন্যায় বিচার খেলাপ করার কারণে শাস্তি দিবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র পয়গম্বর হবেন। - (তফসীরে হাক্কানী- তফসীরে মা'রেফুল কোরআন, (সংক্ষেপিত)।

(খ) আর এ থেকেই সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ) রাছুলে করীম (ছাঃ) -এর নাম মুবারক নিয়ে তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। সে সংগে এ কথাও জানা যায় যে, যোহন লিখিত গ্রীক ভাষায় ইঞ্জিলে মুল শব্দ কোন এক সময় 'পেরিক্লিটস' ব্যবহৃত হয়েছে, আর খৃষ্টানরা উত্তর কালে কোন এক সময় শব্দটি পরিবর্তন করে তদস্থলে "প্যারাক্লিটস" ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

ইহা অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও প্রমাণ হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর একটি বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন আবিসিনিয়াগামী মুসলিম মুহাজিরগণকে নাজ্জাশী নিজের দরবারে ডাকলেন এবং হযরত জাফর ইবনে আব তালেব (রাঃ) -এর নিকট থেকে রাছুলে করীম (ছাঃ) -এর উপস্থাপিত শিক্ষা-আদর্শ জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমাদেরকে স্বাগত জানাই এবং তাঁকেও যাঁর নিকট থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর রাছুল (ছাঃ)। তিনিই সে সত্বা যার উল্লেখ আমরা ইঞ্জিলে পাই এবং তিনিই সে নবী ও রাছুল (ছাঃ) যাঁর আগমন সম্পর্কে ঈসা ইবনে মরিয়াম আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন- (মুসনাদে আহমদ)"। এই কাহিনী স্বয়ং হযরত জাফর (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইহা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নাজ্জাশী জানত যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। শুধু তাই নহে, সে সংগে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জিল গ্রন্থেও সে নবীর সম্পর্কে উল্লেখ ছিল বলেই নাজ্জাশী এ কথা ঘোষণা করতে এক বিন্দু দ্বিধাবোধ করলেন না যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-ই হচ্ছেন সে নবী।

"আর আমি সুসংবাদদাতা এমন একজন রাছুলের, যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে 'আহমদ'।"

www.pathagar.com

ইহা কোরআনের একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ আয়াত যা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে রাছুলে করীম (ছাঃ) -এর নাম 'আহমদ' বলা হয়েছে। 'আহমদ' শব্দের দুইটি অর্থ। একটি, সে ব্যক্তি যে আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। দ্বিতীয়, সে ব্যক্তি যার সর্বাধিক প্রশংসা করা হয়েছে। অথবা বান্দাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য। সহীহ্ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, 'আহমদ' হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) -এরই অপর নাম ছিল। মুসলিম, আবু দাউদ, তায়ালিসি গ্রন্থে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) -এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, "আমি মুহাম্মদ, আমি আহম্মদ, আমি হাশের---।" হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম থেকে ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিজি ও নাসায়ী এই অর্থেরই বহু কয়টি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। (তফসীরে তাফহীমুল কুরআন- সংক্ষেপিত)।

(গ) আলোচ্য আয়াতে হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় বিবৃত হয়েছে। হযরত ঈসা এসরাইল বংশীয়দেরকে বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ তওরাতের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছি এবং তওরাতে একজন মহামান্য ও মহাপ্রশংসিত বিশ্বনবীর শুভাগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত হয়েছে, আমিও সে মহানবীর শুভাগমেনের সুসংবাদ প্রদান করে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তিনি 'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' নামে অভিহিত ও প্রশংসিত হবেন।

হযরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর শুভাগমন বিষয়ক উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তওরাত ও ইঞ্জিল এবং হিন্দুদের বেদ ও পুরাণে বহু বিক্ষিপ্ত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে 'আহমদ' ও 'মোহাম্মদ' নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে এবং কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে 'পারাক্লিত', 'পেরিক্লিটস', 'কমফোরটার', 'রুহুলকুদুস' বা 'স্পিরিট অব ট্রুথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এস্থলে প্রধান সমস্যা এই যে, হযরত মুসা বা হযরত ঈসা যে ভাষায় কথা বলতেন, সে ভাষায় লিখিত মূল তওরাত বা ইঞ্জিল জগতে একখানিও বিদ্যমান নাই। হযরত মুসার লিখিত বা সংকলিত ঐশীবাণী সংবলিত কাষ্ঠ-ফলক পরিপূর্ণ পবিত্র সিন্ধুক বহু পুর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। হযরত ঈসা স্বয়ং কোন গ্রন্থ সংকলন করে যান নেই। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর জীবনী ও তাঁর বাণী বা উপদেশ সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছিলেন, জগতে আদি অবস্থায় তারও কোন অস্তিত নাই। উহার অনুবাদের অনুবাদ বা তস্য অনুবাদ, এইরূপ সাত নকলে আসল খাস্তা হয়ে তওরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও ইঞ্জিল (নিউ টেষ্টামেন্ট) নামে বর্তমান জগতে যা-ও প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে পরস্পর কোনই সামঞ্জস্য নেই। আরও সমস্যা এই যে, ইহুদী/খৃষ্টানেরা উহার সবগুলির সত্যতাও স্বীধিকার করেন না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি সত্য ও কোন্‌খানি মিথ্যা এবং কোন্‌টি নবীগণের উক্তি অথবা কোনটিই বা বিক্ষিপ্ত বর্তমানে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই কঠিন বরং একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

যা হউক, ঐ সকল গ্রন্থাবলীর ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে ঈহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যে সকল গ্রন্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বজনমান্য বলে স্বীকার করেন, তন্মধ্যে তওরাতের 'ডিউট' এবং ইঞ্জিলের জন লুক, মার্ক ও মথি লিখিত 'গসপেল' বা সুসমাচারগুলি সবিশেষ উল্লেযোগ্য। উহার মধ্যে তওরাতে উক্ত হয়েছে- "নিশ্চয় আমি ইস্রায়েলগণের ভ্রাতাগণের মধ্যে থেকে মুসার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব এবং তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব' (ডিউট ১৮-১৮)। বলা বাহুল্য, এই প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যে ইসমাইল বংশীয় মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিসৃত ঐশীবাণী কোরান শরিফকে নির্দেশ করা হয়েছে, তাহা অস্বীকার অথবা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনই অবকাশ নেই। অনন্তর ইঞ্জিলে হযরত ঈশা (আঃ) ঐ অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে বলেছেন-"আমার এখন তোমাদের নিকট অনেক বিষয় বলবার আছে, কিন্তু তোমরা এখনও তা সহ্য করতে পারবে না। অনন্তর তিনি -সেই 'সত্যের আত্মা' ('পারাক্লিত', 'পেরিক্লিউস', 'কমফোরটার' বা 'স্পিরিট অব ট্রুথ') যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্য বলে যাবেন। কারণ তিনি নিজ থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা শুনবেন তাই বলবেন। তিনি ভবিষ্যদ্বিষয় পরিজ্ঞাপন করবেন এবং তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন"। (জন ১৩ থেকে ১৭ এবং ১৬-১২ (থেকে ১ পদ দ্রষ্টব্য)।

হযরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর শুভাগমন সম্বন্ধে তওরাত ও ইঞ্জিলের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যাই বলুক না কেন, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দুইটিকে তারা সকলেই হযরত মুসার বর্ণিত এবং হযরত ঈশার মুখ-নিঃসৃত সত্যবাণী বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং উহার ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তারা যতই ভ্রান্ত পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন উহা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) এবং পবিত্র কোরান শরিফের শুভাগমন ও সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই। (তফসীরে কোরান শরিফ সংক্ষেপিত)।

২। "আর এই কাফির লোকেরা এরূপ বলতেছে যে, আপনি পয়গম্বর নহেন, আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ্তা'য়ালা এবং সেই ব্যক্তি, -যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে- সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট"। (সূরা- রা'য়াদ আয়াত-৪৩)। তফসীর ঃ

আর এই কাফির লোকেরা (পারলৌকিক শাস্তির কথা ভুলে থেকে এরূপ বলতেছে যে, (নাউজুবিল্লাহ) আপনি পয়গম্বর নহেন, আপনি বলে দিন, (তোমাদের অহেতুক অমান্য করায় কি হবে?) আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে (আমার নবুয়ত সম্বন্ধে) আল্লাহ্ তা'লা এবং সে ব্যক্তি, যার নিকট (আসমানী) কিতাবের জ্ঞান আছে- সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে অর্থে ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়ের সুধী আলেমবৃন্দকে বুঝান হয়েছে। তাঁদের আসমানী কিতাবে শেষ নবী সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বার্তা রয়েছে সুধী আলেমগণ তা পাঠ করতঃ ঈমান আনয়ন করেন। এ

www.pathagar.com

স্থলে আল্লাহ্ পাক হযরত (ছাঃ)-কে নবুয়তের দুইটি দলিল বলে দিলেন- একটি 'আকলী' অপরটি 'নকলী'। আকলী দলিল এই যে, আল্লাহ্তা'লা আমাকে নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ 'মুজেযাহ্' দান করেছেন। আল্লাহ্ সাক্ষী হওয়ার ইহাই অর্থ। নকলী দলিল এই যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আমার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই দ্বিতীয় দলিলটির প্রতি যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমাদের যে সমস্ত সরল চিত্ত আলেম রয়েছেন তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, তারা নিশ্চয়ই সত্য কথা বলে দিবেন। এবং বিধ স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নবুয়ত অমান্য করতে যাওয়া দুরদৃষ্ট বৈ আর কি হতে পারে? বুদ্ধিমান মাত্রই এতে নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্চনীয়। (তফসীরে- আশরাফী)।

৩। **"এবং নিশ্চয় গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে এরূপ আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তদ্বিষয়ে আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা অল্প মুল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রয় করে না, তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী" (সূরা- ইমরান আয়াত-১৯৯)**। তফসীর ঃ

ঈহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যারা কোনরূপ লোভ কিংবা স্বার্থের প্ররোচনায় তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত হজরত রাছুলুল্লাহ্র সত্যতা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী গোপন না করে উহা সরলভাবে প্রকাশপূর্বক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে তাদেরই পুরস্কারের প্রসংগ বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পরে অনেক সত্যপরায়ণ ইহুদী ও খ্রীষ্টান অকপটে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বর্তমান সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক উচ্চ বংশোদ্ভব, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত খ্রীষ্টান নর-নারী প্রচলিত তওরাত,জবুর ও ইঞ্জিল এবং পবিত্র কোরআন পাঠ করে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুয়তের সত্যতা অম্লানবদনে স্বীকার করে নিয়েছেন। জগতের যাবতীয় সত্যপরায়ন লোকের পক্ষে এদের আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ পবিত্র ইসলাম ব্যতীত মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের আর কোনই অবলম্বন নেই। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) -এর ধরাপৃষ্ঠে আগমন সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থসমূহে যে সব বর্ণনা রয়েছে তার মধ্য থেকে জনাব মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা সাহেব প্রণীত "পর ধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)" থেকে এখানে কতিপয় উদ্ধৃতি দেয়া হল ঃ-

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শেষনবী (ছাঃ) ঃ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই হলেন বিশ্বনবী। তিনিই হলেন সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্তা'আলার করুণাস্বরূপ। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর (সাঃ) পবিত্র আগমনের জন্যে ছিলো উদগ্রীব। পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

সব নবী (আঃ) এবং সব ধর্ম সংস্কারকগণ তাঁর শুভজন্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। তিনিই বিশ্বের কিতাবী, লা-কিতাবী নির্বিশেষে সকল মতের, সকল শ্রেণীর ও সকল গোত্রের মানুষের কাংখিত ত্রাণকর্তা এবং ইহ-পারলৌকিক মুক্তিদাতা। পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতেও সর্বশেষ নবী (ছাঃ) -এর আগমন সংবাদ এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবিগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। এসব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে তাঁর আবির্ভাব ও ধর্মবিস্তারের আলোচনাই বক্ষ্যমান অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হলো।

হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে শেষনবী ঃ হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থেই 'হিন্দুধর্ম' কথাটির উল্লেখ নেই। সনাতন ধর্ম নামে এটা সেখানে বর্ণিত হয়েছে। এ ধর্মের বেদ, গীতা, পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থে শেষ অবতার বা শেষ নবী (সাঃ) -এর উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনতার কারণে হিন্দুধর্মগুলো পৌত্তলিকতার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। সেগুলো থেকে সত্যকে আহরণ করে গ্রহণ করা এখন অনেকটা শ্রমসাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যানুসন্ধানী সেগুলোতে অন্তিম অবতার বা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর আবির্ভাব, নাম-পরিচয়, ধর্মপ্রচার, যুদ্ধবিগ্রহ, তাঁর উপর দরুদ পাঠের ফজিলত এমন কি তাঁর সহচরগণের কার্যাবলী সম্পর্কেও অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাংলা, উর্দূ ও সংস্কৃতি ভাষায় পারদর্শী অনেক মান্যবর পন্ডিত গবেষণা করে এসব তথ্যাবলী ঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের 'একমেবা দ্বিতীয়ম' মূলমন্ত্রটি ইসলামের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' -এরই প্রতিধ্বনি। "ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লাল্লোত ইল্লল্লাং" অর্থাৎ "পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ সূক্ষ্ম পদার্থের স্রষ্টা আল্লাহ্। আল্লাহ্ পূণ্যবানদের প্রভু, একমাত্র আল্লাহ্কেই আল্লাহ্ বলে কর আহ্বান।"

এ ধর্মের গ্রন্থগুলোর অনেক স্থানে শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রসঙ্গ রয়েছে। সেগুলো হতে দেখা যায় যে, কোথাও তাঁর কার্যাবলী দ্বারা তাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে, কোথাও তাঁর নাম (মোহাম্মদ) উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে, কোথাও যে অবতারের নামের প্রথম অক্ষর ম এবং শেষ অক্ষর দ তাঁকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আবার কোন স্থানে নরাশংস বা 'প্রশংসিতজন' বলে তাঁর (সাঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অন্যতম নাম 'আহমদ' -এর উল্লেখও রয়েছে ঋগ্বেদের 'কীরি' শব্দের মধ্যে। আবার কল্কি অবতারও তিনিই।

হিন্দু শাস্ত্রের যেসব স্থানে শেষ নবীর প্রসঙ্গ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে বর্ণিত হলো ঃ-

(ক) অল্লোপনিষদে 'আল্লাহ্' 'মোহাম্মদ' 'রসুল'- তিনটি আরবী শব্দযোগে যে শ্লোকটি লিখিত আছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। যথাঃ

www.pathagar.com

হোতার মিদ্রো হোতার মিদ্রো মহাসু, রিদ্রাঃ।

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মনং অল্লাম।

অল্লো রসুল মহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাম।

আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকংল্লান লির্খাতকম।

অর্থাৎ– "দেবতাদের রাজা আল্লাহ্ আদি ও সকলের বড় ইন্দ্রের গুরু। আল্লাহ পূর্ণ ব্রহ্মা, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল পরম বরণীয়, আল্লাই আল্লাহ্। তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আল্লাহ্ অক্ষয়, অব্যয়, স্বয়ম্ভু।"

(খ) সামবেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গন্ধও নেই। সেখানে যার কথা আছে তার নামঃ

"মদৌ বর্তিতা দেবা দ কারান্তে প্রকৃত্তিতা।

বৃষানাং ভক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচ স্মৃতা।"

অর্থাৎ– "যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' ও শেষ অক্ষর 'দ' এবং যিনি বৃষমাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করবেন, তিনিই হবেন বেদানুযায়ী ঋষি।" মোহাম্মদ (সাঃ) নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর বেদের নির্দেশ মত যথাক্রমে 'ম' ও 'দ' হওয়াতে তাঁকেই মান্য করাও শাস্ত্রেরই নির্দেশ। তিনিই গোমাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্যে পুনঃ বৈধ করেছেন। পুর্বে ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ গোমাংস ভক্ষণ করতেন, এর ভুরি ভুরি নজির শাস্ত্রে রয়েছে। রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকান্ডে লিখিত আছে– 'রাম গোমাংস ভক্ষণ করতেন।' সেখানে আরো আছে- "বশিষ্ঠ্য মুণি মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া বিশ্বমিত্রকে তাঁর সেনাগণের সহিত ভোজন করিয়েছিলেন।" আরো লেখা আছে– "ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে গোমাংসাদি দিয়ে পরিতুষ্ট সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন ও তৎকালে বিশ্বমিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দশ সহস্র গোভক্ষণ করেছিলেন।" মহর্ষি পানিনি বলেন ঃ "অতিথি আগমন করলে তাঁর জন্য গোহনন করবে।"

আল্লাহ্র শেষ নবী (সাঃ) হিন্দুশাস্ত্রের লুপ্ত বিধান গোমাংস ভক্ষণকে পুনঃ বৈধ করেন। কিন্তু বর্তমান শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বার্থে স্বহস্তে রচিত গ্রন্থে গোহত্যা মহাপাপ বলে উল্লেখ করে হিন্দুধর্মের একটি বিধান নষ্ট করেছেন। মুসলমানগণ এখন হিন্দুধর্মের সেই বিধানটি পালন করছেন। মুসলমানরা মূল বেদে বিশ্বাসী। বেদের শিক্ষানুসারে তারা অদ্বিতীয় আল্লাহ্তে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রমাণিত অন্তিম অবতার মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর পদানুসরণ করছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নবী যজুর্বেদে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ঃ-

(গ) "অল্লো রসূল মহম্মদ রকং বরস্য।"

অর্থাৎ- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং পরম বরণীয়। এটা সামবেদে আদিতে 'ম' ও শেষে 'দ' অক্ষর যুক্ত বেদবাণীর সমর্থক। ভবিষ্য পুরাণে আছে।

www.pathagar.com

এতস্মিন্নন্তিরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ।।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম।
চন্দনাদিভির ভ্যর্চ্য তুষ্টাব মনসা হরম্।।
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহু মায়া প্রবর্তিনে।।
শ্লেচ্ছৈর্গণ্ডায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরুপিণে।
ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি শরণার্থমু পাগতম্।।

ভাবানুবাদঃ যথাসময়ে 'মহামদ' নামে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন যাঁর নির্বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)। সাথে স্বীয় সহচরবৃন্দও থাকবেন।

হে মরুর প্রভু! হে জগতগুরু! আপনার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ। আপনি জগতের সমুদয় কলুসাদি ধ্বংসের উপায় অবগত আছেন। আপনাকে প্রণতি জানাই।

হে মহাত্মা! আমরা আপনার দাসানুদাস। আমাদেরকে আপনার পদমূলে আশ্রয় প্রদান করুন।

"এতস্মিন্নন্তিরে ম্লেচ্ছ ও আচার্য সমন্বিতঃ।
মহাম্মদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ।"

এ শ্লোকের 'ম্লেচ্ছ' ও 'আচার্য' শব্দগুলোর ব্যাখ্যা হলো- আরবের আদিম পৌত্তলিক অধিবাসীকে দূরাগত আচার্যেরা ম্লেচ্ছ বলতেন। যেমন ভারতে আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে আর্যরা শুদ্র বলতেন। আরবের আচার্য বংশই ছিলো শেষ নবীর পিতৃবংশ।

আল্লাহ্তা'আলা মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে সত্য পথ প্রদর্শক নবী করে পাঠিয়েছেন। তাঁর সঠিক পরিচয় বেদ-পুরণাদিতে পূর্ব হতে লিপিবদ্ধ আছে।

(ঘ) ছান্দোগ্য উপনিষদে (১৬/৬) তাঁর (সাঃ) পরিচয় এভাবে আছে ঃ

"হিরন্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কেশ-শ্মশ্রু হয় তাঁর হিরণ্য মন্ডিত।।
পদনখ পর্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণার বিন্দসম শোভে নেত্রদ্বয়।।
'উৎ' অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্বপাপের উর্দ্ধে তিনি রণ।।
ইতিতত্ত্ব অবগত আছেন যে জন;
তিনিও পাপের উর্দ্ধে অবস্থিত হন।
ইতিতত্ত্ব দেব পক্ষে ঃ অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরক্ষি দর্পণেতে।"

www.pathagar.com

এ শ্লোকটি পাঠে বুঝা যায় যে, সর্বধর্মী আল্লাহ্ জানতেন যে, কলিযুগের হিন্দুগণ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও বেদের অদ্বিতীয় আল্লাকে ভুলে বিপদগামী হবে। তজ্জন্যই আল্লাহ্ শেষ নবীর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা শেষ করে বলেছেন যে, তিনি 'উৎ' অর্থাৎ দশম অবতার; "ইতিতত্ত্ব দেবপক্ষে" বাক্য হতে জানা যায় যে, তাঁর পরে সত্য পথ প্রদর্শক আর কোন অবতারের আবির্ভাব হবে না। এ সমাচার জেনে যিনি তাঁর অনুসরণ করবেন তিনিই নিষ্পাপ হয়ে মোক্ষ লাভ করবেন।

(ঙ) শাস্ত্র-প্রণেতা মুনি-ঋষিরা স্পষ্টভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুরণের উপর পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল বলে ব্যক্ত করেছেন-

লা-ইলাহা হরতি পাপম
ইল্ল ইলহা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠ অপ ইনুতি
তজপি নাম মুহামদম্।।

- উত্তরায়নন বেদ।

ভাবানুবাদ ঃ 'লা-ইলাহা .....'-এর আশ্রয় ব্যতীত পাপমুক্তির কোনো উপায় নেই। ইলাহ্ (আল্লাহ্) -এর আশ্রয়ই প্রকৃত আশ্রয়। বৈকুণ্ঠে জন্মলাভের আশা করলে ইলাহ-র আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর এ জন্যে মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ অপরিহার্য।

(চ) শেষ অবতার সম্পর্কে বেদের আরো কয়েকটি শ্লোক দেখুন ঃ

"যো রধ্রস্য চোদিত্য যঃ কৃশস্য
যো ব্রণো নাম মানস্য কীরে"ঃ

-ঋগ্বেদ ঃ ২ ঃ ১২ ঃ ৬।

অর্থাৎ যিনি তাঁর ভক্ত, তিনিই তাঁর (প্রভুর) সাথে সম্পর্কিত। ঋগ্বেদে উক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির 'কীরি' নামকরণ করা হয়েছে। এ 'কীরি' শব্দের বাংলা অর্থ মহাপ্রভুর সর্বশেষ প্রশংসাকারী যার আরবী প্রতিশব্দ হলো 'আহমদ'। এমনিভাবে অসংখ্য উক্তি রয়েছে ইসলাম ধর্মের মহান রাসুল ও সর্বশেষ নবী সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে।

২। **ইহুদী ধর্মগ্রন্থ 'তাওরাত' ও খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ 'ইঞ্জিলে' সর্বশেষ নবী (সাঃ) ঃ** তাওরাতে বা পুরাতন বাইবেলে এ মহামান্বিত ও মহাপ্রশংসিত শেষ নবীর বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে তিনি কোন্ দেশে আবির্ভূত হবেন তাও বর্ণিত হয়েছে, যা পাঠ করে পাঠক মহান নবীর পরিচয় অনায়াসেই লাভ করতে পারেন। যেমন ঃ

(ক) মূসার (আঃ) বর্ণনা "সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদয় হইলেন, পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন"। (দ্বিতীয় বিবরণ- ৩৩ঃ২)।

www.pathagar.com

"সীনয়" পর্বতে হযরত মূসা (আঃ) নবী হওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন, "সেয়ীর" পর্বতে হযরত ঈসা (আঃ) নবী হওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন, 'পারণ' পর্বতে (আরবীতে হেরা) হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন।

(খ) "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সাদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব"। (দ্বীঃ ১৮ঃ১৮,১৯)।

এখানে চিহ্নিত ভ্রাতৃগণ দ্বারা বনি ইসমাইল ও 'আমার বাক্য' দ্বারা কুরআন শরীফ বুঝাইয়াছে; কারণ কুরআন শরীফের প্রত্যেক সূরা আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে যে, "আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সে কথা যা সে বলেছিল ঃ হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছুল; আমি সত্যতা স্বীকারকারী সেই তাওরাতের যা আমার পুর্বে এসেছে এবং বিদ্যমান আছে এবং আমি সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাছুলের যে আমার পরে আসবে এবং তাঁর নাম হবে 'আহমদ'।- (ছুরা- আস্‌সাফ্‌ফ ঃ ৬)।

হযরত ঈসা (আঃ) -এর এ কথা ঐ সুসংবাদের প্রতি ইংগিত করে যা রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) সম্পর্কে হযরত মুসা (আঃ)তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন। তাতে তিনি বলেনঃ

এক নবীর আবির্ভাব ঘটাবোঃ "প্রভু, তোমাদের খোদা, তোমাদের মধ্য থেকেই অর্থাৎ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমারই মতো একজন নবীর আবির্ভাব ঘটাবেন। তোমরা তার কথা মেনে চলো। এ হচ্ছে তোমাদের সে দোয়ার ফল যা তোমরা হোরেবের সমাবেশে তোমাদের প্রভুর কাছে করেছিলে। তোমরা দোয়া করেছিলে যে, আমাকে যেন পুনরায় আমার প্রভুর আওয়াজ শুনতে না হয়, আর না এমন কোন মহা অগ্নি দেখতে পাই যাতে করে আমি মরে যাই এবং প্রভু আমাকে বললেন, তারা যা কিছু বলছে, ঠিকই বলছে। আমি তাদের জন্যে তাদেরই ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতন একজন নবীর আবির্ভাব করবো এবং আমার বাণী তার মুখে নিক্ষেপ করবো এবং যা কিছু হুকুম তাকে করবো তাই সে তাদেরকে বলবে। সে আমার নাম নিয়ে যা বলবে, তা যারা শুনবে না, আমি তাদের হিসাব নেব"। - (তাওরাতের- পঞ্চম Deutronomy ১৮ঃ ১৫-১৯)।

তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এ হচ্ছে তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আরোপিত হতে পারে না। এতে হযরত মুসা

www.pathagar.com

(আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন ঃ "আমি তোমার জন্যে তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাব করবো।" প্রকাশ থাকে যে, বনি ইসরাইলের বংশীয় ভাই হলো বনি ইসমাঈল। এ উভয় গোত্রই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর বংশধর। আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বনি ইসমাঈলের অন্তর্গত ছিলেন। তাছাড়া হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে ঃ

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স-(রাঃ) - এর সহিত সাক্ষাৎ করে বললাম ঃ আপনি আমাকে রাসুলুল্লাহ সম্বন্ধে তাওরাতে লিখিত গুণাবলীর সংবাদ দিন! তিনি বললেন- কসম খোদার, কোরআনে উল্লিখিত কতক গুণাবলীর দ্বারা তিনি তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছেন – "হে নবী, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা, সতর্ককারী এবং নিরক্ষর সম্প্রদায়ের জন্য আশ্রয়স্থল করেছি। তুমি আমার সেবক রাসুল, তোমাকে নির্ভরকারী নাম দিয়েছি।" তিনি কর্কশভাষী নহেন, কঠোর-হৃদয় নহেন, বাজারে কলহকারী নহেন। ক্ষতির প্রতিশোধে তিনি ক্ষতি করেন না ; বরং মার্জনা ও ক্ষমা করেন। (মিশকাত-বোখারী ও দারমীর বরাতে)।

"বস্তুতঃ আমি তোমাদের বলি যে, যদি মুসার কেতাব থেকে সত্যকে বিকৃত করা না হতো, তাহলে আল্লাহ আমাদের পিতা দাউদকে দ্বিতীয় কেতাব দিতেন না। আর যদি দাউদের কেতাবে বিকৃতি সাধন করা না হতো, তাহলে আল্লাহ্ আমাকে ইঞ্জিল দিতেন না। কারণ আমাদের আল্লাহ্ পরিবর্তনশীল নন এবং তিনি সকল মানুষের জন্যে একই পয়গাম দিয়েছে। অতএব যখন আল্লাহ্র রসুল আসবেন, খোদাহীন লোকেরা আমার কেতাবের যে বিকৃতি করেছে, তা তিনি পরিষ্কার করে দেবেন।" (অধ্যায়- ১২৪)।

বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে ঃ প্রাচীন ধর্মগুলোর অন্যতম হলো বৌদ্ধধর্ম যার প্রচারক ছিলেন গৌতমবুদ্ধ (৫৬৭-৪৮৫ খৃঃ পূঃ)। এ ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘানিকায়া'তে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম হবে মেত্তেয় (মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ। এখানে 'মৈত্রেয়' শব্দ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, গৌতমের পরে তিনি একমাত্র ধর্ম প্রচারক যিনি জগতের করুণা বা রাহমাতুল্লীল আলামীন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 'মৈত্রেয়' -এর অর্থ হচ্ছে করুণার আধার বা সকলেরই মিত্র। সিংহল হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্যেও উপরের কথার সমর্থন মিলে ঃ -

ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদেরকে উপদেশ দেবে?" বুদ্ধ বললেনঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন- আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত..... তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।" আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাঁকে আমরা

www.pathagar.com

কিভাবে চিনতে পারবো? বুদ্ধ বললেনঃ তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়। - (গসপেল অব বুদ্ধা কৃত কেরাস।)

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে ঃ ইরানী বা পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। এ ধর্মের প্রবর্তক হলেন জরথুষ্ট (৬৬০-৫৮৩ খৃঃ পূঃ)। জিন্দাবেস্তায় হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এমন কি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। এখানে মুল শ্লোকের অনুবাদ দেখুন ঃ

"আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।" - (জেন্দ আবেস্তা, প্রথম পর্ব- পৃঃ ১৬০ ম্যাক্সমূলার অনুদিত) 'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এর সারমর্ম এরূপ ঃ-

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন- যাঁহার শিষ্যেরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপুজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহিমের কাবা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হইবে। সেই মহা-পুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।"

তাহারা পারশ্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ্ প্রভৃতি পারশ্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করিবে। তাহাদের নবী একজন বাগ্মীপুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন। - (Muhammad in World Scriptures by A. Haq Vidyarthi p. 47).

শিখধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী প্রসঙ্গ ঃ শিখ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ)। তাঁর উপদেশাবলী 'জনম সাখী ভাই বালা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আধুনিক শিখ সমাজ এ পুস্তকটিকেই 'গ্রন্থ সাহেব' নামকরণ করেছে। গুরু নানক বলেন ঃ "বর্তমানে বেদ-পুরাণের যুগ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে কুরআনই জগদ্বাসীর একমাত্র পথপ্রদর্শক ঐশীগ্রন্থ। মানুষ কেন বর্তমানে অশান্তিময় এবং নরকের পথে ধাবমান, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, নবীর উপর তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নাই।" শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' -এর ১৭৪ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"কলমাইক পুকারেয়া দোজাহানে কোয়ী
যো কহেম নাপাক হ্যায়, দোজখজওন সোয়ী।"

অর্থাৎ "একমাত্র কলেমা তৈয়ব সতত পড়িবে, উহা ভিন্ন সঙ্গের সাথী কিছু নাই। যে উহা না পড়িবে সে দোজখে যাইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ

www.pathagar.com

"তৌরিত, জবুর, ইঞ্জিল তেরে পড়হ শুন দেখে বেদ।

রহি কুরআন কেতাব কলি যুগ মে পরওয়ার।"

অর্থাৎ "তৌরিৎ, জবুর, ইঞ্জিল ও বেদ পড়ে দেখেছি " কিন্তু এই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ 'যাহা কলি যুগে মানবের মুক্তি দিতে একমাত্র সমর্থ।' গ্রন্থ সাহেবের ১নং মহল্লায় ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ঃ

"হুজ্জত রাহে শয়তান দি কিতা জিনহা কবুল।

সো ওরগে ডোহিনা লে' করে না সাফায়াৎ রসুল।"

অর্থাৎ "যে সব লোক সৎ পথ ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে শয়তানীর পথে, রসুল করবেন না তাদের সাফায়াত।" গ্রন্থ সাহেবের ২২১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

"ফরিদা বে-নামাজা কুতেরা এ ভিন্নরিৎ

কভি চল না আয়া পঞ্চে ওক্ত মজিদ।"

অর্থাৎ "হে ফরিদ! বে-নামাজীর স্বভাব ঠিক কুকুরের ন্যায়- যে রত থাকে সমুদয় পার্থিব অপবিত্রতায়, পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য যে একবারও যায় না মসজিদে।"

পরধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবী (সাঃ) প্রসঙ্গে ইংরেজী উর্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অনেক পন্ডিত ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা সেখানে প্রমাণ করেছেন যে, সনাতন (হিন্দু) ধর্মসহ সকল ধর্মের মানুষকেই সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে মানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে, তবেই ইহ -পারলৌকিক মুক্তি পাওয়া যাবে।

(গ্রন্থ সাহেবের বাণীগুলো ডঃ ইসমাইল হোসেনের 'হিন্দু শাস্ত্রে শেষ নবী' এবং মোঃ মাহতাব উদ্দীন খাঁ 'মরতযাপুরীর সত্য ধর্ম বা মুক্তির পথ' পুস্তকগুলো হতে উদ্ধৃত হলো)- (পরধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী (ছাঃ))।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীরসমুহ থেকে ইহা অতি স্পষ্ট যে ভূ-পৃষ্ঠে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর আগমন বার্তা তাঁর আগমনের বহু পুর্বেই আল্লাহতা'য়ালা অন্যান্য আসমানী কিতাব বা অবতারিত ধর্মগ্রন্থসমুহে সুস্পষ্টভাবে অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, আদি মানব হজরত আদম (আঃ)-কে ধরাতলে প্রেরণের সময় মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছিলেন যে, বিশ্বমাঝে মানব জাতির (আদম সন্তানদের) অবস্থানকালে তাদের চলার পথে পাথেয়স্বরূপ সময় সময় হেদায়েত তথা- আল্লাহর তরফ থেকে শরীয়তি বিধানমালা প্রেরণ করা হবে। যারা তাঁর সে সব হেদায়েত অবলম্বন করতঃ জীবন পরিচালনা করবে তারাই হবে সফলকাম এবং তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি বা দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। অন্যথায় তাদেরকে জাহান্নামের প্রজ্জলিত অগ্নির মাধ্যমে কঠোর শাস্তি

www.pathagar.com

ভোগ করানো হবে। (সুরা- বাকারা, আয়াত- ৩৮-৩৯)। উপরোল্লিখিত তফসীরসমূহ থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীতে মানুষকে সঠিকপথে চলার জন্য হেদায়েত প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্বমাঝে সময় সময় নবী-রাছুল প্রেরণের অগ্রিম ঘোষণার বাস্তবায়নস্বরূপই শেষ পর্যায়ে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর ভূ-পৃষ্ঠে আগমন, আর তাঁর আগমন বার্তা সুনির্দিষ্টভাবেই পূর্ববর্তী অবতারিত ধর্মগ্রন্থসমূহে (আসমানী কিতাবসমূহে) স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সেজন্যই তিনি হচ্ছেন প্রতিশ্রুত নবী এবং শেষ নবী (ছাঃ)-ও বটে। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাও এ ঘোষণাই দিয়েছেন মুহাম্মদ 'তোমাদের লোকদের মধ্যে কারো পিতা নহেন বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র রাছুল ও নবীগণের শেষ।'

এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বমাঝে তাঁর রাছুল 'আহমদ' তথা মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর প্রেরণের অগ্রিম ঘোষণা অতি নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন- আল্লাহর বাণী– যা কোন মানুষ/জ্বিন বা অন্য কেহই রচনা করতে পারবে না বলে কোরআনের বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ

মহান আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে তাঁরই খলিফা বা প্রতিনিধি অর্থাৎ মনুষ্যজাতি প্রেরণের সময় বলে দিয়েছিলেন যে মানুষকে বিশ্বমাঝে আল্লাহর প্রদর্শিত সঠিক, সুষ্ঠ, সহজ-সরল, সৎপথে চলার সুবিধার জন্য তথা- স্রষ্টার উদ্দেশ্যে মোতাবেক জীবন পরিচালনার সুবিধার্থে স্বয়ং সৃষ্টা কর্তৃক সময় সময় (নবী রাছুলগনের মাধ্যমে) পথ নির্দেশ প্রেরণ করবেন। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন– **"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবই নীচে (পৃথিবীতে) নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত (পথ নির্দেশ/জীবন বিধান তথা- শরীয়তি বিধামমালা) পৌছে, তবে যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) সে চিন্তাগ্রস্থ ও সন্তপ্ত হবে। আর যারা তা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে (আয়াত গুলোকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী (দোজখবাসী) অনন্তকাল সেখানে তারা থাকবে"** (সূরা বাকারা, আয়াত-৩৮-৩৯)।

পৃথিবীতে প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য (১ লক্ষ বা ২ লক্ষ চল্লিশ হাজার) নবী রাছুলগনের মাধ্যমে পূর্ব- ঘোষিত পথ নির্দেশ বা শরীয়তি বিধানমালা প্রেরণ করা হয়েছে। আল-কোরআনই হচ্ছে মানব জাতীর জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট ঐশী/আসমানী গ্রন্থ বা পূর্নাংগ জীবনবিধান। স্রষ্টা কর্তৃক সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপী নাজিলকৃত সূরা/আয়াত/বাক্যগুলির একত্র সংকলনকেই কোরআন বলা হয়ে থাকে। এই কোরআনের বিভিন্ন সূরা/আয়াত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার/পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে। আর এইসব পটভূমিকেই "শানে নজুল" বা নাজিলের কারণ বলা হয়ে থাকে।

তৎকালীন আরব বিশেষ করে মক্কা নগরী ছিল কাফের, মুশরিক/মূর্তিপূজকদের প্রধান ঘাটি। এই মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে তৌহিদের আহবান জানিয়ে যখন আল-কোরআনের বিভিন্ন সূরা/আয়াত নাজিল হতে থাকে তখন থেকেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রচন্ড বিরোধীতা ও প্রতিরোধ। তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর নাজিলকৃত একশ্বরবাদের ধারক/বাহক কোরআনকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে কবি, কাহেন, পাগল, যাদুঘর, ইত্যাদি বিভিন্ন অপবাদ দিতে থাকে (অথচ কোরআন নাজিলের পূর্বে তিনিই তাদের জন্য ছিলেন "আল-আমীন" তথা- বিশ্বস্ততম ব্যক্তি। এরই প্রতিবাদে আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, আমার রাছুল (ছাঃ) তোমাদের ধারণা/অনুমান মোতাবেক কোন যাদুকর নহেন। অথবা গাগলও নহেন

www.pathagar.com

(সূরা- ক্বালাম, আয়াত-২)। বরং তিনি আমারই প্রেরিত রাছুল এবং তাঁর উপর যে বাণী/কিতাব নাজিল হচ্ছে তা আমারই কালাম/বাণী। আমার বাণী/কালামকে যদি তোমরা অস্বীকার কর বা সন্দেহ কর বা ইহা যদি আমার নবী মুহাম্মদ এর নিজস্ব কথা বা কালাম মনে করে থাক তবে তোমরা শুনে মানে মর্যাদায় এর তুলনীয় বা সমকক্ষ একটি কোরআন বা এর কোন একটি সূরা/আয়াত তৈরী করে এনে দেখাও। তোমাদের ধারণা মতে নিরক্ষর মুহাম্মদ যদি কোরআনের মত একটা মহাগ্রন্থ রচনা করতে পারে, তবে তোমাদের না পারার তো কোন কারণ নেই। আল-কোরআনে কাফের, মুশরিক, মুনাফেক, জড়বাদী, বস্তুবাদী নাস্তিকদেরকে কোরআনের মত শুণে মানে একটি কোরআন বা এর সমকক্ষ একটি সূরা/আয়াত বা বাক্য তৈরী করে এনে দেখাবার জন্য বার বার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তরজমা ও তফসীর সমূহ ঃ

১। **"আপনি বলে দিন যে, যদি সমস্ত মানুষ এবং জ্বিন-সকলেই যদি এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এরূপ কোরআন রচনা করে আনবে, তথাপি এরূপ (কোরআন) আনয়ন করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৮৮)।**

(ক) উপরোক্ত আয়াতে সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে সম্বোধন করে দাবী করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর, বরং একে যদি কোন মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরা এর সমতুল্য কালাম রচনা করে দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জ্বিনদেরকেও সাথে নিয়ে নাও। অতঃপর (আমি জানি যে,) সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

বলা-বাহুল্য কোরআনের উপরোক্ত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য তখনকার দিনের আরবের বিখ্যাত কবি/লেখকগণ অনেক চেষ্টা করেছিল। চেষ্টার পর চেষ্টা করেও মান, মর্যাদায়, অলৌকিকতায় শেফাসম্পন্ন, (রোগারোগ্য ক্ষমতা সম্পন্ন) শ্রেষ্ঠতম মনোরম, মনোহর ভাষায় গঠিত কোরআনের একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আয়াতের (বাক্যের) সমকক্ষ একটি বাক্যও তৈরী করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

(খ) **কোরআনের অলৌকিকতা**- পবিত্র কোরআন শরিফ যে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট, অলৌকিক ও অনুপম স্বর্গীয় গ্রন্থ এবং উহা হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নবুয়তের এক অলৌকিক নিদর্শন ও উজ্জলতম প্রমাণ, এই আয়াতটি তৎসমন্ধীয় একটি জোড়ালো ঘোষনা। অবিশ্বাসী, কাফের, বিভ্রান্ত ইহুদী ও বিপথগামী খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অনেক সময়ে আস্ফালন করে বলত যে, তারাও কোরআন শরীফের সদৃশ্য গ্রন্থ রচনা করবে (এবং তারা ইহা করতে সক্ষম)। তাদের ঐ অসার আস্ফালনের উত্তরেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অবিশ্বাসীদের এরূপ ব্যর্থ দাবীর উত্তরে ইতিপূর্বেও তাদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারী দেব-দেবী ও পরামর্শ দাতা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে কোরান শরিফের সদৃশ উচ্চ মর্যাদাশীল অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ, উহার সূরার অনুরূপ সূরা এবং আয়াতের অনুরূপ

www.pathagar.com

আয়াত আনয়ন বা রচনা করবার জন্য একাধিকবাতর প্রকাশ্যভাবে আহবান করা হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত অবিশ্বাসীরা তো দূরের কথা, তাদের দেশ বিখ্যাত বিদ্ধান ব্যক্তিবর্গ ও কবিগণ পর্যন্ত প্রাণপন প্রচেষ্টার পরও উক্ত স্বর্গীয় ভাষার অনুকরণ বা অনুসরণ করতে সমর্থ হয় নাই। এস্থলে পুনর্বার অবিশ্বাসীদিগকে আরও স্পষ্টতর ভাষায় বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, শুধু তোমরা কেন, যদি সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি একত্রে সম্মিলিত হয়ে এই কোরআনের সদৃশ কোন গ্রন্থ বা কালাম/বাণী রচনা করতে চেষ্টিত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেও থাকে, তথাপি তারা আমার এই সর্বগুনে গুনান্বিত স্বর্গীয় কোরানের অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(২) **"তবে কি তারা এরূপ বলে যে, আপনি ইহা (কোরআন) নিজে গঠন করেছেন ঃ আপনি বলে দিন, তবে তোমরাও এর মত গঠিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতিত যাকে আহ্বান করতে পার আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক (তোমাদের দাবীতে)। অতঃপর এই কাফিরেরা যদি তোমাদের ফরমাইশ পূরা করতে না পারে, তবে তোমরা বিশ্বাস কর যে, এই কোরআন আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা অবর্তীণ হয়েছে এবং ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, (তবে ইহা জানার পর) এখনও কি তোমরা মুসলমান হবে (না)?" (সূরা হুদ, আয়াত ১৩-১৪)।** তফসীর ঃ

অবিশ্বাসীরা কোরান শরিফকে প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয় বাণী বলে বিশ্বাস করত না। তারা বলত যে, ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং রচনা করেছেন। অবিশ্বাসীদের এ অসংগত ও ভিত্তিহীন উক্তির অসারতা প্রকাশ করে ঐশী বাণী কোরানের সত্যতা ও অলৌকিকতা প্রমাণ করবার জন্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরানের মধ্যেই বার বার তাদেরকে জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তৎকালীন ও আধুনিক অবিশ্বাসীকূল যুগান্তব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই আহ্বানের উত্তর দিতে পারে নাই। তাই আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং প্রকাশ্য ভাষায় একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, ইহা একমাত্র আমারই জ্ঞান সঞ্জাত পবিত্র বাণী। কবি, ঔপন্যাসিক, মানব-দানব অথবা দেব-দেবীপুঞ্জের কোনই সাধ্য নেই যে, উহার অনুরূপ রচনা করতে পারে। সূতরাং তোমরা কখনই ইহার অনুরূপ রচনা করতে পারবে না। অতএব "হে অবিশ্বাসীকূল, তোমরা এখনও কি আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস করে সত্য ধর্ম গ্রহণ পূর্বক আত্মসমর্পনকারী মুসলমান হবে না?" (তফসীরে কোরান শরিফ সংক্ষেপিত)।

(৩) **"তারা কি এরূপ বলে যে, আপনি ইহা (কোরআন) স্বকল্পিত ভাবে গড়ে নিয়েছেন ? আপনি বলে দিন যে, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং যে যে গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকে) আহ্বান করতে পার, আহ্বান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক (তোমাদের দাবীতে)। বরং তারা এমন বস্তুকে(কোরআনকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করছে যাকে তারা নিজেদের অবগতির (জ্ঞানের) গন্ডীতে আনয়ন করতে পারেনি, আর এখনও তাদের প্রতি উহার (অবিশ্বাসের) পরিনাম ফল পৌছেনি। যে সমস্ত লোক তাদের পূর্বে গত হয়েছে**

www.pathagar.com

তারাও এরূপভাবেই (ঐশী বানীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, এখন দেখ, সেই যালিমদের পরিনাম কিরূপ (ভয়াবহ) হয়েছে)" (সূরা ইউনূস- আয়াত ৩৭-৩৮)। তফসীর ঃ

(পূর্ববর্তী) আয়াতে কোরান শরিফের অলৌকিকত্ব ও মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ উক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতিত অপরের পক্ষে উহার অনুকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই মহাগ্রন্থ পূর্ববর্তী (ঐশী) গ্রন্থ তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং সেই সকল গ্রন্থে ইহার সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে (কোঃ ২-৪১)। তৃতীয়তঃ এইগ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের বিশ্লেষনকারী। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী স্বর্গীয় গ্রন্থের বহু অস্পষ্ট নীতি এবং সংক্ষিপ্ত বিধি-নিষেধ সুস্পষ্টরূপে ও বিষদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের শেষ গ্রন্থ ইঞ্জিলের কথাই আলোচনা করা যাক। উহাতে মানবের সংসার যাত্রা, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্মনীতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরলোক সমন্ধে কোন কথাই তেমন সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়নি। 'সুদ্দুকা' এবং 'ফরিশীগনের' দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়েও হযরত ঈসা (আঃ) অস্পষ্ট আভাস ব্যতিত উহার কোনই সুস্পষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন নাই (মথি ২২,২৩ অধ্যায় দৃষ্টব্য) কিন্তু পবিত্র কোরানে উহার প্রত্যেক বিষয়ই অতি সুন্দর ও সুবিশদ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্ব, সত্যতা ও মহত্ত্ব অবগত হবার পরেও যারা ইহাকে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ বলে অবিশ্বাস এবং মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা করত, তাদেরকে জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, (তোমাদের দাবীতে) তবে তোমরা স্বয়ং অথবা আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের দেব-দেবী, জ্বিন-পরী, কবি-বিদ্বান ব্যক্তি প্রভৃতি যাকে ইচ্ছা আহ্বান পূর্বক তাদের সাহায্যে এরূপ একটি মাত্র সূরাই রচনা করে আন'।

আল্লাহতায়ালা বলছেন যে, আমার অবতারিত স্বর্গীয় গ্রন্থের এ সকল সত্যতা ও অলৌকিকতা অবগত হবার পরেও যারা ইহাকে অবিশ্বাস অথবা মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা করে , নিশ্চয় তাদের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ এবং ইহার তাৎপর্য তারা আদৌ বুঝতে পারে না। ফলতঃ ইহাদের পূর্ববর্তী নুহ, লুত, নমরুদ ও ফেরাউনী সম্প্রদায় সমূহও এরূপে আমার স্বর্গীয় নির্দেশনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তার ফলে সেই সকল সম্প্রদায়ের বিরূপ শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল তা লক্ষ্য করে অবিশ্বাসীদেরও সতর্ক হওয়া একান্ত কর্তব্য। (অন্যথায় তাদের পরিণতি অনুরূপ হতে বাধ্য)। (তফসীরে কোরান শরিফ- সংক্ষেপিত)।

(৪) **"আর যদি তোমরা এই কিতাব সমন্ধে সন্দিহান হও, যা আমি আমার খাছ বান্দার উপর নাযিল করেছি, তবে ভাল কথা, তোমরা ইহার অনুরূপ মাত্র একটি সূরাই রচনা করে দেখাও এবং তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকে লও যারা খোদা থেকে পৃথক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তোমাদের দাবীতে)। অনন্তর যদি তোমরা এই কাজ করতে না পার এবং (আমি জানি) তোমরা কিয়ামত পর্যন্তও তা**

www.pathagar.com

করতে পারবে না, তবে কিন্তু তোমরা আত্মরক্ষা করিও ঐ দোযখ থেকে যার ইন্ধন (হবে) মানুষ এবং পাথর, উহা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩-২৪)। তফসীর ঃ

(ক) যারা কোরান শরিফকে ঐশী গ্রন্থ বলে অবিশ্বাস করেছিল, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান করে বলছেন ঃ হে অবিশ্বাসীগণ, কোরান শরিফ যে আমার অবতারিত গ্রন্থ, এ সমন্ধে তোমাদের যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এমন মনোহর মধুর ভাষা, এমন গভীর উচ্ছাসপূর্ন ভাব, এমন সুললিত উপমা ও আখ্যান, এমন সর্ব সাধারণের বোধগম্য স্বাভাবিক ও সুন্দর উপদেশাবলী এবং এমন উজ্জল ও অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত (এবং সুইচ্চ মান মর্যাদা ও মো'জেজা সম্পন্ন) একটি সূরাই তোমরা স্বয়ং অথবা তোমাদের দেশ বিখ্যাত কবিকুল ও সম্পুজিত দেব-দেবীগণের সহায়তায় রচনা করে আন, তাহলেই বুঝব যে, তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী। কিন্তু ইহা তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব যদি কল্যাণ চাও, তবে আমার কঠোর শাস্তি থেকে ভীত হও এবং আমার পবিত্র বাণী বিশ্বাস করো। বলা বাহুল্য, কোরআন শরিফের এই ঘোষণায় সমস্ত আরববাসী লজ্জায় নির্বোধ ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই ঘোষণার উত্তর দিবার জন্য তাদের সমবেত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও নিস্ফল হয়ে গিয়েছিল। (উল্লেখ্য যে,) একদা আরবের কবি সম্রাট লোবিদ স্বরচিত একটি "কাসিদা" প্রতিযোগীতার জন্য কাবা গৃহের দ্বারে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আরবের তৎকালীন খ্যাতনাম কবিগণের মধ্যে কেহই উহার প্রতিযোগীতা করতে সাহসী হয় নাই। অনন্তর কোরান শরিফের "কাওসার" নামক একটি ক্ষুদ্র সূরা লিখে উহার পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কবি লোবিদ তৎসম্মন্ধে গর্বিতভাবে কাবার দ্বারে গিয়ে উক্ত সূরার প্রথম আয়াত পাঠেই মুগ্ধ হয়ে যান এবং বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে বলে উঠেন- 'প্রত্যাদেশ ব্যতিত এরূপ রচনা মানুষের (পক্ষে) অসম্ভব।' ("লাইসা হাজা কালামুল বাশার")। বলা বাহুল্য কবি লোবিদ তখনই পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কোরান শরিফের মনোহর বাক্যচ্ছটার বিমুগ্ধ এবং উহার হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ইসলাম বিরোধী আরবেরা পরস্পর বলাবলি করতঃ উহার মোহিনী শক্তি মানুষকে তার ধর্ম ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্তমান যুগেও সেল, রডওয়েল, বসওয়ার্থ, স্মীথ, কার্লাইল, গিবন ও ডেবেনপোর্ট প্রভৃতি খ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার (কোরানের) শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম ও অলৌকিকতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছে। ঐশীগ্রন্থ বলে ইহার নীতি ও উপদেশ সমূহ বিজ্ঞান সম্মত এবং সর্ববিধ ভ্রম-প্রমাদ থেকে বিমুক্ত। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী প্রচন্ড অত্যাচার, উৎপীড়ন, অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে "অহি" সমূহ ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও সমগ্র কোরআনের ভাব, ভাষা, নীতি, উপদেশ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। সমগ্র মানব জাতিকে একতা ও ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণ শৃংখলে আবদ্ধ করে তাদের সকল দীনতা, হীনতা ও নীচতা ঘুচিয়ে ফেলে তাদেরকে এক অখন্ড মহাজাতিতে পরিণত করবার জন্যই কোরান শরিফ অবতীর্ণ হয়েছে। কোরান শরিফের

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ও উহাদের আশ্চর্য্যজনক সফলতাই (বাস্তবায়নই) ইহার সত্যতা ও অলৌকিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশেষতঃ কোরান শরিফ দেশ কাল-পাত্র ভেদে সমস্ত জ্ঞান গবেষণার পরিপূর্ণ আধার এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক, আদিভৌমিক ও আদিদৈবিক তত্ত্বের অপূর্ব উৎস স্বরূপ। ফলতঃ আল্লাহর সৃষ্ট জীবজগতের ও জড় জগতের সহিত মানব নির্মিত কৃত্রিম জগতের যে স্পষ্টতর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, আল্লাহর বানী কোরান শরিফের সহিত জগতের মানব রচিত যাবতীয় গ্রন্থাবলীরও সেই পার্থক্য অতি উজ্জলরূপে বিদ্যমান রয়েছে। এই হেতু সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র কোরান শরিফই একাধিকবাতর নিজেকে অনুপন, অতুলনীয় ও অনুকরণীয় স্বর্গীয় গ্রন্থ বলে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছে (তফসীরে- কোরান শরিফ সংক্ষেপিত)।

(খ) আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরাই নিয়ে এসো। কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যস্থ অথচ মুহাম্মদ (ছাঃ) এ বিষয়ে মোটেই অভ্যস্থ নন। এতদসত্বেও তোমরা যখন কোরআনের মাত্র কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ 'মুজে'জা' আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি (মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহরই পয়গম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও (অর্থাৎ দেবদেবীদেরকেও) সংগে নাও (এক আল্লাহকে ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করে রেখেছ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর (আমি জানি) কিয়ামত পর্যন্তও তোমরা তা পারবে না, তবে দোযখের আগুন, যে আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, তা থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে (কৃতঘ্ন) কাফেরদের জন্য।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কলামের অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারগতার আলোকেই এ সত্য সপ্রমানিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরো সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

www.pathagar.com

এজন্য তোমরা বিশ্ব সম্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবেনা। অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবেনা, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা, এতে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের উর্দ্ধে। যার শক্তি সকলের উর্দ্ধে এমন এক মহাসত্বা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তার বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুইটি আয়াতে কোরআনুল করীমকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সর্বাপেক্ষা বড় 'মু'জেযা' হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রাছুল (ছাঃ) এর মু'জেযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জেযা অর্থাৎ, কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইশারা করা হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা হচ্ছে আল-কোরআন এবং এ মু'জেযা অন্যান্য নবী রসুলগণের সাধারণ মু'জেযা হতে সতন্ত্র। কেননা, আল্লাহতায়ালা তাঁর অপার কুদরতে রাছুল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জেযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জেযা যে সমস্ত রাছুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবৎকাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জেযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

"তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সংগে নিয়ে নাও"। এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের যার যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এসব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, যে, যদি তোমরা তা করতে না পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চৈষ্টা কর, যে আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি ('ওয়ালান তাফ আয়ালু') তোমরা কোন সময়ই তা পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন, তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারবেনা। কারণ, তা তোমাদের ক্ষমতার উর্দ্ধে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানমাল, ইজ্জাত, প্রভৃতি সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে কোন ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা কর। তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরো বলা হয়েছে যে, তোমরা আদৌ তা করতে পারবেনা। এমন একটা

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এল না? তাদের সে অপারগতাই কি কোরআন যে আল্লাহর কালাম তার প্রমান হিসাবে যথেষ্ট নয়। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে, কোরআন হুজুর ছাল্লালাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এমন এক জ্বলন্ত মু'জেযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জেযা ঃ অন্যান্য সমস্ত নবী ও রাছুলগনের মু'জেযা সমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জেযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জেযা হুজুর (ছাঃ) এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জেযা সুলভ বৈশিস্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুনীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন 'আয়াত' ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবেনা, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাক।

কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোন কালেই কোন জাতি পেশ করতে পারে নাই, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী (চিরস্থায়ী) মু'জেযা। হুযুরের যুগে, (তাঁর পরের যুগ যুগান্তরেও) যেমন এর নজীর পেশ করা যায়নি অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবেনা।

অন্যন্য কোরআনঃ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিস্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপারগ হলো ?

মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দশত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে পারনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু– এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জেযা হওয়ার অন্যান্য কারণ সমূহ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জেযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব স্ব বর্ণনাভংগীতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার, মহান গ্রন্থটি কোন্ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাংগ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি

www.pathagar.com

থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে ? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথনির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান ভান্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্বারা মানুসের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম শৃংখলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে ?

যে ভুখন্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল 'বাতহা' বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোন কারিগরি শিল্প। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তাঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভুভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করতো। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামে মাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পন্য সামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহর পবিত্রম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসংগতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভুমিষ্ট হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত পালিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগন ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত পালিত হন তিনি। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ন জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ

www.pathagar.com

করা তাঁর পক্ষে কোন অবঅস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানিন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিলনা, যে জন্য আরবজাতিকে 'উম্মী' জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মীজাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না যার সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞান সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে (বিশাল ও ব্যাপক) জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অন্যন্যসাধারণ মু'জেযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে।

তাই মামুলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যেকোন এলাকার লোকই কোন না কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। আদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর 'উম্মী' রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শিখেননি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে কবিরদের জলসা-মজলিস বলতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তমকাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্তা'আলা এমন রুচিদান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এধরনের কবি-জলসায় শরীক হননি। জীবনে কখনও একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদীতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো; সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতেই অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুইটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যাননি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ্য বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহ্বান করেছে যে, যদি একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও।

www.pathagar.com

একদিকে কোরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল, শক্তি-সামর্থ ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যেকোন সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্বাবাসীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষা-শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে,- "কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করেই দেখাও।" যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্ত ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদিও এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবেলা কোনমতেই অসম্ভব হতো না; বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। এমন সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল; কয়েকটি বাক্যও তৈরী করতে পারলো না।

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রসূল (সাঃ)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীগণের প্রতি নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওত্‌বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হুযুর (সাঃ) -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না; তারা কোরআনের

www.pathagar.com

অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষা-শৈলী ও পাণ্ডিত্বের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে; কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহ্‌রই রচিত কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য রকতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আবদে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রষ্টোয় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গন্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে। তারা রসূল (ছাঃ) -এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শসভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করলো। তারা বললো, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (ছাঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলবো? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাঁকে "পাগল" বলে পরিচয় দিয়ে বলবো, তাঁর কথাবার্তা পাগলামীতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরূপ বলতে বারণ করে বলে দিলেন, তখন মানুষ মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাকে 'কবি' বলে পরিচয় দেব। তিনি এরূপ বলতেও নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী। তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝাতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ মন্তব্য করলো যে, তবে আমরা তাকে 'জাদুকর' বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়।

www.pathagar.com

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তাঁর কথাবার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন জাদুকরের নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম "কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নেই। সত্য বলতে কি, এ কালামে অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে। এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পণ্ডিতের বাক্যেও কখনও পাইনি।

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো? ওলীদ বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সববেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগুন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুঁৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। – (খাসায়েসে-কুব্‌রা)।

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,– আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (ছাঃ) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে, কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র কসম; তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (ছাঃ) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরো জেনে রেখ! আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্থা জাদুকরদের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামীপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

www.pathagar.com

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেন, আমর ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবী করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে ? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেহ কবি, কেউ পাগল, কেউবা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবু যর (রাঃ) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি ! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম। আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জাহ্‌ল এবং আখনাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শ্রবণ করতো, কোরআনে অসাধারণ বর্ণনা ভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবু জাহ্‌ল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তা'ই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথাঃ কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জ সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব-রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআন ও কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে জান-মাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

www.pathagar.com

এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুঁয়েমীর মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদি কোন বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্‌রই কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আসআদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রসূল (সাঃ) -এর দরবারে উপস্থিত হতে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযুর (সাঃ) তার জবাব দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক জাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) -এর কালামের অনুরূপ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এসব স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি এমন লোকদের নয়, যারা হুযুর (সাঃ)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সর্বদিক দিয়ে রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমির দরুন মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না।

আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আবু জাহ্‌ল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) এর যবানীতে কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বরে হয়ে আসে এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে বাড়ীর আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ী ফেরার পথে দৈবাৎ রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায় করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ করোনা। কেননা, আরবের সাধারণ লোক এ ব্যাপার জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। পরস্পর এমন কথা বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেল। পরের রাতে পুনরায়

www.pathagar.com

কুরআন শোনার আগ্রহ জেগে উঠে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে সমবেত হয়। রাত শেষে প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাত হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা কোরআন শ্রবণ করার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায়। রাত শেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাত হয়। এবার তাঁরা সবাই বলে যে, চল, এবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর কখনো একাজ করবো না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে শোরাইক লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবু সুফিয়ানের নিকট গিয়ে বলে যে, বল, মুহাম্মদ (ছাঃ) এর কালাম সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আখনাস আবু জাহ্লের বাড়ী গিয়ে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবুজাহ্ল উত্তর দিল, পরিস্কার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে আমাদের গোত্রের শত্রুতা চলে আসছে। তারা কোন ব্যাপারে অগ্রসর হলে আমরা তাতে বাধা দেই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা করেছি। তারা সমগ্র জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে থাকিনি। সমগ্র আরববাসী জানে, আমাদের এ দু'টি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র থেকে এ ঘোষণা করা যে, আমাদের বংশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর নিকট আল্লাহ্র কালাম আসে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোনদিনও আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো না।

এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মু'জেযা, যা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। – (খাসায়েসে- কুব্রা)।

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা– কোরআন ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজী ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজীর শর্তানুযায়ী যে মাল দেয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্য এ মাল গ্রহণও করেননি। কেননা, এরূপ বাজী ধরা শরীয়ত অনুমোদন করেনা। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃষ্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক

www.pathagar.com

মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রসূল (সাঃ) -এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ ঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে ঃ

অর্থাৎ– যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসারণ করবে। আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

অর্থাৎ– তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্ কেন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

ষষ্ঠ কারণ ঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। নাছারা ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে ; সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ "ওয়া লাইয়্যা তামান্নাও হু আবাদান"– অর্থাৎ তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। (নাছারা) ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

www.pathagar.com

সপ্তম কারণ ঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযুর (ছাঃ) -কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শুনেন। হুযুর (ছাঃ) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছেলেন, তখন হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

অর্থাৎ– "তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াক্বীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?"

অষ্টম কারণ ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে কোন বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড়জোর দু-চারবার পাঠ করার পর আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছ হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে।

নবম কারণ ঃ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হয়েছে ; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভূল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল। এবং প্রচার-মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য

www.pathagar.com

কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা ততটুকু সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-না-খাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল্-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জেযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ -সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ ঃ কোরআনে এল্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নীচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তাব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জেযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অ-মুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জেযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রস্কে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায়

www.pathagar.com

অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন– "নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।"

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্য সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছাড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃষ্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগি-মুরতাগ হয়নি।

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তিলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে। আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনে নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন।

অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ' –এ পরিষ্কার ভাবে তা স্বীকার করেছেন। আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন। তাতে কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মু'জেযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই পুস্তক ও কাগজ কলম তিনি হাতে নেননি। এমনকি নিজের নামটুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তাঁর স্বভাব এত শান্তি প্রিয় ছিল যে, খেলা-ধুলা রং-তামশা ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি যোগ দেননি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেননি। এমতাবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার সময় শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ। যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম নয়, তবে এর একটি ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারগ ছিল।

সমগ্র জাতির যারা তাঁকে আল্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং

www.pathagar.com

জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্খা পূরণ করারও ওয়াদা দেয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেননি। সমগ্র জাতি তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহ্‌লে-কিতাব তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর শত্রুরা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নযীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেননি। তাঁর সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরশাদ হয়েছে–

অর্থাৎ– "যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে-এরূপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মু'জেযা যা এর আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো আশ্চর্য হতে হয়।

কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাসও লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শত্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপতি হয়েছিল যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধবিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি লেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুরাইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সন্ধিও ভঙ্গ করে ফেলে এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়িত করার পরিপূর্ণ সুযোগ রসূল (সাঃ) মাত্র দু'এক

www.pathagar.com

বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর হুযুর (ছাঃ) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান মাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয় হয়।

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'উম্মী' নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল এমনই এক জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা-বাদশাহ্‌র শাসন মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প। আরবের মুশরিক এবং ইহুদী-নাসারাগণ তাঁর (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল। এসব কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক যে, যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি সমস্ত লোক বিনা বাক্য ব্যয়ে কোরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন দর্শন, নতুন জীবন-বিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রথেমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ নতুন জাতির গোড়াপত্তন করা, আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার জন্য কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানদির প্রয়োজন হতো ! সেরূপ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আয়ত্বাধীন ছিল? সম্পূর্ণ উশৃংখল এবং আইনের শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোন রূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাতে নযীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান কোরআনের এই দাওয়াত আল্লাহ্‌রই বিশেষ কুদরতে এমন অবিশ্বাস্যভাবে আরব সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

কোরআনের অনন্যসাধারণ মু'জেযা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশী কিতাবাদি রচিত হয়েছে, যার নযীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোটকথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব

www.pathagar.com

না হলেও সংক্ষিপতভঅবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার বরতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহ্‌রই কালাম এবং রসূলে মকবুল (সাঃ) এর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা।

কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ঃ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন এমনও তো হতে পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি ? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাজিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগন্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করত না, অধিকন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্ব্যতীত সূচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায় যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো তখন কোরআনের দুশমনেরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার অনুরূপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হয়তো, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা হতো তবে সে গ্রন্থ রচনার অসারাতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলেমগণও অনেক জবাবী কিতাবাদী অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও যাওয়া যায়নি।

ইসালামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল কায্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য নিশ্চয় রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এত অশ্লীল, যা, কোন রুচিবান মানুষের সামনে উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্ কায্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং যদি কোরআনের মোকাবিলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা -বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো। অন্ততঃ কোরআন বিরোধীদের প্রচেষ্টায় সে সব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশই হতো।

যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত হয়েছে এবং সাথে

www.pathagar.com

সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে কোন কালাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে।

সারকথা, কোরআনের এ দাবীর বিরোধীরা যে একান্ত ভদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে– কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্ত্রের দাবীটি (নাউযুবিল্লাহ) ভুল।

হুযুর আকরাম (ছাঃ) নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েকদিনের জন্য শাম দেশে তসরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পথে 'বুহায়রা' পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুহায়রা ছিলেন তওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দূর্মতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাস্য যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, ভাষার অলংঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন?

ইদানিংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরী করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্‌র কালাম বা মু'জেযা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সা'দী শীরাযীর 'গুলেস্তাঁ', ফয়যীর 'নোকতা বিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মু'জেযা?

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সা'দী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলেম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, ফয়যী বা হারীরী অথবা মুতানব্বী কিংবা অন্য কেউ আরবী ভাষায়, সা'দী প্রমুখ ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার গ্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃতে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তাদের রচনা অন্যান্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয়।

মু'জেযার সংজ্ঞা হল এই যে, তা প্রচলিত নিয়মনীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লেখিত মনীষীবৃন্দের যথারীতি জ্ঞানার্জন, ওস্তাদ -শিক্ষকদের সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না? তাদের কালাম যদি অন্যান্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেননি, কোন

www.pathagar.com

মক্তব-মাদ্রাসার ধারে কাছেও যাননি, তিনি যদি পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সা'দী আর লাখো ফয়েযী যাতে আত্মবিসর্জন দেয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে উহারই অবদান বলে মেনে নেয়, তবে তো বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সা'দী কিংবা ফয়যীর কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকেত পারে? তাঁরা কি নবুওয়তের দাবী করেছেন? তারা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মু'জেযা বলে দাবী করেছেন? কিংবা গোটা বিশ্বকে কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারোও পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল?

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার; বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রন্থণাই যে অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তকে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর এবং নযীর বিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তকই বদলে গেছে। মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আরবের অমার্জিত-বেদুঈনরা তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তাঁরই এই বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলমানগণই দেননি, বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীরাও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধ সমূহ একত্রিত করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে। আর হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল আক্ওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হচ্ছে ঃ

ডঃ গোস্তাওলি তাঁর 'আরবকৃষ্টি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপে দিয়েছেন ঃ

"ইসলামের সে পয়গম্বর নবীয়ে উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে, যার আহ্বান গোটা একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উন্নীত করে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এখনও সেই নবীয়ে উম্মীই আপন সমাধির ভেতর থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন।"

মিঃ গুডওয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন "আমরা যতই এ গ্রন্থকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই সেগুলো আমাদিগকে বিস্মিত করে আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে। এর বর্ণনাভঙ্গি এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ মার্জিত, মহৎ ও দীক্ষাপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে গিয়ে আরোহণ করে। সারকথা, এ গ্রন্থ সর্বযুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।" (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃঃ ১৩)।

www.pathagar.com

মিশরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্ যাগলুল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর গ্রন্থ 'দি ইসলাম' -এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এতে মিঃ কাউন্ট কোরআন সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বিস্ময়ের বিষয় যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে কেমন করে বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর। সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, গোটা মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সমাঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাত্তাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা সেই বাণী যে, ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এতে বর্ণিত বাক্যগুলো যখন হযরত জাফর ইনমে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন তার চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত বিশপ চিৎকার করে উঠেন যে, এ বাণী সে উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আঃ)-এর বাণীসমূহ" – (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃঃ ১৪)।

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার ১৬ তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্টায় বর্ণিত রয়েছে ঃ "কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ্র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র মহত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাধ্যমে আল্লাহ্কে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তি-উপাসনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয়।"

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' -এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছদে লেখেন ঃ

"আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকার একথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমুলক বিধান সাধারণ আইন প্রণয়েনের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়; যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দেয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে কিংবা উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও

www.pathagar.com

অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের লেখকস্বভাব অমুসলমানরাও দিয়েছেন।

কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহাদার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তাঁর সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তাঁর শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ আজকের 'সুদৃঢ়' ও 'সুসংহত' ব্যবস্থাসমূহে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তৎকালিন ইতিহাসে যদি তার কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্ত সমকালের আলোকোজ্জল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি-সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

অর্থাৎ– **"তোমরা যদি তার উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা তৈরী করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।"** (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন-সংক্ষেপিত)।

৫) "তবে কি তারা বলে যে সে মুহাম্মদ (ছাঃ) ইহা (কোরআন) (নিজে) রচনা করেছে? পরন্তু তারা (ইহা) বিশ্বাস করে না। অতএব, যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে (ন্যূনতম পক্ষে) ইহার সদৃশ কোন বাক্যই আনয়ন করুক।" (সূরা তূর আয়াত- ৩৩-৩৪)। তাফসীর ঃ

(ক) অবিশ্বাসী কোরেশদিগের মধ্যে কেহ হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে কবি, কেহ গণক এবং কেহবা 'উন্মাদ' বলে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করত। তাদের যুক্তি ছিল যে, আরবীয় গনকেরা যেরূপ ভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবলে নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত, হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও গণনা বিদ্যার সাহায্যে সেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করতেন, অথবা কবিরা যেরূপ নানা বিষয়ে (কাব্য) রচনা করে লোকদিগকে মুগ্ধ করে, সেইরূপ কোরআনও মুহাম্মদ (ছাঃ) এরই নিজস্ব রচনা; অথবা তাঁর বাক্য সমূহ উন্মাদের প্রলাপোক্তি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উহার কোনই সত্যতা বা সার্থকতা নাই। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও বলত যে, কোন কোন কবি যেমন অল্প দিনের মধ্যেই মরে গিয়ে তাদের রচনাদিসহ বিস্মৃতির সাগরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, মুহাম্মদও সেরূপ অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর রচিত এই কোরানসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এরই উত্তরে আল্লাহতা'য়ালা আলোচ্য আয়াত সমূহে বলে দিয়েছেন যে, হে রাছূল, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি কবি, গায়ক অথবা উন্মাদ নহ। তুমি বিশ্বাসী মানবের

www.pathagar.com

কল্যান সাধনকল্পে আমার এই সদুপদেশপূর্ন বাণী প্রচার করতে থাক এবং যারা তোমার সম্বন্ধে অকল্যান অথবা (মৃত্যু) দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে বলে প্রচার করছে, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা প্রতীক্ষা কর (আমি যা বলছি তা ঠিক কিনা দেখার জন্য) এবং আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করছি (তোমাদের কথা ঠিক তা দেখার জন্য)। অতঃপর কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যার অনুসরনকারী, তা শীঘ্রই প্রমাণিত হয়ে যাবে (অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছাঃ) তাঁর উপর নাজিলকৃত কোরআন সহ ধ্বংস হয়ে যাবে, না কি তোমরা (বিরুদ্ধাচরণকারীরা) ধ্বংস হয়ে যাবে, তা অনতিবিলম্বে পরীক্ষিত হয়ে যাবে) (তফসীরে কোরান শরিফ)।

আল্লাহতায়ালা অবিশ্বাসীদিগকে দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করে বলেছেন, যারা বলে যে, এই কোরআন- 'কবির রচনা' অথবা 'গণকের বাক্য' তারা ইহার সদৃশ্য কোন একটি অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী, মো'জেজা সম্বলিত অথবা (সর্ববিধ বিবেচনায়) উৎকৃষ্টতর বাক্য আনায়ন করুক। বলা বাহুল্য, কোরআন শরীফে অবিশ্বাসীগণকে একাধিকবার আহ্বান করা হলেও তারা ইহার সদৃশ কোন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত, মো'জেজাপূর্ণ, শেফা (রোগমুক্তির ক্ষমতা সম্পন্ন) (মনোমুগ্ধকর এবং প্রচন্ড আবেগ সৃষ্টিকারী) চমৎকার বাক রচনা করতে সমর্থ হয় নাই।

উল্লেখ্য যে 'শেফা' (রোগমুক্তির ক্ষমতা) আল-কোরআনের একটি বিশেষ গুন/বৈশিষ্ট। কোরআন নাজিলের সময় থেকেই সর্বযুগে কোরআনের এ গুণটির অতি কঠোর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এমনকি বিংশ শতাব্দির শেষ লগ্নে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও প্রকৃত কামেল ওয়ালিআল্লাহগণ উহার প্রভাবে অনেক অসম্ভবও সম্ভব করতে সক্ষম।

(খ) অন্য কথায় (উপরোক্ত) আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মক্কার কুরাইশ বংশের যেসব লোক কুরআন মজীদকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিজের রচিত গ্রন্থ মনে করে, তাদের নিজেদের দিল- এ কথা জানে ও বুঝে যে, ইহা কখনই তাঁর নিজের 'কালাম' হতে পারে না। অন্যান্য আরবী ভাষা-ভাষী লোকেরা ইহা শুনে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে, ইহা মানব রচিত কালাম হতে বহু উচ্চতর মান মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কালাম। শুধু তাহাই নহে, যে লোক হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -কে ভালোভাবে চিনে ও জানে সে কখনও কল্পনাও করতে পারে না যে, ইহা তাঁর কালাম হতে পারে! অতএব সোজা ও স্পষ্ট কথা এই যে, কুরআনকে যারা হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর রচিত কালাম বলে, তারা আসলে ইহার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত নহে বলেই এই ধরনের নানা মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে ঈমান আনার দায়িত্ব এড়াতেই চাহে মাত্র, ইহা তাদের নিছক একটা বাহানা। ইহার প্রকৃত কারণ আর কিছুই নেই।

ইহা হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর নিজের রচিত কোন কালাম নহে, কথা শুধু এতটুকুই নহে। আসল সত্যকথা এই যে, ইহা আদৌ মানব রচিত কালাম নহে। এ ধরনের কালাম রচনা করা বস্তুতই মানুষের শক্তি প্রতিভার আওতা হতে অনেক দূরে ও উচ্চে। এখানে ঘোষনা দেয়া হচ্ছে যে, ইহাকে তোমরা যদি মানব রচিত কালাম বলতে

www.pathagar.com

চাও, তাহলে এই মান মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব, অলৌকিত্ব (মু'জিজা) সম্পন্ন কালাম তোমরা নিজেরা রচনা করে দেখাও। তা হলেই মানুষ এ ধরনের কালাম রচনা করতে সক্ষম কিনা তা বুঝতে পারা যাবে। মুলতঃ ইহা আল্লাহর তরফ হতে দেয়া একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ। কেবল কুরাইশ বংশের লোকদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ার আল্লাহকে অমান্যকারী লোকদেরকেই এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে না তখন কেহ সাহস করেছিল, না তারপর আজ পর্যন্ত কুরআনের মুকাবিলায় এক বিন্দু দাঁড়াতে পারে মানুষের রচিত এমন কোন কালাম পেশ করা সম্ভবপর হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কতিপয় লোক এই চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ যথার্থভাবে বুঝতে না পারার কারণে বলে থাকে যে, শুধু কুরআনের ব্যাপারই নহে, একজনের লেখার ভংগী ও ষ্টাইল কি গদ্যে কি পদ্যে- অনুযায়ী অন্য কেহ কোন রচনা লিখতে পারে না, ইহা তো সুস্পষ্ট কথা। হোমার, রুমী, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, গালেব, রবীন্দ্র, ইকবাল, নজরুল- ইহারা সকলেই এবং প্রত্যেকেই এই হিসাবে অনন্য যে, তাদের কাহারও মত কাব্য রচনা করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নহে, হতে পারে না। কাজেই কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের কোন কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু কুরআনের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে যারা এ ধরনের কথা বলে, আসলে তারা একটা অতি বড় ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং তারা কোরআনের অন্তর্নিহিত মর্ম/বাণী অনুধাবনে অক্ষম। তারা মনে করেছে "ফাল্ ইয়া তু বিহাদিসে মিস্লীহি" বলতে কুরআনের ষ্টাইলে কোন গ্রন্থ রচনা করে দেয়ার চ্যালেঞ্জই বুঝি দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের শুধু 'ষ্টাইল' অনুরূপ কালাম রচনার চ্যালেঞ্জ এতে ছিল না। বরং এ চ্যালেঞ্জের তাৎপর্য হল মান, মর্যাদায় এত উচ্চতর বৈশিষ্ট্য ও বিরাট মাহাত্ম্য (ও সম্মোহনী শক্তি সম্পন্ন) অপর একখানি কিতাব পেশ করা। কেবল আরবী ভাষায়ই নহে, দুনিয়ার যে কোন ভাষায় কুরআনের সমান বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য (অলৌকিক গুন) সম্পন্ন কোন গ্রন্থ-ই নিয়ে আসা। কুরআন যেসব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের কারণে মু'জিযা, সে রূপ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সম্পন্ন কোন গ্রন্থ পেশ করবার-ই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এ আয়াতে।

বস্তুত কুরআন মজীদ এক তুলনাহীন ও দৃষ্টান্ত- অসম্ভব অনন্য বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বের অধিকারী গ্রন্থ। ইহা মু'জিযা ছিল তখনও যখন ইহা নাযিল হয়েছিল, তেমনি ইহা মু'জিযা আজিকার দিনেও। এই পর্যায়ে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ-

এক ঃ কুরআন মজীদ যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, সেই ভাষায় সর্বোন্নত ও পূর্ণ পরিণত সাহিত্য মানের চূড়ান্ত নমুনা হয়েছে এই গ্রন্থে। সমস্ত গ্রন্থে একটি শব্দ একটি বাক্যও নিম্নমানের খুজে পাওয়া যাবে না। যে বিষয়েই কথা বলা হয়েছে, অতীব শোভন ও উপযুক্ততম শব্দ বাচন-ভংগীতে তা বলা হয়েছে। একই বিষয় বাব বার বলা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই উহার বলার ভংগী ও ষ্টাইল সম্পূর্ণ অভিনব। ইহার দরুন কোথাও

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তির অশোভনতা পরিলক্ষিত হবে না। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থে শব্দ সংযোজন এমনভাবে হয়েছে যে, মনে হয়, এক একটি মুক্তা মেজে ঘষে বসিয়ে ও জুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কথার ঝংকার ও প্রভাব এতই সুন্দর ও ব্যাপক যে, কোন ভাষাবিদ তা শুনে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত না করে থাকতেই পারে না। এমনকি কুরআনের অমান্যকারী ও বিরুদ্ধবাদীর আত্মাও অভিভূত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ১৪ শত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরও আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থ নিজ ভাষায় সাহিত্যের উচ্চতর নিদর্শন হয়ে রয়েছে। উহার সমান হওয়া তো দূরের কথা, আরবী ভাষার অন্য কোন গ্রন্থই উহার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যমান পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে, এই গ্রন্থ আরবী ভাষাকে এমন শক্তভাবে ধারন করে বসে গিয়েছে যে, ১৪ শত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরও এই ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতার মান তাহাই রয়ে গিয়েছে যা এই গ্রন্থ প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ছিল। অথচ এই দীর্ঘ কালের মধ্যে অন্যান্য ভাষাসমূহ উহাদের রূপ পরিবর্তন করে কোথা থেকে কোথায় পৌছে গিয়েছে। দুনিয়ার অপর কোন ভাষাই এত দীর্ঘ কাল পর্যন্ত শব্দ গঠন, সংযোজন, রচনার ধরন, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদির দিক দিয়ে একই ধরনের উপর দাড়িয়ে থাকে নাই। কেবলমাত্র কুরআনেরই অসীম অমিত শক্তিই আরবী ভাষাকে উহার উচ্চতর মান থেকে বিন্দু মাত্র নড়তে ও বিচ্যুত হতে দেয় নাই। কুরআনে ব্যবহৃত একটি শব্দও পরিত্যক্ত হয় নাই। উহার সব কয়টি কথন আরবী সাহিত্যে আজও ব্যাপক ব্যবহৃত। উহার সাহিত্য আজ পর্যন্তও আরবী ভাষার উচ্চতরমানের সাহিত্য। লিখন ও ভাষনে আজ পর্যন্ত শুদ্ধ ভাষা তাহাই মেনে লওয় হয় যা ১৪ শত বৎসর পূর্বে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। দুনিয়ার কোন ভাষায় মানব রচিত কোন গ্রন্থই কি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছে?

দুই ঃ সারা দুনিয়ার মধ্যে এই একমাত্র গ্রন্থই এমন যা মানব জাতির চিন্তাধারা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন যাপন পদ্ধতির উপর এত ব্যাপক, এত গভীর ও এত সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, যার তুলনা হিসাবে অন্য কোন গ্রন্থই পেশ করা যেতে পারে না। প্রথম পর্যায়ে এই গ্রন্থের প্রভাব একটা বিক্ষিপ্ত যাযাবর বর্বরপ্রায় নিরক্ষর জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে। পরে সেই জাতিটি বিশ্বের একটা বিরাট অংশকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। স্থায়ীভাবে এতটা প্রচন্ড বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে এমন আর একখানি গ্রন্থ কোথায়ও নেই। এই গ্রন্থখানি কেবলমাত্র কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে থাকে নাই, বাস্তব কর্মের জগতে উহার এক একটি শব্দ চিন্তা ও মতবাদ রূপায়ণে এবং সম্পুর্ণ ভিন্নতর এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলবার ব্যাপারে দৃষ্টান্তহীন কাজ করেছে। ১৪শত বৎসর পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উহার এই বিপ্লবী ভূমিকা পূর্ণ মাত্রায় ও সমানভাবে অব্যাহত হয়ে রয়েছে। উহার এই ভূমিকা কিছুমাত্র স্তিমিত নহে, বরং ক্রমশঃ সম্প্রসারিত ও বলিষ্ঠ হয়েই চলেছে।

তিন ঃ এই গ্রন্থে যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশাল। উহার পরিধি অতীত অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বলোকের অন্তর্নিহিত মহাসত্য ও প্রকৃত তত্ত্ব, উহার শুরু ও শেষ - সূচনা ও বিনাশ বা পরিণতি এবং উহার নিয়ম-শৃংখলা ও নীতি-বিধান সম্পর্কে উহাতে কথা বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। এই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক কে, তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় কি, তাঁর কর্মসীমা ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার কত এবং কোন প্রকৃত মহাসত্যের ভিত্তিতে এই বিশাল বিশ্বলোক দাড়িয়ে আছে ও চলছে, তা এই গ্রন্থ সুস্পষ্ট ও যথাযথভাবে বলে দিয়েছে। এই বিশ্বলোকে মানুষের স্থান ও মর্যাদা যথাযথভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে এই গ্রন্থ এবং বলে দিয়েছে, ইহাই উহার স্বভাবসিদ্ধ ও জন্মগত মর্যাদা। ইহাতে এক বিন্দু পরিবর্তন সূচিত করার সাধ্য মানুষের নেই। এই নির্দিষ্ট মর্যাদা ও স্থানকে সম্মুখে রেখে মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের নির্ভুল পথ ও পন্থা কি হতে পারে - যা প্রকৃত ব্যাপার ও মহাসত্যের সহিত পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল, আর ভুল পথ কোনটি - যা প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সাংঘর্ষিক, তা এই গ্রন্থ স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়। নির্ভুল পথ ও পন্থার নির্ভুল হওয়া এবং ভুল পথ ও পন্থার ভুল হবার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করার জন্য এই গ্রন্থ যমীন ও আসমানের এক একটি জিনিস, বিশ্ব - ব্যবস্থার এক একটি কোণ, মানুষের অভ্যন্তর ও তার সত্তার অস্তিত্ব এবং মানুষের নিজের ইতিহাস হতে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করে। সেই সংগে উহা এ কথাও বলে যে, মানুষ কোন কোন কারণে ও কি কিভাবে ভুল পথে চলতে শুরু করে আর নির্ভুল, সঠিক ও যথাযথ পথ - যা চিরকালই এরূপ রয়েছে ও থাকবে তা মানুষ কিভাবে জানতে পারে এবং কালের প্রত্যেক অধ্যায়ে সমস্ত সময়ই তাকে সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়ে আসছে। এই গ্রন্থ মানুষের জন্য নির্ভুল পথ ও পন্থা কেবল প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হয় না, সেই পথে চলার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্রও উপস্থাপিত করে। তাতে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, তাজকিয়ায়ে নফ্স, ইবাদ, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, সুবিচার ও আইন-মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক বিভাগ সম্পর্কে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা ও মূলনীতি বর্ণনা করে। উপরন্ত উহা সুবিস্তৃতভাবে এই কথাও বলে যে, এই নির্ভুল পথ অনুসরন করার ও ভুল পথ ও পন্থাসমূহে চলা এবং অনুসরণ করার কি ফল ও পরিণতি এই দুনিয়ায় দেখা দিবে মানুষের চলমান জীবনে, আর কি পরিণতি অনিবার্য ভাবে দেখা দিবে দুনিয়ার এবং জীবনের বর্তমান ব্যবস্থা খতম হয়ে যাবার পর পরবর্তী জগত ও জীবনে। এই জগত ও জীবনের খতম হয়ে যাবার এবং দ্বিতীয় একটি জগত ও জীবনের নূতন করে গড়ে উঠার বিস্তারিত অবস্থা বিশ্লেষণ করে। এই পরিবর্তনের সমস্ত স্তর ও পর্যায় এক একটা করে তুলে ধরে এবং পরবর্তী জগত ও জীবনের পূর্ণাংগ চিত্র লোকদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, সেখানে মানুষ দ্বিতীয় জীবনটা কিভাবে লাভ করবে, কিভাবে তার এই বৈষয়িক জীবনের সমস্ত কাজ কর্মের হিসাব নিকাশ লওয়া হবে, তাকে কোন্ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, কি সব বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কিরূপ অনস্বীকার্য অবস্থার মধ্যে তার সমস্ত আমলনামাটি তার সম্মুখে রেখে দেয়া ও হাতে তুলে দেয়া হবে, উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য কি রকমের বলিষ্ঠ সাক্ষ্য - সাবুদ পেশ করা হবে। শাস্তি ও শুভ ফল প্রাপ্ত লোকেরা কেন তা পাবে, শুভ প্রতিফল প্রাপ্ত লোকদেরকে কি সব অমূল্য নিয়ামত দেয়া হবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেরা কি কি রূপে নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

www.pathagar.com

এই বিরাট বিশাল বিষয়ে এই গ্রন্থে যে সব কথা বলা হয়েছে, তা আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে কয়েকটি ধারণার কথা প্রথমে রেখে অনুরূপ ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত বের করার নিয়মে-পেশ করা হয় নাই। বরং তাহা পেশ করা হয়েছে এই হিসাবে যে, ইহার প্রস্থাকার স্বয়ং প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও সম্যকভাবে অবহিত। তাঁর দৃষ্টি আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত, তিনি সব কিছুই দেখছেন, কোন বিন্দুও তাঁর অগোচরে নেই। সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য তাঁর নিকট উদ্‌ঘাটিত, সমুদ্ভাসিত। সমগ্র বিশ্বলোক তাঁর সম্মুখে একখানি উন্মুক্ত পুস্তক বা কিতাবের মত। মানবজাতির সূচনা হতে তার সমাপ্তি পর্যন্তই শুধু নহে, সমাপ্তির পর তার দ্বিতীয় জীবনটাও তিনি সমানভাবে ও একই নযরে দেখতে পাচ্ছেন। নিতান্ত ধারণা অনুমানের ভিত্তিতেই নহে, বরং প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শন করেন। যেসব মহাসত্যকে তিনি নিজের জানার ভিত্তিতে পেশ করেন উহার কোন একটিও আজ পর্যন্ত একবিন্দু মিথ্যা বা অসত্য প্রমাণ করা কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই। বিশ্বলোক ও মানবতা সম্পর্কে তাঁর দেয়া ধারনা (Conception), সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু (Phenomenon) এবং ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব কয়টি বিভাগে নূতন চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তি হতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত সর্বশেষ প্রশ্নাবলীর সুস্পষ্ট জবাব এই গ্রন্থে রয়েছে। সে সবের মধ্যে এমন যুক্তিসিদ্ধ (Logical) সম্পর্ক ও সুসংবদ্ধতা রয়েছে যে, উহার উপর ভিত্তি করে একটা পূর্ণাঙ্গ সুসংবদ্ধ ব্যাপক-সর্বাত্মক চিন্তা-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে এই গ্রন্থ মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছে, তা অতীব যুক্তিসংগত ও বিবেক সম্মতই শুধু নহে- বরং নির্ভুল ও পবিত্রতম। ১৪শত বৎসর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ও কোণে অগণিত মানুষ কার্যত উহা কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলেছে। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেও উহাই সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন হল, এরূপ মর্যাদা ও বিরাটত্বের অধিকারী মানব রচিত কোন গ্রন্থ দুনিয়ায় আছে কি? বা কোন দিন ছিল কি? যাকে এ গ্রন্থের মোকাবিলায় পেশ করা যেতে পারে?

চার ঃ এই গ্রন্থখানি এক দিনে বা এক সময়ে সম্পূর্ণ রূপে লিখে দুনিয়ার সামনে এক সংগে পেশ করা হয় নাই। বরং কয়েকটি প্রাথমিক পর্যায়ের হেদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শন স্বরূপ আয়াত নাযিল করার পর একটি সংস্কার মূলক চেষ্টা, প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের সূচনা করে দেয়া হয়েছিল। উহার পর প্রায় তেইশটি বৎসর চেষ্টা প্রচেষ্টা ও আন্দোলন যেসব স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল, উহার অবস্থা ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ও অনুপাতে উহার বিভিন্ন অংশসমূহ এই প্রচেষ্টা এবং আন্দোলনের 'নেতা ব্যক্তির' মুখে কখনো দীর্ঘ ভাষণ এবং কখনও সংক্ষিপ্ত বাক্য ও ভাষণ আকারে এই কুরআন নাযিল হচ্ছিল। উত্তরকালে এই আন্দোলনের সম্পূর্ণতা লাভের পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হওয়া অংশসমূহ একখানি পূর্ণাংগ গ্রন্থরূপে দুনিয়ার সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। ইহারই নামকরণ করা হয়েছে 'কুরআন'। সংস্কার মূলক আন্দোলনের 'নেতা ব্যক্তি'র বর্ণনা হল, এই ভাষণ ও বাক্যসমূহ তার স্বকপোলকল্পিত নহে। ইহার

www.pathagar.com

সম্পূর্ণটাই মহান আল্লাহ্তায়ার নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। কেহ যদি এই গ্রন্থকে তার নিজের রচিত বলে দাবী করতে চাহে, তা হলে তার কর্তব্য সারা দুনিয়ার সমগ্র ইতিহাস থেকে ইহার কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা। একজন লোক বৎসরের পর বৎপর ধরে এক মহা পরাক্রান্ত সমাজ-বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজে দিয়েছে, এই আন্দোলন কালে কখনও উপদেশদানকারী রূপে, কখনও নৈতিকতার শিক্ষকরূপে, কখনও একটি নির্যাতিত জনসমষ্টির প্রধান নেতা হিসাবে, কখনও একটি রাষ্ট্রের প্রশাসক ও পরিচালক হিসাবে, কখনও যুদ্ধে নিয়োজিত ও সংগ্রামরত একটি সৈন্য বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হিসাবে, কখনও বিজয়ীরূপে, কখনও একজন আইন রচয়িতা আইনদাতা রূপে - এক কথায় বিভিন্ন অবস্থায় ও সময়ে বিভিন্ন মর্যাদায় দাড়িয়ে যে বিভিন্ন বক্তৃতা ভাষণ দিয়েছেন, নানা কথা বলেছেন, তা একত্র সংগৃহিত হয়ে একখানি পূর্নাঙ্গ সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দেয়ার এবং তাতে পারস্পরিক কোন বিরোধ বৈষম্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি হওয়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও চিন্ত-শৃংখলার ধারা কার্যকর হয়ে থাকতে দেখা সম্ভব হয়েছে, সারা বিশ্বের মানব বা গ্রন্থ প্রণয়ন-ইতিহাসে ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত আছে কি? এই লোক প্রথম দিনই তার বিপ্লবী আন্দোলনের যে ভিত্তি পেশ করেছেন, সর্বশেষ দিন পর্যন্ত সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি আকীদাহ-বিশ্বাস ও কর্মের এমন একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থা বানিয়ে সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছেন, যার প্রত্যেকটি অংশ উহার অপরাপর অংশের সহিত পুরোমাত্রায় সামঞ্জস্য ও সংগতি সম্পন্ন। এই ভাষণ-সমষ্টি পাঠ করে কোন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিই এ কথা তীব্রভাবে অনুভব না করে পারে না যে, আন্দোলনের সূচনাকালেই উহার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত অবস্থার সমগ্র চিত্রটি আন্দোলনের নেতার সম্মুখে সম্পূর্নরূপে সমুদ্ভাসিত ছিল। মাঝখানের কোন এক পর্যায়ে তাঁর মনে কোন এক সময় এমন কোন চিন্তার উদ্রেক হয়েছে, যা পূর্বে তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত ছিল না; কিংবা পরে তাঁকে উহার পরিবর্তন করতে হয়েছে এমন একটি ব্যাপারও পরিলক্ষিত হয়না। এরূপ মর্যাদার কোন লোক আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে থাকলে এবং এরূপ বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভার পরিপূর্নতা দেখাতে সক্ষম হয়ে থাকলে তাঁকে তো লোকদের সম্মুখে পেশ করে দেয়া কর্তব্য। এরূপ ব্যক্তির পরিচয় অজ্ঞাত থাকার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু না, আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ভূ-পৃষ্ঠের উপর কখনই সংঘটিত হয়নি।

পাঁচ ঃ যে নেতা ব্যক্তির মুখে এ ভাষণ ও বাক্যসমূহ উচ্চারিত হয়েছিল, তিনি সহসাই কোন এক নিভৃত গোপণ গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করে কেবলমাত্র উহা লোকদেরকে শুনাবার জন্যই জনসমাজে আসতেন এবং তা শুনাইবা মাত্রই আবার লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যেতেন, এমন ব্যাপারও তো হয়নি। তিনি এ আন্দোলন শুরু করার পূর্বেও জনসমাজের মধ্যেই জীবন যাপন করেছিলেন। উহার পরও তিনি জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণই সমাজের একজন লোক হিসাবেই দিনাতিপাত করেছেন। তার কথাবার্তা ও বক্তৃতা - ভাষণের ভাষা ও বর্ণনা ভংগীর সহিত সমাজের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরিচতি ছিল। হাদীস গ্রন্থ সমূহে তার একটা বিরাট অংশ

www.pathagar.com

এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে। উত্তরকালের আরবী ভাষাবিদগণ তা পড়ে সহজেই বুঝতে ও দেখতে পারেন যে, সেই নেতা-ব্যক্তির নিজের কথার ধরণ, ভাষা ও বাক্য গঠন কি রকমের ছিল। তাঁর সম ভাষাভাষী লোকেরা তখনও অনুভব করতেন এবং বর্তমান কালের আরবী ভাষাবিদ লোকেরাও অনুভব করতে পারেন যে, এই গ্রন্থের ভাষা ও ষ্টাইল, সেই নেতা-ব্যক্তির নিজের ভাষা ও ষ্টাইল থেকে সম্পূর্ন ভিন্নতর। এমনকি তাঁর নিজের বক্তৃতা ভাষণের মাঝখানে এই গ্রন্থের কোন অংশ শামিল হয়ে গেলে সেখানেও উভয়ের ভাষা ও ষ্টাইলের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে পড়ে এবং তা দেখলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। এই প্রেক্ষিত প্রশ্ন জাগে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে বৎসরের পর বৎসর ধরে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ষ্টাইল ও ভাষায় কথা বলার অভ্যাস রক্ষা করে চলা এবং এই দুইটি জিনিস-ই যে একই ব্যক্তির নিজস্ব এমন কোন তত্ত্ব কখনই আবিষ্কৃত না হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে? দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি-ই কি তা করতে পেরেছে আজ পর্যন্ত? সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে কাহারও পক্ষে এই কৃত্রিমতার অভিনয় করা সম্ভব এবং তাতে সাফল্য লাভ হতে পারলেও ক্রমাগত ২৩টি বৎসর ধরে এইরূপ করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। একই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে আসা ওহী পাঠ করে শুনালে তার ভাষা ষ্টাইল হবে এক রকম, আর নিজের কথা বা ভাষণ পেশ করার সময় তার ভাষা ও ষ্টাইল হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরূপ নীতি চালিয় যাওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর হতে পারে না।

ছয় ঃ সেই নেতা এই দাওয়াত ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করতে গিয়ে বিভিন্নরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কখনও ক্রমাগত কয়েক বৎসর কাল পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বদেশবাসী ও স্বগোত্রীয় লোকদের হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রুপ-অপমান, অত্যাচার-নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে ছিলেন। অনেক সময় তাঁর সংগী সাথীদের উপর এতদূর কঠোরতা ও নির্মমতা করা হয়েছে যে, অরা দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কখনও শত্রুরা তাঁকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছে, কখনও তাঁকে নিজেকেই স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে। কখনও তাঁকে অতিশয় দারিদ্র্যে ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়েছে। কখনও তাঁকে ক্রমাগত ভাবে লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকতে হয়েছে। আর তাতে জয় বা পরাজয় উভয়ই সংঘটিত হয়েছে। কখনও তিনি শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। কখনও তাঁর প্রাণের শত্রুরাও তাঁর সম্মুখে মাথা নত করেছেন। কখনও তিনি এমন শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করেছেন, যা খুব কম লোক-ই লাভ করে থাকে। বৎসরের পর বৎসর ধরে এই সমস্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মন মানসিকতার অবস্থা এক ও অভিন্ন রূপ থাকা কখন-ই সম্ভবপর হয় না। এই নেতা এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে যখন-ই কথা বলেছেন, তাতে সেই হৃদয়াবেগই প্রতিফলন হতে দেখা যায় যা এরূপ অবস্থায় লোকদের মনে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে আসা ওহীরূপে যেসব কথা (আয়াত) এই সব বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর মুখে শুনা গিয়েছে, তাতে মানবীয় হৃদয়াবেগের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। কোন একটি স্থানেও অংশুলি রেখে এরূপ

www.pathagar.com

বলা যে, এখানে মানবীয় হৃদয়াবেগের প্রতিফলন ঘটেছে- কোন অতি বড় সমালোচকের পক্ষেও তা সম্ভবপর নহে।

সাত ঃ এই গ্রন্থে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে তা সেকালের আরব, রোমান, গ্রীক ও পারসিকরা তো দূরের কথা, এই বিংশ শতকের বড় বড় জ্ঞানী বিজ্ঞানী মনীষীদের মধ্য থেকেও কারও নিকট পাওয়া যায় না। বর্তমান কালেও দর্শন-বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার অধ্যয়নে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করার পর-ই জ্ঞানের সেই শাখার চূড়ান্ত বিষয় ও সমস্যাদি কি তা জানা একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। পরে সে যখন কুরআন মজীদ সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করে, তখন এই গ্রন্থে যে, সেই সব বিষয় ও সমস্যাদির একটা স্পষ্ট জবাব রয়েছে তা সে স্পষ্টরূপে দেখতে পায়। এই ব্যাপারটি কেবল বিশেষ কোন একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বলোক ও মানব সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরব মরুভূমির একজন উম্মী (নিরক্ষর) ব্যক্তি (নিজ থেকেই) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় এত ব্যাপক জ্ঞান ও অবিজ্ঞতা লাভ করলেন এবং প্রত্যেকটি মৌলিক বিষয়ে তিনি চিন্তা-গবেষনা করে একটা সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত জবাব রচনা করে দিয়েছেন -এমন কথা কল্পনা করা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

বস্তুত কুরআন মজীদ আল্লাহর এক অতি বড় মু'জিযা। কুরআন একটা অতি বড় মু'জিযা হবার আরও অনেক দিক ও কথা রয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা মু'জিযার দিকগুলি যদি কেহ চিন্তা-বিবেচনা করে তা হলে সে স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, কুরআনের মু'জিযা হবার ব্যাপারটি কুরআন নাযিল হবার সময় যতটা স্পষ্ট ছিল, তার তুলনায় বর্তমান সময়ে তা আরো অনেক গুণ বেশি ও ব্যাপক মাত্রায় স্পষ্ট। আর তা শুধু এ পর্যন্তই শেষ নহে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই বিষয়টি আরও অধিকতর স্পষ্ট হতে থাকবে। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

৬) "আমাদের স্পষ্ট অকাট্য আয়াত সমূহ যখন এই লোকদেরকে শুনানো হয় এবং প্রকৃত মহাসত্য তাদের সম্মুখে যখন উদঘাটিত হয়ে পড়ে, তখন এই কাফের লোকেরা এই সম্পর্কে বলে যে, ইহা তো সুস্পষ্ট 'যাদু'। তারা কি বলতে চাহে যে, রাছুল ইহা নিজেই রচনা করে নিয়েছেন? তাদেরকে বল, আমি যদি উহা নিজেই রচনা করে থাকি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যেসব কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে বেড়াচ্ছ, আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষ্যদানের জন্য তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।" (সূরা আহকাফ আয়াত ৭-৮)। তফসীর ঃ-

উপরোক্ত আয়াত সমূহের তাৎপর্য এই যে, মক্কার কাফেরদের উপস্থিতিতে যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করা হত, তখন তারা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারত যে, ইহা মানুষের তৈরী করা বা রচনার তুলানায় বহুগুন উন্নত ও উচ্চতর মানের কালাম। কোন কবি, কোন বড় বক্তা বা বাগ্মী কিংবা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের রচনা বা কথাও কুরআনের মত উন্নত মানের ভাষা, কথা এবং উহার আবেগপূর্ণ আহ্বান-আমন্ত্রণ,

www.pathagar.com

উচ্চমানের বিষয়বস্তু ও মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধকারী বর্ণনা ভংগীর সহিত তুলনীয় হতে পারে না। এ দুইটির মধ্যে কোন দূরতম সামঞ্জস্যও নেই। বড় কথা এই যে, স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) এর নিজের কথা ও ভাষণও সেই মান ও মর্যাদার ছিল না, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ন আল্লাহর কালামের রয়েছে। যারা তাঁকে বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে, তারা ভাল করেই জানতো যে, তাঁর নিজের ভাষা ও কুরআনের ভাষায় আসমান-যমীনের পার্থক্য। যে ব্যক্তি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে দিন রাত তাদের মধ্যে অবস্থান ও বসবাস করে আসছেন, তিনি সহসা কোন এক সময় বসে এমন এক ধরনের কালাম রচনা করেন যার ভাষার সহিত তার নিজের ভাষারই আদৌ কোন মিল/সাযুজ্য বা সামঞ্জস্য নেই। এই কালাম তার নিজের রচিত, এমন কথা সেখানকার লোকদের পক্ষে এ কারণেই বিশ্বাস করা সম্ভবপর ছিল না। বরং এ ব্যাপারটিই তাদের সম্মুখে প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত করে দিয়েছে। কিন্তু তারা নিজেরাই যেহেতু কুফর ও অবিশ্বাস-আমান্যতার উপর অবিচল হয়ে থাকবার সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল, এ কারণে এই সুস্পষ্ট ও অকাট্য নিদর্শন নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করেও এ কালামকে সোজাসুজি আল্লাহর পাঠানো ওহীর কালাম বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হল না। উহার পরিবর্তে তারা বরং বলতে শুরু করল যে, ইহা 'যাদু', যাদুর কীর্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। এই লোকেরা কি এতই নির্লজ্জ যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছেন বলে ইহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলার দুঃসাহস করতেছে? অথচ উহারা খুব ভালভাবেই জানে যে, ইহা তাঁর নিজের রচিত কালাম নহে। তা হতেও পারে না। তারা যে ইহাকে যাদু বলতেছে, এ কথাটিতে এই স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে যে, ইহা মূলতই এক অসাধারণ কালাম। কোন মানুষ কর্তৃক উহার রচিত হওয়া স্বয়ং তাদের মতেই অসম্ভব ব্যাপার। (অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছাঃ) যে কোরআন পেশ করতেছেন তা এতই অসাধারণ যে, একমাত্র যাদু ছাড়া ইহা তৈরী করা সম্ভব নয়।)

এই লোকদের অভিযোগ নিছক ভিত্তিহীন এবং পুরোপুরিভাবে হঠকারিতামূলক হবার ব্যাপারটি সর্বোতভাবে সুস্পষ্ট। এ কারণে এ অভিযোগের প্রতিবাদ করার জন্য যুক্তি প্রমান উপস্থাপনের কোন প্রয়োজনই বোধ করা হয়নি। আর এ জন্যই শুধ এতটুকু বলেই ক্ষান্ত দ্বারা করা হয়েছে যে, আমি যদি বাস্তবিকই একটি কালাম নিজেই রচনা করে উহাকে আল্লাহর কালাম বলে চালাতে চেষ্টা করার মত বিরাট অপরাধ করে থাকি- যেমন তোমরা বলে থাক, তা হলে আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমরা তো এগিয়ে আসবে না, তোমরা তা পারবেও না। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে, আর তোমরা মিথ্যা অভিযোগ তুলে উহাকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তা হলে আল্লাহই তোমাদের সহিত বোঝাপড়া করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র গোপন নহে। আর কোন্‌টা সত্য, কোনটা মিথ্যা, উহার ফায়সালা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সমগ্র দুনিয়া মিলিত হয়ে কাহাকেও যদি মিথ্যুক বলে এবং আল্লাহ-তা'য়ালা যদি তাকে সত্যবাদী বলেই জানেন, তাহলে সর্বশেষ ফায়সালা তো তার পক্ষেই হবে। পক্ষান্তরে সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়েও যদি কাকেও সত্যবাদী বলে, কিন্তু

www.pathagar.com

আল্লাহ তাকে জানেন মিথ্যাবাদী বলে, তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদী বলেই প্রতিপন্ন হবে। কাজেই উল্টা-পাল্টা ও আজেবাজে কথা বলার পরিবর্তে নিজেরদের পরিণাম সম্পর্কেই তোমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ।

এখানে বাক্যটি একসংগে দুইটি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি এই যে, বস্তুতই আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাশীলতার কারণেই সেই লোকেরাও দুনিয়ায় বেঁচে আছে ও থাকছে, যারা আল্লাহর নিজের কালামকেও 'মনগড়াভাবে রচিত' বলতে কোন দ্বিধা বা ভয় করছে না। নতুবা বিশ্বলোকের মালিক যদি কোন নির্মম-নির্দয় আল্লাহ হতেন, তা হলে তিনি এমন দুঃসাহসকারীদেরকে নিশ্চয়ই একবার শ্বাস লওয়ার পর দ্বিতীয় বার শ্বাস গ্রহনের সুযোগ দিতেন না। ইহার আর একটি তাৎপর্য হলঃ 'হে যালেম লোকেরা, এখনও এই হঠকারিতা পরিহার কর, ইহা থেকে বিরত থাক। যদি তা হয়, তাহলে আল্লাহর রহমতের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে এবং এই পর্যন্ত যা কিছু অপরাধ তোমরা করেছ তা মাফ হয়ে যেতে পারে।' (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন-সংক্ষেপিত)।

৭) **"আর যালেমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন আলোচনা করে যে, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।' তাহলে কি তোমরা দেখে শুনে 'যাদুর' ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে?"** (সূরা আম্বিয়া আয়াত-৩)। তফসীর ঃ-

মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদার মাতবররা যারা নবী করীম (ছাঃ) এর দাওয়াতী আন্দোলনের মুকাবিলা করার উপায় নির্ধারণের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিল, তখন তারা পরস্পর গোপনে আলোচনা করত। তারা বলতঃ এই ব্যক্তি আর যাই হউক, নবী তো হতে পারে না। কারণ সে তো আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মতই পানাহার করে, বাজারে চলাফেরা করে, তারও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন রয়েছে। তাহলে এমন কি অভিনব ব্যাপার রয়েছে, যার দরুন সে আমাদের চাইতে বিশিষ্ট হতে পারে? আল্লাহর সহিত আমাদের অপেক্ষা তার সাথে এক অসাধারণ সম্পর্ক আছে বলে মনে করে নেয়ার কি কারণ রয়েছে? অবশ্য এই কথা ঠিক যে, এই লোকটির কথাবার্তায় ও তার ব্যক্তিত্বে এক প্রকারের 'যাদু' রয়েছে ঃ যে লোকই তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে এবং তার সংস্পর্শে যায়, সে-ই তার জন্য আত্মহারা হয়ে পড়ে। কাজেই নিজেদের কল্যাণ চাইলে না তার কথা শুনবে, না তার সহিত মেলামেশা করবে। কেননা তার কথা শুনা, তার নিকট যাওয়া-আসা করা জেনে শুনেন 'যাদুর' ফাঁদে জড়িত হবারই শামিল। যে কারণে তারা নবী করীম (ছাঃ) কে যাদুকর বলে অভিযোগ করত, তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাচীনতম জীবন-চরিত লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫২ হিঃ) উল্লেখ করেছেন যার কতিপয় বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল। তিনি লিখেছেন ঃ

(ক) একবার ওতবা ইবনে রবীয়া (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর ও কলিজা ভক্ষক হিন্দার পিতা) কুরাইশ সরদারদেরকে বললঃ আপনারা পছন্দ করলে "আমি মুহাম্মদের সহিত সাক্ষাত করে তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করি। ইহা হয়ত হামযা (রা) -এর ইসলাম কবুল করার পরের ঘটনা -যখন সাহাবীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখে কুরাইশ প্রধানরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল ও যারপর নাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সরদাররা বললঃ

www.pathagar.com

'হে অলীদের পিতা! তোমার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত। তুমি গিয়ে অবশ্যই তার সহিত কথা বল।' সেই অনুযায়ী ওতবা নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট গেল এবং বলতে লাগলঃ "ভাইপো, আমাদের সমাজে তোমার যে সম্মান ছিল তা তোমার নিজের জানা আছে। আর বংশের দিক দিয়েও তুমি এক উঁচু শরীফ খান্দানের লোক। কিন্তু তুমি নিজেরই লোকজনের উপর এ কি বিপদ টেনে আনলে? তুমি তো সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করছো। সমস্ত লোককে তুমি নির্বোধ বানাচ্ছ। তাদের দ্বীন ও তাদের মাবুদদের (মূর্তী/দেবদেবীদের) কুৎসা করতেছ। যেসব বাপ-দাদা মরে গিয়েছে, তাদের সকলকে তুমি গুমরাহ ও কাফের বলতেছ। ভাইপো, তুমি যদি এ সব করে দুনিয়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাও, তাহলে এ সব ছাড়, আমাদের নিকট আস, আমরা সকলে মিলে তোমাকে এত এত টাকা দিব যে, তুমি আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ধনী হয়ে যাবে। যদি নেতৃত্ব চাও, তবে তোমাকে আমরা সরদার মেনে নিব। যদি রাজত্ব ও বাদশাহী চাও, তাহলে তোমাকে আমরা বাদশাহ বানাব। আর তোমার যদি কোন রোগ হয়ে থাকে, যার দরুন তুমি বাস্তবিকই কি ঘুমিয়ে, কি জাগ্রত অবস্থায় কিছু দেখতে পাও, তাহলে আমরা ভাল চিকিৎসকের দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাবো। সে এ সব কথা বলতেছিল, আর নবী করীম (ছাঃ) চুপচাপ শুনতেছিলেন। তার কথা যখন অনেক দূর অগ্রসর হল, তখন তিনি বললেনঃ "হে অলীদের পিতা! আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সবই বলেছেন, না আরো কিছু বলবার আছে?" সে বলল ঃ 'না, আমার যা কিছ বক্তব্য ছিল, তা সবই বলা হয়েছে।' তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'এখন আমার কথা শুনুন।' এই বলে তিনি পড়তে লাগলেন ঃ "এই লোকেরা যদি বিমুখ হয়, তাহলে এদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদের মত আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আকস্মিকভাবে এসে পড়বে।"

অতঃপর কিছু সময় ধরে তিনি সূরা 'হা-মিম-সিজদা' পাঠ করতে লাগলেন। আর ওতবা পিছনের দিকে হাত ঠেস দিয়ে সব শুনতে লাগল। (এ সূরার) আটত্রিশতম আয়াত পাঠ করে নবী করীম (ছাঃ) সিজদা করলেন। পরে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে ওতবাকে বললেন ঃ "আবুল অলীদ! আমার যা কিছু বক্তব্য ছিল তা আপনি শুনলেন। আপনি আপনার কর্তব্য ঠিক করুন।"

ওতবা এখান হতে উঠে কুরাইশ সরদারের নিকট চলে গেলে। লোকেরা দূর হতে তাকে আসতে দেখে বলল ঃ "খোদার কসম আবুল অলীদের চেহারা তো বদলে গিয়েছে। সে যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, ইহাতো তা নয়।" তার ফিরে যাবার সংগে সংগে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ "বল, আবুল অলীদ, কি করে আসলে?" সে বলল ঃ "খোদার কসম, আজ আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। ইহা কখনই কবিতা নয়। ইহা যাদুও নয়। গণৎকারীর কোন পরিচয়ও এতে নেই। হে কুরাইশ বংশের লোকেরা আমার কথা মেনে লও। এই ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তার যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন না একদিন ফুলে ফলে সুশোভিত হবেই। আরবরা যদি তার উপর জয়ী হতে পারে, তাহলে নিজেদেরই একজন লোককে খুন করার অপরাধ হতে তোমরা বেচে গেলে। সেই জন্য অন্য লোকেরা দায়ী হবে।

www.pathagar.com

আর সে যদি আরবদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তার রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব হবে। আর তার সম্মানে তোমরাও সম্মানিত হবে।" লোকেরা বলল ঃ 'খোদার কসম, আবুল অলীদ, তার 'যাদু' তোমার উপরও কাজ করেছে।' সে বলল, "ইহা আমার মত, এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।" (ইবনে হেশাম, ১ম খন্ড, ৩১৩-৩১৪ পৃঃ) বায়হাকী এই ঘটনা সম্পর্কে যেসব হাদীসের বর্ণনা একত্রিত করেছেন, তন্মধ্যে একটি বর্ণনায় এই বাড়তি কথা আছে, যে, নবী করীম (ছাঃ) যখন 'হা-মিম-সিজদা' সূরা পাঠ করতে করতে এই আয়াত পর্যন্ত আসলেন, "এই লোকেরা যদি বিমুখ হয়, তাহলে এদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদের মত আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আকস্মিকভাবে এসে পড়বে।"

তখন ওতবা দিশাহারা হয়ে রাসূলের মুখ চেপে ধরল, আর বলল- "খোদার ওয়াস্তে তোমার নিজের লোকদের উপর রহম কর।" এর কারণ বর্ণনা করে বলল, "মুহাম্মদের মুখ থেকে যা বের হয় তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। আমি ভয় পেয়ে গেলাম আযাব না এসে পড়ে।"

(খ) ইবনে ইসহাক অপর যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তা এই ঃ 'আরাশ' গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু উট নিয়ে একদিন মক্কায় আসল। আবু জেহেল তার উটগুলি খরিদ করে নিলো। সে যখন দাম চাইল তখন সে টালবাহানা করতে লাগল। সেই লোকটি নিরুপায় হয়ে একদিন মক্কার হারাম -এ প্রবেশ করে কুরাইশ সরদারদেরকে ধরল এবং জনতার সামনে ফরিয়াদ পেশ করল। অপরদিকে হারাম (কাবা শরীফের) -এর একপাশে নবী করীম (ছাঃ) উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশ সরদাররা বলল ঃ "আমরা কিছু বলতে পারি না। তুমি ঐ কোণায় বসা লোকটির নিকট গিয়ে বল। সে তোমার টাকা আদায় করে দিবে।" সেই ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট গেল। তখন কুরাইশ সরদাররা পরস্পর বলল ঃ "আজ তামাশা দেখা যাবে।" সেই লোকটির নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলল। তিনি তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে সংগে নিয়ে আবু জেহেলে বাড়ীর দিকে চলতে লাগলেন। সরদাররা পিছনে একটি লোক লাগিয়ে দিল যা কিছু ঘটে তা দেখে আসবার জন্য। নবী করীম (ছাঃ) সোজা আবু জেহেলের ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ও দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন। আবু জেহেল জিজ্ঞাসা করল ঃ "কে?" তিনি বললেন ঃ "মুহাম্মদ।" আবু জেহেল দিশাহারা হয়ে ঘরের বাহিরে চলে আসল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন ঃ "এই ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করে দাও।" সে জওয়াবে কোন কথাই বলল না। সোজা ঘরের ভিতরে চলে গেল এবং উটের দাম এনে সেই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিল। কুরাইশদের খবরদাতা এই অবস্থা দেখে হারামের দিকে দৌড়ে গেল এবং সরদারদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলল। সে বলতে লাগল ঃ "খোদার কসম, আজ যেরূপ ঘটনা দেখলাম, এরূপ ঘটনা আর কখনো দেখতে পাইনি। আবু জেহেল ঘরের বাইরে এসে মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পেয়েই ঘাবড়িয়ে গেল। আর মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাকে

www.pathagar.com

সেই ব্যক্তির পাওনা আদায় করে দিতে বলল, তখন মনে হল, আবু জেহেলের দেহে যেন প্রাণ নেই।" (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ২৯-৩০পৃঃ)।

রাছুল্লাহ (ছাঃ) এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও গুনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ছিল এই প্রকৃতির এবং আল্লাহর কালামের ফলও ছিল এই ধরনের। আর এই জিনিসকেই তারা 'যাদুক্রিয়া' বলে মনে করত এবং অজ্ঞ লোকদেরকে এই বলে ভয় দেখাতো ঃ "এই ব্যক্তির নিকটে যেও না। গেলে যাদুর প্রভাবে পড়বে।" (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

৮) **(কোরআন সম্পর্কে) তারা বলে ঃ "বরং ইহা তো আজেবাজে স্বপ্ন; (অলিক কল্পনা) বরং ইহা তার মনগড়া (রচনা) বরং এ ব্যক্তি তো কবি" (সূরা আম্বিরা, আয়াত-৫)।**

উপরোক্ত (আয়াতের) পটভূমি এই যে, আরবদের উপর যখন নবী করীম (ছাঃ) এর ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল, তখন মক্কার সরদারগণ পরস্পর পরামর্শ করে সাব্যস্ত করল যে, রাছূল (ছাঃ) এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করতে হবে। আর মক্কায় যে লোকই আসবে, তাকেই রাছূল (ছাঃ) সম্পর্কে এতদূর বীতশ্রদ্ধ ও ভুল ধারণা সম্পন্ন করে তুলতে হবে যে, তার কথা যেন কেহই শুনতে প্রস্তুত না হয়। এই অভিযান যদিও বারো মাস নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলতো, তবুও হজ্জের সময় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বহুলোককে ছড়িয়ে দেয়া হত। তারা বহিরাগত সমস্ত লোকের তাবুতে তাবুতে গিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দিত। তারা বলত ঃ এ শহরে এমন এক ব্যক্তি আছে যার নিকট হতে তোমরা অবশ্যই দূরে থাকবে। এ সময় তারা নানাবিধ কথা বলত। কখনো বলত, 'এ লোকটি যাদুকর'। কখনো বলতঃ 'এ লোকটি নিজের মনগড়া কথা খোদার কালাম বলে চালিয়ে দেয়।' কখনো বলত ঃ 'সে যা বলে, তাতো পাগলের প্রলাপ, আজেবাজে কথার এক বোঝা'। কখনো বলতঃ সে একজন কবি এবং তার কথা কবির কাব্য, মিল দিয়ে বলা কথা। আর বলে কিনা ইহাই খোদার কালাম।' মোট কথা, লোকদেরকে তার সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু ইহাতে একবিন্দুও সত্যতা ছিল না, তাই এক এক সময়ে এক এক ধরনের কথা বলা হত। নিশ্চিতভাবে একটি কথা কখনও বলা হত না। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারনার ফলটা কি হয়েছিল? ফল এ হল যে, তারা নিজেরাই নবী করীম (ছাঃ) এর নাম দেশের দূর দূর অঞ্চলের লোকদের নিকট পৌছে দিল। খোদ মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রচারের ফলেও নবী করীম (ছাঃ) এর কথা যত না প্রচারিত হত, কুরাইশদের এ মিথ্যা প্রচারনার ফলে তার চাইতে শতগুণ বেশী প্রচারিত হল অতি অল্পদিনের মধ্যেই। দূরাঞ্চলের প্রত্যেকের মনেই একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছিল ঃ 'লোকটি কে, যার বিরুদ্ধে এ প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে ?' অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করল ঃ "এ লোকটির কথা শুনে দেখা দরকার। আমরা তো আর ছেলে-শিশু নই যে, কেহ আমাদেরকে এমনিতেই ভুলিয়ে ফেলবে।"

www.pathagar.com

তোফায়েল ইবনে আমর দাওসীর ঘটনা এই পর্যায়েরই এক ঘটনা। ইবনে ইসহাক খুব বিস্তারিতভাবে এই কাহিনী বর্ননা করেছেন। তোফায়েল বলেন ঃ "আমি দাওস বংশের একজন কবি ছিলাম। কোন কাজে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছতেই কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ধরে। আর নবী করীম (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে নানা কথা আমার কানে ভরে দিতে লাগল। আমি সেই শুনে তাঁর প্রতি খুবই বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে পড়লাম। আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে, যে রকমেই হউক, আমি এই ব্যক্তি থেকে দূরে থাকব। দ্বিতীয় দিনে আমি 'হারাম' -এর নিকট হাযির হলাম। এই সময় নবী করীম (ছাঃ) কা'বার নিকটে নামায পড়তে ছিলেন। আমি কয়েকটি কথা (কোরআনের আয়াত) শুনেই বুঝতে পারলাম যে, ইহা খুবই উচু মানের কালাম। আমি চিন্তা করলাম, আমি নিজেই একজন কবি ও যুবক মানুষ। জ্ঞান-বুদ্ধিতে কারো অপেক্ষা পিছনে নই। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, বুঝব না এমন ছেলে-শিশুও নই। এই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করে তাঁর কথা শুনলে এমন কি ক্ষতি হবে? পরে নবী করীম (ছাঃ) যখন নামায শেষ করে চলে যেতে লাগলেন, তখন আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম এবং তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম ঃ আপনার বিরুদ্ধে আপনার লোকেরা আমার নিকট অনেক কিছু অপপ্রচার করছে। আমি তা শুনে আপনার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন হয়ে পড়েছি। আমি আপনার কথা না শুনবারই সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু এই মাত্র আপনার মুখ হতে যে কয়টি কথা শুনতে পেলাম, তাতো আমার খুব ভালো লাগল। আপনার বক্তব্য আমাকে বিস্তারিত বলুন। নবী করীম (ছাঃ) তখন আমাকে কুরআনের একটি অংশ পাঠ করে শুনালেন। আমি তো শুনে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে, আমি তখনই ঈমান আনলাম। আর বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার পিতা ও স্ত্রীকেও মুসলমান করলাম। অতঃপর আপন গোত্রের লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করতে থাকলাম। এইভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে আমার গোত্রের সত্তর আশীজন লোক মুসলমান হলেন।" (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

৯) **"অথবা তারা কি স্বীয় রাছুলকে চিনতে পারে নাই যে, তারা তাঁকে অগ্রাহ্য করছে? অথবা তারা কি বলে যে, সে জ্বিন গ্রস্থ? বরং সে তাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ" (সূরা মু'মেনূন-আয়াত ৬৯-৭০)**। তফসীর ঃ-

(কোরআনকে) তাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যতার কারন কি এই যে, এই লোকটি যিনি কুরআন শুনাচ্ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন? তারা (কি) তাঁকে কখনই দেখে নাই, (বা) তাঁর কথা আদৌ জানেনা, সহসাই কি এই ব্যক্তি তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর বলছেন যে, আমাকে তোমরা মানো? (তাঁর সম্পর্কে) এই কথা যে মোটেই সত্য নয় তা সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি এই দাওয়াত পেশ করছেন, তিনি তাদেরই

www.pathagar.com

বংশ-গোত্রের মধ্যেরই একজন। তাঁর বংশের শরাফত (পরিবত্রতা) কোন গোপন জিনিস নয় তাদের নিকট। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও অজানা নয়। বাল্যকাল থেকে যৌবনকাল এবং যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যের সীমা পর্যন্ত তিনি পৌছে ছিলেন তাদের চোখের সম্মুখেই। তাঁর সততা-সত্যবাদিতা, ন্যায়বাদিতা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর নিষ্কলংক পবিত্র জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে ইহারা খুব ভালোভাবেই জানে। তারা নিজেরাই এই লোককে 'আল-আমীন', 'আমানতদার' ও বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করত। তাঁর বিশ্বস্ততার উপর তাঁর বংশের সকলেই পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করত। তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমনও মানত যে, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁর সমগ্র যৌবনকালই পবিত্রতা ও নিষ্কলংকতা সহকারে অতিবাহিত হয়েছে। সকলেই জানে, তিনি অত্যন্ত ভদ্র, শরীফ, অতিশয় নেক ও পুন্যাত্মা ব্যক্তি। ধৈর্য সম্পন্ন সত্যপন্থী, শান্তিপ্রিয়, ঝগড়-ঝামেলা হতে বিচ্ছিন্ন, কাজে-কর্মে খাটী ও কড়া, কথা ও প্রতিশ্রুতিতে পাকা-পোখত, অনড়, তিনি না নিজে যুলুম করেন, না যালেমদের তিনি সমর্থন ও সাহায্য করেন, কোন হকদারের হক পূরন করায় তিনি কখনই অন্যথা করেন নাই। প্রত্যেক বিগদপ্রস্থ অসহায় ও অভাবগ্রস্থের জন্য তাঁর দুয়ার একজন দয়াবান, সহানুভুতিসম্পন্ন ও কল্যাণকামী ব্যক্তির দুয়ারের মতই সদা-উন্মুক্ত। তারা কখনও এমন কোন কথা শুনতে পায়নি যা থেকে তিনি বড় কোন দাবী পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। আর যে দিন তিনি এই দাবী (তৌহিদ) নবুয়ত পেশ করলেন, সেইদিন থেকে তিনি আজ পর্যন্ত একই কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি কোন ডিগবাজী খাননি। তাঁর দাবীতে ও দাওয়াতে কোনরূপে রদ বদল বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। তাঁর এই দাবীর কোন ক্রমবিবর্তন নেই। কেহ বলতে পারে না যে, তিনি খুব ধীরে ধীরে কদম মযবুত করে করে তাঁর দাবীর পটভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি অন্যদের যা বলেছেন, তা তিনি প্রথমে নিজেই করে দেখিয়েছেন। তাঁর কথা ও কাজের মাঝে কোন গরমিল নেই-বিরোধ পার্থক্য নেই। তাঁর নিকট হাতীর দাঁত নেই, যা দেখাবার জন্য হয় এক রকম, আর চিবাবার জন্য হয় অন্য রকম। তাঁর দেয়া ও নেয়ার মাপ এক ও অভিন্ন। তাঁর গোটা জীবনই এই সব কথার বাস্তব প্রমান। এরূপ জানা শোনা ও দেখা বুঝা, পরীক্ষা করা ব্যক্তি সম্পর্কে কেহই বলতে পারে না যে, "লোকটি বড় ধূর্ত, ফু' দিয়ে দিয়ে দুধ পান করে। চিত্তাকর্ষক সব কথাবার্তা বলে নিজের খাটীত্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে বুঝতে পারা যায় যে, লোকটি চোখে ধুলা দিচ্ছিল। ইনি আসলে কি রকমের লোক, তা আগে ভাগে কেমন করে বুঝতে পারা যাবে? উপরের চাকচিক্যের তথ্য থেকে কি জিনিস বের করা হয় তা ভাবনার বিষয়। এই কারণে তাঁকে মেনে নিতে মন সায় দেয় না।" হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) সম্পর্কে এই উক্তি করার এক বিন্দু অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

"(তাছাড়া) তাদের এই অমান্যতা ও অস্বীকৃতির কারণ কি এই যে, তারা তাঁকে পাগল বা জ্বিনগ্রস্থ মনে করে? না, তাও হতে পারে না। কেননা তারা মুখে যাই বলুক না কেন, অন্তর দিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমার কথা স্বীকার করে। ইহা ছাড়া একজন পাগল ও একজন সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা এমন কোন অজানা বা অস্পষ্ট জিনিস নয়, যার দরুন এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবেনা। তাঁর কথাবার্তা শুনে ইহা কোন পাগলের কথাবার্তা এরূপ উক্তি একজন হটকারী, নির্লজ্জ ও নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া আর কে করতে পারে? তাঁর জীবন ধারা লক্ষ্য করে উহা কোন পাগলের জীবন এমন কথা কেহ বলতে পারে কি? যদি তাই হয় তবে'তো তা বড়ই আশ্চর্য্যজনক পাগলামী কিংবা পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা যেমন পাগলের মতই বলে '(মৃগীরোগের আঘাত)'। যার ফলে কোরআনের মত এমন কালাম তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় যা এমন এক আন্দোলনের সূচনা করে, যা কেবল তাদের দেশেরই নয় সমগ্র দুনিয়াবাসীর ভাগ্য নির্ধারন করে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি প্রচন্ড আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

উল্লেখ্য যে, নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় যখন অতি উৎকৃষ্টতম ভাষায় কোরআনের সূরা/আয়াত নাজিল হতে থাকে তখন বর্বর কাফের/মুশরিকদের পক্ষে উহা অনুধাবন করা সম্ভব হতো না। তাদের নিকট উহা অতি বিস্ময়কর বলে মনে হতো এই ভেবে যে এক অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কোরআনের বাণীর মত বাক্য প্রকাশ করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কাজেই ইহা তো পাগলের পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে। তাদের এরূপ ধারনার প্রতিবাদে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, **"হে রাছুল তুমি তোমার রবের কৃপায় পাগল নও। (আর কে পাগল তা অতি শীঘ্রই) তুমি দেখতে পাবে আর তারাও দেখতে পাবে।" সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত-৫**। বলা বাহুল্য, কে পাগল ছিল অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকরা নিজ জীবনে নিজ চোখেই দেখে গেছে।

১০) **"(হে নবী) তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না, নিজের হাত দিয়েও কিছু লিখতে না। যদি তাই হত, তবে বাতিল পন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেত পারত। আসলে এইগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন (আয়াত) বিশেষ করে সেই লোকদের অন্তরে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর আমাদের আয়াত সমূহ যালেম লোক ব্যতীত আর কেহ অস্বীকার করে না।" (সূরা আনকাবুত আয়াত ৪৮-৪৯)**। তফসীর ঃ-

উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে এই যে, নবী করীম (ছাঃ) লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর দেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন ও বংশ-বেরাদরীর যে সব লোকের সামনে তিনি জন্ম গ্রহণ থেকে মধ্যম বয়সে পৌছা পর্যন্ত জীবন যাপন

www.pathagar.com

করেছেন, তারা খুব ভালভাবেই জানত যে, তিনি জীবনে কোনদিনই কোন কিতাব পড়েন নাই, কখনও কলম হাতে ধরেন নাই। এই বাস্তব সত্য ঘটনা পেশ করে আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "আসমানী কিতাবীদের শিক্ষা, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগনের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দ্বীনের আকায়েদের কথা, প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাস ও তামাদ্দুন, নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক বিষয়ের যেসব গুরুত্বপূর্ন সমস্যা সম্পর্কে এই উম্মী (নিরক্ষর) নবীর মুখে জ্ঞানপূর্ণ কথাবর্তা প্রকাশিত হচ্ছে তা আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া 'ওহী' ছাড়া আর কোন উপায়েই জানা যেতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) যদি লেখাপড়া জানতেন এবং লোকেরা তাঁকে লেখাপড়া ও অধ্যয়ন-অনুসন্ধান করতে দেখত, তাহলে বাতিল পন্থীদের জন্য ইহা বিশেষ সন্দেহের কারণ হতে পারত। তারা বলতে পারত যে, ইহা ওহীর মারফতে পাওয়া ইল্‌ম (জ্ঞান) নহে, নিজেরই অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফল মাত্র। কিন্তু তাঁর উম্মী হওয়ার ব্যাপারটি তো এই ধরনের কোন সন্দেহেরই একবিন্দু অবকাশ রাখেনি। এখন নিছক হঠকাতিরা ছাড়া তাঁর নবুয়াতকে অস্বীকার করার অপর কোন কারণই থাকতে পারেনা। আর ইহার অস্বীকৃতিকে যুক্তিসংগত বলে মেনে নেয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

একজন উম্মী লোকের পক্ষে কুরআনের মত একখানি মহান গ্রন্থ পেশ করা এবং সহসা এমন সব অস্বাভাবিক কার্যক্রম দেখানো, যার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের কোন লক্ষণই কখনও দেখা যায়নি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য ইহা তাঁর নবুয়াত সত্য প্রমানকারী অকাট্য দলিল এবং উজ্জলতম নির্দশন, সন্দেহ নেই। দুনিয়ার ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে যার অবস্থারই যাচাই করা হবে, তার পরিবেশের মধ্যে এমন সব কার্যকারণের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে, যা তার ব্যক্তিত্ব রচনার এবং তার দ্বারা সংগঠিত কার্যক্রমের জন্য তাকে (পূর্ব থেকে) তৈয়ার করার কাজে নিয়োজিত ছিল বলে নির্দেশ করা যাবে। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব রচনার উপাদান সমুহের মধ্যে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর ব্যক্তিত্ব যে সব বিস্ময়কর যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ছিল তাঁর পরিবেশে ও চারপাশে উহার কোন উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখনকার আরবদেশ ও তার পরিবেশ, কিংবা আশেপাশে যে সব দেশের সহিত আরবদের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ ছিল সেই সবের সমাজ পরিবেশে কোথাও ঐ সব উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না, যার সহিত হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর ব্যক্তিত্ব রচনার মৌল উপাদানের সহিত কোনরূপ মিল, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য থাকতে পারে। ইহা এক অকাট্য ও পরম সত্য। ইহার ভিত্তিতেই এখানে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর ব্যক্তিস্বত্ত্বা শুধু একটি মাত্র নিদর্শন নহে, বরং বহু সংখ্যক নিদর্শনের সমন্বিত সমষ্টি। মূর্খ জাহেলরা ইহাতে কোন নিদর্শন (চিহ্ন) দেখতে পাক আর না-ই পাক, চিন্তাশীল বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানবান ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই

www.pathagar.com

নিদর্শন সমূহ দেখে নিজেদের মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, ইহা নবুয়তের নির্দশন (লক্ষন) ছাড়া আর কিছুই নহে। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

১১) "এই লোকেরা বলে, 'এ ব্যক্তির উপর তাঁর রব -এর তরফ থেকে 'নিদর্শন' (মো'জিযা) নাযিল করা হয়নি কেন? বল, 'নিদর্শন সমূহ তো আল্লাহর নিকট রয়েছে আর আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শক ও সাবধানকারী'। এ লোকদের জন্য এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নহে, যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব (এই কোরআন) নাযিল করছি, যা এ লোকদেরকে পড়ে শুনানো হয়? আসলে এতে রয়েছে রহমত ও নসীহত সেই লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে" (সূরা আনকাবুত -আয়াত ৫০-৫১)। তফসীর ঃ

তারা (মক্কার কাফের মুশরিকরা) দাবী করত যে, যে মুহাম্মদ নবী হয়ে থাকলে তার উপর নিদর্শন 'আয়াত' তথা 'মু'জিযা' নাজিল হচ্ছে না কেন, যা দেখে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর পক্ষে আল্লাহর প্রকৃত নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। (এর জবাবেই বলা হচ্ছে যে,) মুহাম্মদ উম্মী (সম্পূর্ণ নিরক্ষর) হওয়া সত্বেও তাঁর প্রতি কুরআনের মত একখানি বিরাট অলৌকিক কিতাব নাজিল হওয়াটাই কি মূলতঃ একটা বড় মু'জিযা নহে? তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য ইহাই কি যথেষ্ট নহে? ইহার পরও কি অপর কোন মু'জিযার প্রয়োজন থাকতে পারে? অপর মু'জিযাগুলি যারা দেখেছে তাদের জন্য তো তা' মু'জিযা ছিল। কিন্তু এই মু'জিযা তো সব সময়ই তোমাদের সামনে রয়েছে। ইহা তোমাদেরকে প্রতিদিন পাঠ করে শোনানো হয়, তোমরা সব সময়ই ইহা দেখতে পার (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

বলা বাহুল্য আল-কোরআনরূপ অবিনশ্বর, বিস্ময় ও চাঞ্চল্যকর মু'জিযা ছাড়াও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত শত সহস্র মু'জিযা রয়েছে যা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহস্র সহস্র সাহাবা বা কাফের-মুশরিকদের সম্মুখেই প্রকাশ পেয়েছিল। রাছূল (ছাঃ) -এর মু'জিযা সম্বলিত বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছে যাতে রাছুল (ছাঃ) -এর এইসব বিস্ময়কর মু'জিযা সমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১২) "আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, 'এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়'। অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি (এ কোরআন) হচ্ছে পরিস্কার আরবী ভাষায়। আসলে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহ মানে না, আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার সুযোগ দেন না এবং এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব (শাস্তি)। (নবী মিথ্যা কথা তৈরী করেন না, বরং) মিথ্যা তো তারাই তৈরী করছে যারা আল্লাহর

www.pathagar.com

নিদর্শন (আয়াত) সমূহ মানেনা, তারাই আসলে মিথ্যাবাদী" (সূরা নহল আয়াত-১০৩-১০৫)। তাফসীর ঃ-

(কাফের মুশরিকরা অনেক সময় বলত যে, কোন অনারব ব্যক্তি রাছুল (ছাঃ) কে কোরআন শিক্ষা দেয় যা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে নাজিল হচ্ছে বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে) হাদীসে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে উপরোক্ত ধারনা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবার'। সে ছিল 'আমের ইবনুল-হাদ্‌রামীর' রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক হাদীসে 'খুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্‌যা'র এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ। তৃতীয় এক হাদীসে 'ইয়াসার' নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল 'আবুল ফুকাইহাহ্'। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি হাদিসে 'বাল আন' বা 'বাল আম' নামক এক রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। মোট কথা, এদের মধ্যে থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি 'তাওরাত' ও 'ইনজীল' পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে, শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মদ ছাল্লাহল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন।

এ থেকে নবী করীমের (ছাঃ) বিরোধিরা তাঁর ওপর দোষারোপ করার ব্যাপারে কত নির্লজ্জ ও নির্ভীক ছিল, কেবল তাই অনুমিত হয় না, বরং নিজেদের সমকালীনদের মূল্য ও মর্যাদা নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও মানুষ যে কতটা ন্যায়-নীতিহীন ও ইনসাফ বিবর্জিত হয়ে থাকে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। তাদের সামনে ছিল মানব ইতিহাসের এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যার নজির সে সময় সারা দুনিয়ায় কোথাও ছিল না, এমনকি আজ পর্যন্তও কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই কান্ডজ্ঞানহীন নির্বোধেরা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজীল পড়তে পারতো এমন একজন অনারব গোলামকে এ মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করেছিল। তারা ধারনা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খন্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে। (আসলে 'মিথ্যা তো তারাই তৈরী করছে যারা আল্লাহ'র আয়াত (নিদর্শন) সমূহ মানে না, তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী') (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

www.pathagar.com

১৩) "আমাদের স্পষ্ট কথাগুলি যখন তাদেরকে শুনানো হয় তখন সেই লোকেরা যারা আমার সহিত (পরকালে আল্লাহ'র সাথে) সাক্ষাতের আশা পোষন করে না তারা বলে যে, ইহার পরিবর্তে অপর কোন কোরআন নিয়ে আস, কিংবা এতেই কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত কর। (হে মুহাম্মদ) তাদের বল, ইহা আমার কাজই নহে যে, আমার নিজের তরফ থেকে উহাতে (কোরআনে) কোনরূপ রদবদল করে নিব। আমি তো শুধু সেই অহীর-ই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠান হয়। আমি যদি আমার খোদার না-ফরমানী করি, তাহলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় রয়েছে। আর বল, আল্লাহর ইচ্ছা যদি এরূপ না হত তাহলে আমি এই কোরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ইহার খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে একটা জীবনকাল তোমাদের মধ্যেই অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ কর না? অতঃপর তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে তা আল্লাহ'র নামে চালিয়ে দিবে, কিংবা আল্লাহর কোন সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করবে? নিশ্চিত জেনো, পাপী অপরাধী লোক কখনই কল্যান লাভ করতে পারে না।" সূরা ইউনুস আয়াত ১৫-১৭)। তফসীর ঃ-

("কোরআন নবী করীম (ছাঃ) নিজস্ব বাণী"), তাদের (কাফের/মুশরিকদের) এই কথাটি প্রথমতঃ এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) যা কিছু পেশ করছেন, তা খোদার বাণী নহে, খোদার তরফ হতে নহে। বরং উহা তাঁর নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত। উহাকে খোদার নামে এই উদ্দেশ্যে পেশ করছেন যে, এর ফলে মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, '(হে মুহাম্মদ) তুমি তওহীদ, পরকাল আর নৈতিক বিধি-নিষেধের ব্যাপারে এসব কি কথা বার্তা বলতে শুরু করছ? নেতৃত্ব করার যদি ইচ্ছা করেই থাক, তবে এমন কোন জিনিস পেশ কর, যাতে জাতির কল্যাণ হবে এবং বৈষয়িক জীবন পূর্ণ হবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে। আর তোমার এই দাওয়াত যদি বদলাতে রাজী না-ই হও, তা হলে উহাতে অন্ততঃ এতখানি উদারতা ও সহনশীলতার (?) অবকাশ সৃষ্টি কর যার ফলে তোমার সাথে কম বেশী কোন ভিত্তিতে সমঝোতা ও সন্ধি হতে পারে। তোমার কিছু কথা আমরা মেনে নেব। অনুরূপভাবে তুমিও আমাদের কিছু কথা মেনে নিবে। তোমার তওহীদ বিশ্বাসে আমাদের কিছু শিরক, তোমার খোদানুগত্যে আমাদের নফসের দাসত্ব ও দুনিয়ার পূজা, আর তোমার পরকাল বিশ্বাসের সহিত আমাদের এই যা ইচ্ছা তা করার প্রবণতার কিছুটা সুযোগ বের করতে হবে। পরকালে কোন-না কোন রকমে আমাদের মুক্তি ব্যবস্থা হতে হবে। তাছাড়া তোমার এই চূড়ান্ত ও অটল-অনড় নৈতিক বিধি-বিধানও আমাদের গ্রহনযোগ্য নহে। উহাতে আমাদের হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মম্ভরিতা, আমাদের রসম রেওয়াজ, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় আশা-আকাংখা পূরণের এবং আমাদের লালসা-বাসনা চরিতার্থ করার কিছুটা সুযোগ সুবিধা অবশ্যই থাকতে হবে। ইহাও তো হতে পারে যে, দ্বীন সম্পর্কিত দায়িত্ব কর্তব্য একটা পছন্দসই প্রেক্ষিতে তোমার ও আমাদের পারস্পারিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে নেয়া হবে। আর তার মধ্যে থেকে আমরা যতখানি হয় খোদার

www.pathagar.com

হকও আদায় করে দিব। অতঃপর আমাদের স্বাধীন করে ছাড় দিতে হবে, আমরা যেভাবে ইচ্ছা দুনিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে থাকব। তুমি তো সমগ্র জীবন ও যাবতীয় কাজকর্মকে তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের চৌহদ্দির মধ্যে অষ্টোপাশে বেঁধে দিতে চাও। ইহা আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি!'

উপরের দুইটি কথারই জবাব ইহা (উক্ত আয়াত)। ইহাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ কিতাবের গ্রন্থাকার আমি (মুহাম্মদ) নহি। ইহা অহীর মাধ্যমে আমার নিকট অবতীর্ন হয়েছে। ইহাতে কোনরূপ রদবদল করার কোন ক্ষমতা বা অধিকারই আমার নেই। আর এই কথাও সত্য যে, ইহাতে সন্ধি-সমঝোতার কোন অবকাশ থাকতে পারে না। যদি কবুল করতে হয়, তবে পূর্ণ দ্বীন-ইসলামকে যেমন উহা আছে তেমনিভাবেই কবুল কর। অন্যথায় প্রত্যাখান কর।

তাদের এ খেয়ালও ছিল যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) নিজ হাতে কোরআন রচনা করে খোদার নামে চালাচ্ছে। ইহার প্রতিবাদে এবং হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর এ দাবী যে, তিনি নিজে ইহার রচয়িতা নহেন, বরং খোদার নিকট হতে অহীর মাধ্যমেই ইহা তাঁর নিকট নাজিল হয়েছে, ইহার সমর্থনে আলোচ্য কথা কয়টি অকাট্য দলীল। অন্যান্য পর্যায়ের দলীল তো অপেক্ষাকৃত দূরের জিনিস। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর জীবন তো তাদের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত ব্যাপার ছিল। নবুয়ত লাভের পূর্বে পুরা চল্লিশটি বৎসর পর্যন্ত তিনি আরববাসীদের মধ্যে থেকেই অতিবাহিত করেছেন। তাদেরই শহরে তিনি জন্মগ্রহন করেছেন, তাদের চোখের সামনে তিনি শৈশব কাটিয়েছেন, যৌবনে পদার্পন করেছেন, অর্ধ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছেন। থাকা-খাওয়া, চলাফিরা, মিলা-মিশা, লেনদেন, বিবাহ-শাদী-মোটকথা সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদেরই সাথে ছিল। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাদের নিকট গোপন ছিল না। এরূপ সম্পূর্ণ জানা-শোনা-দেখা-পরীক্ষা করা জিনিস অপেক্ষা উন্মুক্ত অকাট্য সাক্ষ্য আর কি হতে পারে।

নবী করীম (ছাঃ) -এর এ জীবনে দুইটি জিনিস ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সুস্পষ্ট। মক্কার প্রতিটি মানুষ তা ভালভাবেই জানত। জিনিস দুইটি এই ঃ-

এক ঃ এই যে, নবুয়তের পূর্বে গোটা চল্লিশ বৎসরের জীবনে তিনি এমন কোন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, লালন ও সাহচর্য-সংস্পর্শ পান নাই এবং তা থেকে এমন তথ্য ও তত্ত্বও তিনি জানবার সুযোগ পান নাই, যার দরুন সহসাই নবুয়তের দাবীর সংগে সংগে তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানের এই ঝর্ণাধারা প্রবাহিত শুরু হতে পারে। কোরআনের এই পরপর কয়টি সূরায় যেসব বিষয়, যেসব সমস্যা, আদর্শ ও চিন্তা-মতবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে, এ সব বিষয়ে ইতিপূর্বে তাঁকে কোন আগ্রহ-উৎসাহ দেখাতে এ পর্যায়ের কোন কথাই বলতে শোনা যায় নাই। এমনকি এই পূর্ণ চল্লিশটি বৎসরকালে তার কোন নিকটতম প্রিয় বন্ধু, কোন নিকটাত্মীয় তাঁর কথায়, কাজে-কর্মে ও গতিবিধিতে এমন কোন পূর্বাভাস বা ভাবধারাই লক্ষ্য করে নাই, যার দরুন চল্লিশ বৎসর বয়সে পৌঁছতেই তিনি সহসাই নবুয়তের দাবী করে বসতে পারেন। কোরআন

www.pathagar.com

যে তাঁর নিজস্ব কল্পিত কোন জিনিস নহে, ইহা তার অকাট্য প্রমান। বস্তুতঃ ইহা তাঁর নিকট বাহির থেকেই আসা একটি কিতাব। কেননা মানবীয় মস্তিষ্ক স্বীয় জীবনের কোন এক পর্যায়েও এমন কোন জিনিসই পেশ করতে পারে না, যার উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন পূর্ববর্তী জীবনের কোন পর্যায় সমূহে দেখতে পাওয়া যায় নাই। এ কারণেই মক্কায় কোন চতুর লোক যখন নিজেরাই অনুভব করতে পারল যে, কোরআনকে রাছুলের (ছাঃ) স্বকপোলকল্পিত বলা নিতান্তই একটা অর্থহীন অপবাদ, তখন তারা বলতে শুরু করল যে, অপর কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে এ সব কথা-বার্তা শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় উক্তিটিও প্রথম কথা অপেক্ষাও অধিক মূল্যহীন। এ কারণে যে, মক্কা তো দূরের কথা, সমগ্র আরব দেশেও এমন যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না, যাকে নির্দেশ করে বলা যেতে পারে যে, এ ব্যক্তি এহেন সর্ব্বোত্তম কালামের প্রকৃত রচয়িতা কিংবা রচয়িতা হতে পারে। এ পর্যায়ের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক কি কখনও আত্মগোপন করে থাকতে পারে?

তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের দ্বিতীয় যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা এই যে, মিথ্যাবাদ, ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ঠকবাজী ও এ ধরনের অন্যান্য নৈতিক কদর্যতার নাম চিহ্নও রাছূলের জীবনে কস্মিন কালেও দেখা যায় নাই। সমগ্র সমাজে এমন কোন ব্যক্তিই ছিল না, যে চল্লিশ বৎসর কালীন একত্র জীবন-যাপনের বেলায় এ ধরনের কোন জিনিস রাছুলের চরিত্রে ছিল বলে দাবী করতে পারে। পক্ষান্তরে যে যে লোকই কোন না কোনভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সে-ই তাঁকে একজন সত্যবাদী, সত্যাদর্শী, নিষ্কলুষ ও সর্বদিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই দেখতে পেয়েছে। নবুয়ত লাভের মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বেও কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে পাথর পুনঃস্থাপনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে কুরাইশের বিভিন্ন বংশের লোকদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করে যে, আগামীকাল সকালে যে লোক সর্বপ্রথম হেরেম শরীফের মধ্যে প্রবেশ করবে, তাকেই সকলে পঞ্চায়েত শালিশ মেনে নিবে। দ্বিতীয় দিন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সেখানে প্রবেশ করেছিল, তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)। তাঁকে দেখতে পেয়েই সমবেত লোকেরা বলে উঠিল "এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, আমরা তাকেই শালিশ মেনে নিতে রাজী হলাম। তিনি তো মুহাম্মদ (ছাঃ),- (আল-আমীন-বিশ্বস্ত)"। এ ভাবে তাঁর নবী ও রাছূল নিযুক্ত হবার পূর্বেই আল্লাহতায়ালা সমগ কুরাইশদের দ্বারা তাঁকে একজন "বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য" ব্যক্তি রূপে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। বস্তুত যে ব্যক্তি নিজের সমগ্র জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন ব্যাপারেও কোন মিথ্যাবাদ, জালিয়াতি, ধোকা ও প্রতারনার প্রশ্রয় দেন নাই, তিনি সহসা এতবড় একটা মিথ্যা এবং এত বিরাট এক ধোকা-প্রতারণার আওয়াজ তুলবেন, নিজের রচিত ও কল্পিত জিনিসের পূর্ণ শক্তিতে প্রবলভাবে খোদার নামে চালাতে চেষ্টা করবেন, ইহা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে, আর এইরূপ ধারণার অবকাশই বা কিরূপে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতা'য়ালা নবী (ছাঃ) কে বলেছেন ঃ এই লোকদের এহেন মিথ্যা ও অর্থহীন অপবাদের জবাবে তাদের বল যে, 'তোমরা বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে হারিয়েছ, আমি তো বহিরাগত ও অপরিচিত কোন লোক নহি, ইতিপূর্বে জীবনের একটা বিরাট অংশ তোমাদের মধ্যে থেকেই কাটিয়েছি। আমার পূর্ববর্তী জীবন দৃষ্টে খোদার প্রদত্ত শিক্ষা ও তাঁর নির্দেশ ব্যতীত এ কোরআন আমি তোমাদের সামনে পেশ করব, ইহা তোমরা কেমন করে আশা করতে পার?

(কাজেই গভীরভাবে ভেবে দেখ) এই আয়াত সমূহ যদি খোদার না হয়ে থাকে, আর আমি নিজে রচনা করে ইহা খোদার আয়াত হিসাবেই পেশ করতে থাকি, তাহলে আমার অপেক্ষা বড় জালেম তো কেহই হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহা যদি প্রকৃতই খোদার আয়াত হয়ে থাকে, আর তোমরা ইহাকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করে বস, তবে তোমাদের অপেক্ষাও অধিক জালেম আর কেহ হতে পারে না। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

১৪) **"যেসব লোক নবীর দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ 'এ কুরআন এক মনগড়া জিনিস যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এ কাজে তার সাহায্য করছে'। বড়ই জুলুম এবং অতীব কঠিন মিথ্যা এ কথা, যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে। তারা বলে ঃ 'ইহা পূর্বতন লোকদের রচিত জিনিস, যা এ ব্যক্তি নকল করে বলে থাকে, আর সকাল-সন্ধ্যা তা শুনানো হচ্ছে'। হে মুহাম্মদ! এ লোকদেরকে বল ঃ ইহা নাযিল করেছেন সেই মহান সত্ত্বা, যিনি যমীন ও আকাশ মন্ডলের তত্ত্ব-রহস্য জানেন"** (সূরা ফুরকান আয়াত-৪-৫)। তফসীর ঃ-

এ যুগে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ তুলে থাকে সে কালের আরবে মুশরিক কাফেররাও ঠিক তেমনি অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবী করীম (ছাঃ) -এর সময়ের দুশমনদের মধ্যে কেহই এই কথা বলেনি যে, "তুমি বাল্যকালে 'বুহাইরা' পাদ্রীর সাথে যখন (সিরিয়ায়) সাক্ষাত করে ছিলে তখনই এই সব কথা যা আজ বলছ ও প্রকাশ করছ, তার নিকট থেকে শিখে নিয়েছ"। তারা এই কথাও বলে নাই যেঃ "যৌবনকালে যখন ব্যবসায় সফর উপলক্ষ্যে তুমি অন্যান্য দেশে যাতায়াত করতে তখন তুমি খৃষ্টান পাদ্রী ও ঈয়ামুদী 'রিব্বীদের' নিকট থেকেই এই সব শিখে নিয়েছিলে"। এসব কথা তারা যে বলেনি, তার কারণ এই যে, তাঁর বিদেশ সফরের বিস্তারিত বিবরণ সকলেরই জানা ছিল। এই সফর তিনি একাকী করেননি, কাফেলার সংগে হয়েছিল এই বিদেশ যাত্রা। তারা জানত, এই সফরে কিছু শিখে আসার অভিযোগ করলে এই শহরেরই শত শত মানুষ উহার প্রতিবাদ করবে ও আমাদেরকে মিথ্যুক বলবে। এতদ্ব্যতীত মক্কা শহরের প্রত্যেক সাধারণ মানুষই জিজ্ঞাসা করবে ঃ এই সব তথ্য ও তত্ব কি তিনি সেই বার/তের বছর বয়সেই লাভ করেছিলেন, না কি ২৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি ব্যবসায়ী সফর শুরু করে ছিলেন ? এই ব্যক্তি তো-বাইরের কোথাও থেকে আসেন নাই, বাইরে

www.pathagar.com

কোথাও থাকতেনও না, থাকতেন তো আমাদের মধ্যেই, তাহলে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এ ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞান-সম্পদ লুকিয়ে থাকল, কখনো তাঁর মুখে এ ধরনের তথ্য জ্ঞাপক একটি কথাও প্রকাশিত হল না, ইহার কারণ কি? ঠিক এ কারণেই মক্কার কাফেরগণ কখনও এই ধরনের ভিত্তিহীন ও পরিস্কার মিথ্যা কথা বলার সাহস করে নাই। তারা বোধ হয় পরবর্তী কালের নির্লজ্জ কুচক্রী হীনমন্য লোকগুলির জন্যই এই কথাটি বাকী রেখে দিয়েছিল। তারা যা বলত (অভিযোগ করত) তা নবুয়াতের পূর্বকালের সহিত সম্পর্কিত নয়, তা সবই ছিল নবুয়াতের দাবী পেশ করার পরবর্তীকাল সম্পর্কিত। তারা বলত ঃ "এই ব্যক্তিতো অ-লেখাপড়া লোক। নিজে অধ্যয়ন করে নতুন জ্ঞান ও তথ্য জানাতে অক্ষম। সে কিছুই শিখে নাই। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে এ সব কথার কোন একটি কথাও জানত না, অথচ আজ সেই সব কথাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। সে এখন এ সব জ্ঞান কোথা থেকে লাভ করল? উহার উৎস অবশ্যই পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবাদিই হবে। উহার নির্বাচিত অংশ সমূহ রাতারাতি তরজমা ও নকল করা হয়। আর তা কারও দ্বারা সে পড়িয়ে শুনে আর মুখস্থ করে দিনের বেলা আমাদেরকে শুনায়।" হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, এই পর্যায়ে তারা কয়েকজন আহলে কিতাবের ঐশী (কিতাব প্রাপ্ত তথা ইহুদী/নাসারগণের) নামও উল্লেখ করত। তারা শিক্ষিত ও লেখাপড়া জানা লোক ছিল। তারা মক্কারই অধিবাসী ছিল। সে নামগুলি হল এই ঃ আদ্দাস বা আইশ (খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উজ্জার আযাদ করা গোলাম), ইয়াসার (আমের ইবনুল হাজরামীর আযাদ করা গোলাম) ও জাবার (আমের ইবনে রনীয়ার আযাদ করা গোলাম) ইত্যাদি।

বাহ্যত এই আপত্তি বা সংশয় খুবই জোরদার মনে হয়। ওহীর দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য নবীর জ্ঞানের উৎস ও উপায়ের কথা বলে দেয়া অপেক্ষা জোরদার আপত্তি ও সংশয় আর কি হতে পারে? অথচ দেখা যায় (এখানে) ইহার জবাব দেয়া হলেও জওয়াবে কোন দলিলই পেশ করা হয় নি। ইহা দেখে সত্যই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। শুধু এতটুকু কথা বলেই সমস্ত কথা শেষ করে দেয়া হয়েছে, যে, "তোমরা সত্য ও সততার উপর 'যুলুম' করছ, সুস্পষ্ট 'না - ইনসাফীর' কথা বলছ, মিথ্যার এক প্রবল ঝড়-ঝঞ্জার সৃষ্টি করছ। ইহাতো সেই আল্লাহর কালাম, যিনি আসমান যমীনের সমস্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত"। বস্তুত এত তীব্র বিরুদ্ধতার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এমন এক যবরদস্ত আপত্তি ও সংশয় উত্থাপন করা হবে, আর উহাকে এমনিভাবে অবজ্ঞার ছলে প্রত্যাখ্যান করা হবে, ইহা কি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? ইহা কি বাস্তবিকই কোন অযৌক্তিক প্রশ্ন বা আপত্তি ছিল? ইহার জওয়াবে শুধু "মিথ্যা" আর "যুলুম' বলে দেয়াই কি যথেষ্ট ছিল? আর কুরআনের এরূপ সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়ার পর জনগনই বা কেন বিস্তারিত জবাব পেতে চাইলনা? আর এর জন্য নও-মুসলিম তথা নূতন ঈমানদারদের মনেই বা কোন সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি না হয়ে পারল কি ভাবে? শুধু তাই নয়, বিরুদ্ধাবাদীদের মধ্য থেকেও কেহ বলল না- বলবার সাহসও করল না যে, "আমাদের এতবড় জোরদার প্রশ্ন ও আপত্তি-সংশয়ের (আসলে)

www.pathagar.com

কোন জওয়াবই দেয়া হল না। শুধু 'মিথ্যা' আর 'যুলুম' বলেই দায় সারবার চেষ্টা করা হয়েছে।"

ইহা এক রহস্যই বটে এবং যে পরিবেশের মধ্যে বিরুদ্ধাবাদীর এ আপত্তি ও সংশয় উত্থাপন করেছিল, সেখান থেকেই আমরা ইহার জওয়াব পেতে পারি।

প্রথম কথা এই যে, মক্কার যেসব যালেম সরদার যারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করছিল তারাতো এক-একজন মুসলমানকে ধরে মারপিট করত, জ্বালা-যন্ত্রনা দিত, তারা যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেছিল যে, তারা প্রাচীন কিতাবাদি থেকে তরজমা করে মুহাম্মদ (ছাঃ) কে এ সব কথা কণ্ঠস্থ করিয়ে দেয়, তাদের ঘর স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) এর ঘরের তল্লাশী নিয়ে সে সমস্ত পুস্তক-সম্ভার জনগনের সম্মুখে পেশ করে দিতে পারত, যা এ কাজের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে তারা মনে করত। এ কাজ যে মুহূর্তে করা হচ্ছিল সে মুহূর্তেই তারা আকস্মিকভাবে তল্লাশী চালাতে পারত এবং লোকদের সম্মুখে ধরিয়ে দিতে পারত, বলতে পারত যে, দেখ হে লোকেরা, এ সব কিতাবাদির সাহায্যেই নবুয়াতী চাল চালবার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে- অন্ততঃ ইহা ধরিয়ে দিতে চাইলে এরূপ করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। যে সমাজের লোকেরা হযরত বেলাল (রাঃ) কে উত্তপ্ত বালুকার উপর হেচড়া টান-টানছিল, তাদের পক্ষে কোন আইন বা নিয়ম-নীতিই এ কাজের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারত না। এরূপ করলে তো তারা চিরদিনের জন্য মুহাম্মদী-নবুয়াতের বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারত। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এরূপ কাজ তারা করেনি। শুধু মৌখিকভাবে আপত্তি উত্থাপন করেই তারা ক্ষান্ত হয়েছিল, একদিনও এমন কোন চূড়ান্ত ফায়সালাকারী পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে নাই।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ পর্যায়ে তারা যে সব লোকের নাম লইত, তারাতো কেহই বাহিরের কোন দেশ হতে আসে নাই, তারা সকলে এ শহরেরই অধিবাসী ছিল। তাদের যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে কারও নিকট অজানা ছিলনা। যারই সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞান ছিল, সে দেখতে পারত যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) যে জিনিস পেশ করছেন, তা কোন মর্যাদার জিনিস, ভাষা কোন মানের, তা কোন পর্যায়ের সাহিত্য, তাতে কথার জোর কতখানি, ভাব চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তু কিরূপ উন্নত। পক্ষান্তরে যে সব লোকের নিকট থেকে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ সব কথা গ্রহন করছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল-তারাই বা কি ধরনের লোক, তা তুলনা করে দেখাও কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। এ কারণে কেহই এহেন প্রশ্ন, আপত্তি বা সংশয়ের এক কানাকড়িও মূল্য দেয়নি। এ ধরনের কথা বলে যে, কেবল মনের ঝাল মিটানো হচ্ছে, তা বুঝতে কারও একবিন্দু কষ্ট হচ্ছিল না। এ কথার মধ্যে লোকদের মনে এক বিন্দু সন্দেহ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও ছিল না। আর যেসব লোক এ লোকদেরকে চিনত না, তারাও তো মনে করতে পারত যে, এ লোকগুলি যদি এতদূরই যোগ্যতা সম্পন্ন হবে তা হলে ইহার সাহায্যে তারা নিজেরাই বা নিজেদের (নবুয়তের) দোকান সাজান নাই কেন? অপর এক ব্যক্তির জ্বালানো

www.pathagar.com

প্রদীপে তৈল সংগ্রহ করে দেয়ার তাদের কি প্রয়োজন ছিল, কি বাধ্যবাধকতা ছিল? - আর তাও নাকি করা হত সম্পুর্ন গোপনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, কেহ যেন টেরই না পায় এমনভাবে। ইহার মূলে কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

তৃতীয় কথা এই যে, এ পর্যায়ে যেসব লোকের নাম করা হচ্ছিল তারা ছিল বিদেশাগত ক্রীতদাস। তাদের মনিবরা তাদেরকে আযাদ করে দিয়েছিল। তদানিন্তন আরবের কবীলাভিত্তিক (গোত্র ভিত্তিক) জীবনে কোন ব্যক্তিই কোন শক্তিশালী কবীলার সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত বাঁচতে পারত না। ক্রীতদাসরা মুক্ত হবার পর তাদের পূর্বতন মালিকের আশ্রয় ছাড়া হত না, তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বসবাস করত। তারাই হত তাদের সামাজিক জীবনের আশ্রয়। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-ই যদি (নাউজুবিল্লাহ) কোন মিথ্যা নবুয়াতীর দোকান চালাতে সমর্থ হয়ে ছিলেন, তাহলে তো এসব লোকেরা যারা তাঁর জন্য মাল-সমলা সংগ্রহ করছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল, তারা কোন প্রকার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে এ ষড়যন্ত্রে কখনও নবী করীম (ছাঃ) এর সহিত শরীক হতে পারত না। যেসব লোক রাত্রিকালে কিছু কথাবার্তা নবী করিম (ছাঃ)কে শিখিয়ে দিত, আর সকাল বেলা তিনি উহাকেই আল্লাহর নিকট থেকে ওহী এসেছে বলে চালাচ্ছিলেন (তারা যেমন ভাবত) তারা (একই সাথে) রাছূলের অকৃত্রিম, নিষ্ঠাবান ও সত্যিকার ভক্ত এবং সহকারী বন্ধু হতে পারে কি করে? তবে কি তারা কোন লোভ বা লালসার বশবর্তী হয়ে কোন স্বার্থ লাভের আশায় এ কাজ করেতছিল? কিন্তু তারা নিজেদের প্রাক্তন মালিকদেরকে অসন্তুষ্ট করে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর সহিত এই ষড়যন্ত্রে শরীক হয়েছে মনে করা (বিশ্বাস করা) কি কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? যে ব্যক্তি সমগ্র জাতির নিকট শত্রু, পরিত্যক্ত ও সব শত্রুতার লক্ষ্যস্থল, তাঁর সহিত তারা কোন স্বার্থের লোভে মিলিত হতে পারে এবং তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের সহিত সম্পর্ক খারাপ হবার ক্ষতিতে তারা এই বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতার বিনিময়ে অর্জিত কোন লাভ দ্বারা পূরন করার কথা চিন্তা করতে পারত? এ কথাও চিন্তা ও বিবেচনার বিষয় ছিল যে, তাদের মালিকরা তো তাদেরকে মারপিট করেও এ অপরাধের কথা তাদের দ্বারা স্বীকার করাতে পারত। বলাতে পারত যে, "আমাদের নিকট থেকে শিখে শিখে মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবুয়াতের এ দোকান সাজিয়ে বসেছে"।

সবচাইতে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সব লোকই নবী করীম (ছাঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন যাদের সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ করা হয়েছিল। রাছূল (ছাঃ) এর পবিত্র ব্যক্তি সত্ত্বার প্রতি তাদের ছিল আদর্শ স্থানীয় ভক্তি শ্রদ্ধা। কোন কৃত্রিম ও বানোয়াট নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনা ও গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করা কি সেসব লোকদের পক্ষে কখনই সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে, যারা সেই বানোয়াট নবী বানাবার ষড়যন্ত্রে নিজেরাই অংশগ্রহণ করেছিল? তা যদি সম্ভব বলে মনে করাও হয়, তাহলেও তা ঈমানদার লোকদের সমাজে তাদের বহু উচ্চ মর্যাদা হবার কথা ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু সেরূপ কিছু হয়েছি কি? নবুয়াতের কারবার চলবে "আদ্দাস", ইয়াসার ও 'জাবার' এর গোপন সাহায্য সহযোগিতায়, আর নবীর প্রধান বন্ধু হবে হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান ও আলী (রাঃ) প্রমুখ। ইহা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

এসব কারণেই তদানীন্তন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই এ আপত্তি ও প্রশ্নের একন্দিুও মূল্য ছিল না। আর কুরআনেও ঠিক এ কারণেই প্রশ্নটির কোন গুরুত সহকারে জওয়াব দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি, বরং কুরআনে ইহার এরূপ সংক্ষিপ্ত উল্লেখের কারণ শুধু এতটুকু দেখানো যে, দেখ, এ সত্য দ্বীনের বিরোধীতা ও শত্রুতা করার জন্য এ লোকগুলি কি রকম অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর তারা এ কজন কতদুর স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলতে শুরু করে (দিয়েছে) এবং কিরূপ বে-ইনসাফী করতে উদ্যত হয়েছে। (তফসীরে তাফহীমুল কোর-আন)।

উল্লেখিত তফসীর থেকে দেখা যায় যে, মানব জাতীর জন্য সর্ব্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী মহাগ্রন্থ আল-কোরআন আল্লাহর কালাম/বাক্য নয় বলে মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য এমন কোন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করে নাই। শেষ পর্যন্ত কোরআন চাকর, নওকর, গোলামদের দ্বারা মুহাম্মদ (ছাঃ) কে শিখানো বুলি বলতেও তাদের লজ্জা বোধ হয় নাই। তবে ইহা কার বুলি বা কালাম বা ভাষণ তা পরবর্তীকালে অবিশ্বাসীরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েই জেনে বুঝে গিয়েছে।

১৫) "হে নবী এদেরকে বল যে, এ দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াটকারী লোকদের মধ্যেরও কেহ নই। এ (কোরআন) তো একটি উপদেশ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য। আর অল্প কাল অতিবাহিত হতেই ইহার অবস্থা তোমরা জানতে পারবে"। সূরা সা'দ আয়াত ৮৬-৮৮)। তফসীর ঃ-

(হে নবী- ধর্মদ্রোহী কাফের মুশরিকদেরকে বলঃ) আমি এক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্য দ্বীন প্রচারের এ কাজ আমি করছি না।

নিজের বড়ত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্য যারা মিথ্যা দাবী নিয়া ওঠে এবং প্রকৃত পক্ষে তারা যা নয় তাই হবার চেষ্টা করে, আমি সেরূপ লোক নই। এ কথাটি নবী করীম (ছাঃ) -এর মুখে কেবল মক্কার কাফেরদেরকে জানাবার জন্যই বলানো হয় নাই, বরং ইহার পিছনে এ কাফেরদের সমাজে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল পর্যন্ত যাপিত হুজুরের পূর্ণ জীবনটাই সাক্ষী হিসাবে বর্তমান রয়েছে (তা-ও বিবেচনায় আনতে হবে)। মক্কার প্রতিটি বালকও জানত যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) কোন বানোয়াটকারী লোক নন। গোটা জাতির মধ্যে এক ব্যক্তিও তাঁর মুখে এমন কথা কখনো শোনেনি, যাতে তিনি কিছু একটা হতে চান এবং নিজেকে প্রভাবশালী বানাবার জন্য চিন্তা করছেন বলে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকতে পারে।

এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজেদের চক্ষে দেখতে পাবে যে, আমি যা বলছি তা পূর্ণ

www.pathagar.com

হয়ে গিয়েছে। আর যারা মরে যাবে, তারা মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে চলে যাবার কালেই জানতে পারবে যে, আমি যা বলছি, তা-ই সত্য (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

উপরে বর্ণিত আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের তরজমা ও তাফসীর সমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে আল-কোরআন সন্দেহাতীত ভাবে রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহ'র কালাম/বাণী। উল্লেখ্য যে, রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) এর চল্লিশ বৎসর বয়সে ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপী তাঁর পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে আল্লাহ'র তরফ থেকে ফিরিশতা জীবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর উপর যে সকল অহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল সে সবের সমষ্টিই হচ্ছে আল-কোরআন। আল্লাহ স্বয়ং বহুবার ঘোষণা করছেন যে, আল-কোরআন কোন মনুষ্য সৃষ্ট কিতাব বা গ্রন্থ নহে বা ইহা আল্লাহ'র রাছুল মুহাম্মদ (ছাঃ) -এরও নিজস্ব কোন বাক্য, কথা বা কালাম নহে। আল্লাহ বলেন- **"কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) কি হয়েছে, তারা কি এতটুকুও চিন্তা করে তলিয়ে দেখে না যে, কোরআন মজিদ যদি আল্লাহ ছাড়া কোন মানব রচিত গ্রন্থ হতো তবে তারা এর মধ্যে শত শত বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতা দেখতে পেত"।** (সূরা আম্বিয়া আয়াত ২২)। এভাবে ইহা যে কোন মানুষের বা রাছুলুল্লহ (ছাঃ)-এর বাণী/বাক্য/কালাম নহে তা' আল্লাহ-তা'য়ালা কোরআনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন যা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফের/মুশরিকরা ইহা আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে অবিশ্বাস ও গুরুতরভাবে সন্দেহ পোষণ করতো। যার ফলশ্রুতিতে কোরআন আল্লাহর কালাম/বাণী হওয়া সম্পর্কে অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী, কাফের, মুশরিক, মুনাফেক ও সন্দেহবাদীদেরকে লক্ষ্য করেই একাধিকবার উল্লেখিত চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, ইহা যদি তাদের ধারণা ও বিশ্বাস মতে আল্লাহর কালাম না হয়ে থাকে এবং ইহা যদি মুহাম্মদ (ছাঃ) -এরই নিজস্ব বা তাকে শিখানো কোন কালাম বা বাণী হয়ে থাকে, তা হলে তারাও কোরআনের মত গুণে, মানে, অলৌকিক ও অতুলনীয় অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী একখানা কিতাব প্রস্তুত করে এনে দেখাক। মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর মত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তি, যিনি জীবনে লেখাপড়ার ধারে কাছেও যান নাই, তিনি যদি কোরআনের মত অলৌকিক গুণসম্পন্ন, (মু'জিজা স্বরূপ) শেফাময়, (রোগ নিরাময় ক্ষমতা সম্বলিত), অন্তরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী, অসীম সম্মোহনী শক্তির অধিকারী, মানুষের মনে প্রাণে প্রচন্ড ভাবাবেগ সৃষ্টি- ক্ষমতা সম্পন্ন একখানা মহাগ্রন্থ যা আবার মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অর্থাৎ মনুষ্য জাতীর যাবতীয় সাম্ভাব্য সমস্যার চিরস্থায়ী বাস্তব সমাধান স্বরূপ, মনুষ্য জাতীর জন্য চিরন্তন শ্বাশ্বত আইন প্রদানকারী, সর্ব্বকালোপযোগী পূর্ণাংগ জীবন বিধানরূপী, উৎকৃষ্টতম মনোরম মনোহর, মধুময়, ছন্দময় ভাষায়, মহা-বিজ্ঞানময় একখানা মহাগ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়, তবে তারা (কাফের, মুশরিক, মুর্ত্তিপূজক, জড়বাদী ও বস্তুবাদীরা) যারা কাব্যে, সাহিত্যে অতুলনীয় পারদর্শী বলে সমাজে খ্যাতিমান, তারা উল্লেখিত গুণ মান সম্পন্ন পূর্ণ একখানা

www.pathagar.com

কোরআন রচনা করতে না পারার কারণ কি থাকতে পারে? এর সমতুল্য বা সমকক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ কোরআন যদি না-ই তৈরি করতে পারে তবে এর উপরোক্ত গুণসম্পন্ন দশটি সূরাই তৈরী করে এনে দেখাক। কিন্তু ইহাও যদি সম্ভবপর না হয় তবে, অন্ততঃ একটি সূরা বা (সূরার অংশ) একটি আয়াত/বাক্যই প্রস্তুত করে হাজির করুক। এর চেয়ে ক্ষুদ্র ও সহজ চ্যালেঞ্জ আর কি হতে পারে? এর পরও যদি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের অতি যুক্তিসংগত কারণেই উচিৎ, এ কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতারিত/নাজিলকৃত কিতাব/ঐশীগ্রন্থ তা মেনে নেয়া। অন্যথায় আল্লাহর হুশিয়ারী মোতাবেক তাদের ভয় করা উচিৎ নরকের/দোজখের সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকে যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে শুধু কাফের, (অবিশ্বাসী/মুশরিক/মুনাফেকদের) জ্বালাবার জন্যই।

উল্লেখ্য যে, এখানে কাফের, মুশরিক, মুনাফেকদেরকে কোরআন বা এর কোন সূরা অথবা সূরার কোন অংশ তৈরী করার জন্য যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে তা শুধু কোরআনের বাহ্যিক ষ্টাইলের, যেমন উহার ভাষা অলংকার, অপূর্ব রচনা শৈলী ইত্যাদি ষ্টাইলের (যা- আপতঃ দৃষ্টিতে সকলের নজরে পড়ে) কথাই বলা হয় নাই, বরং উহার ভাষা শৈলী ও বর্ণিত অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলীসহ উহার সমতুল্য একখানা মহাগ্রন্থ/কিতাব, কিতাবের অংশ ইত্যাদি তৈরীর করার জন্য চ্যালেঞ্জই প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাদের মধ্যে বহু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও তারা কোরআনের উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর মুখনিশ্রিত কোরআনের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, অভূতপূর্ব অলৌকিক, ঐন্দ্রজালিক মনোমুগ্ধকর কালাম/বাণী শুনে তারা উল্টো তাকে, কবি, কাহেন, গনৎকার, যাদুকর এমনকি পাগল পর্যন্ত আখ্যায়িত করতে ইতস্তঃ করতো না। কারণ তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে ভাল ভাবেই চিনত ও জানত। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জন্মগ্রহন থেকে শুরু করে আজীবন তাদের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তারা তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক মাতৃভাষার সাথে খুব ভাল ভাবেই পরিচিত ছিল। জীবনের চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যা বলেন নাই অথবা তাঁর বক্তব্য যেভাবে পেশ করেন নাই, তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পার হতেই হঠাৎ করে এক অভিনব, উৎকৃষ্টতম চমৎকার লালিত্যময় ও ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় তা প্রকাশ করতে শুরু করবেন তা তাদের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই অতি আশ্চার্য্যজনক ও বিস্ময়কর বলে মনে হতো। ফলে তাকে তারা যাদুকর বলতেও কোন দ্বিধাসংকোচ করত না। কারণ তাঁর মুখ দিয়ে যেভাবে এবং যে সমস্ত বাণী/কালাম বের হতো তা একমাত্র যাদুর পরশ ছাড়া অন্যকোন প্রকারেই যে সম্ভব নয়, তা তারা ভালভাবেই জানত এবং বুঝত এবং বিশ্বাস করত। এ কারণেও তারা এ কালামকে 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী' বলেও বেড়াত। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, একবার এ কালামের অনুসারী হয়ে পড়লে, কেহই তা রোধ করতে পারতনা। ফলে ইহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর রাছুল (ছাঃ) -এর কথা নয়, তা প্রকারান্তরে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হতো।

www.pathagar.com

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে অর্থাৎ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তথা- "আইয়ামে জাহেলিয়াত" যুগে আরবরা ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিকভাবে নৈতিকতার দিক দিয়ে বর্বরতার সর্ব্ব নিম্নে অবস্থান করলেও কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা ও চর্চায় তারা যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল, সে সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। তখনকার দিনে আরবে কবিতা লিখা এবং লিখিত উৎকৃষ্ট কবিতা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা হত এবং এতদ্বোদ্দেশ্যে নিয়মিত আসরও বসত। উল্লেখ্য যে, "উকাজ" নামক স্থানে কবিতা প্রতিযোগিতার মেলা জমত। উকাজ মেলার জায়গাটি ছিল পবিত্র কাবা গৃহের অনতিদূরে নকলা এবং তায়ফের মধ্যবর্তী স্থানে। এই উকাজেই প্রতি বৎসর বিশ দিন ব্যাপী মেলা বসত ও কবিতা সম্মেলন হতো। এই কবি সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতাও হতো। উকাজের মেলায় প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত ৭ বৎসরের ৭টি কবিতা পবিত্র কাবা গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এই ৭টি কবিতার সংকলনকেই "সাব আল মু-আল্লাকা" নামে পরিচিত ছিল যার অর্থ হচ্ছে 'সাত ঝুলন্ত কবিতা'। "উকাজ ছিল একটি বিরাট জাতীয় ব্যাপার"। (জাস্টিস স্যার সৈয়দ আমীর আলী - দি স্পিরিট অব ইসলাম)।

উল্লেখ্য যে, 'আইয়ামে ইসলামিয়াত' যুগে কোরআনের বিভিন্ন সূরা/আয়াত নাজিল হতে থাকলে উল্লেখিত ওকাজ মেলার ভূমিকা ও গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কালক্রমে কোরআনের মধুময় মনোমুগ্ধকর ভাষালংকার ও রচনা শৈলীই আরবের কবি সাহিত্যিকদের কাব্য সাহিত্য রচনার ভিত্তিরূপে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে পরবর্তীকালে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কবি সাহিত্যিকদের কাব্য/সাহিত্য কর্মকান্ডে আল-কোরআনের ভাষালংকার ও রচনাশৈলীর প্রচন্ড প্রভাব অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

আরো উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় আল-কোরআনের অলৌকিকতা, 'ইজাজ' বা 'মু'জিজা' সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লিখিত কোন রচনা বা পূর্নাংগ বই-পুস্তক খুব একটা দেখা যায় না। তবে কোরআনের এ বিশেষ দিকটা সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় "কোরআনের চিরন্তন মু'জিজা" নামক একখানা গুরুত্বপূর্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ইংরেজী ১৯৮০ সালে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের লিখক জনাব ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান আল-কোরআনের ইজাজ বা মু'জিজা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা/পর্যালোচনা করেছেন এবং এতদসম্পর্কে বিভিন্ন শতাব্দিতে বিভিন্ন বিখ্যাত মনীষীগণের লিখিত পুস্তক পুস্তিকার পর্যাপ্ত বিবরণসহ তৎসমূহ থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। লিখক তার এই মূল্যবান গ্রন্থে ১২শ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার আবুল ফজল কাযী আইয়ায (ওফাৎ ৫৪৪ হিজরী মোতাবেক ১১৪৯ ইং) কর্তৃক রচিত "আস্ শিফা ফী-তারীফি হুকুকিল মুস্তাফা" নামক এক অমর গ্রন্থে ইজাজ শাস্ত্রকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত ও অতি মুল্যবান আলোচনা করেছেন, তার কিছু কিছু বিবরণ দান করেছেন। পাঠক পাঠিকাদের বিস্তারিত অবগতির জন্য উক্ত "কোরআনের চিরন্তন মু'জিজা" গ্রন্থটি পড়ে দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। উক্ত গ্রন্থে

www.pathagar.com

বর্ণিত কোরআনের ইজাজ তথা অলৌকিকত্ব, (মু'জিজা) মনোমুগ্ধকর ও অসাধারণ সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে তৎকালীন আরবের লোকজন কিরূপ প্রভাবান্বিত হয়ে শত বাধা বিপত্তি ও প্রতিকুলতা অতিক্রম করে আল-কোরআন যে স্রষ্টার অবতারিত বিস্ময়কর ঐশীবাণী তা স্বীকার করতঃ ইসলাম গ্রহণ করতো, তার কতিপয় বিবরণ উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলঃ-

"আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন' নামক অনুগম গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইজায সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্থানে স্থানে কাযী আইয়াযের 'আস-শিফা' নামক গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন। কাযী আইয়ায এতে পবিত্র কুরআনের মু'জিযাকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন- কি অক্ষরে, কি বাক্যে, অনন্য বাকধারায়, সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, শব্দ যোজনায়, চয়নে ও উদ্দেশ্যে, দূর ভবিষ্যতের অজ্ঞাত এবং ঐতিহাসিক সংবাদ প্রদানে সব কিছুতেই সংমিশ্রীত হয়ে রয়েছে কুরআনের অলৌকিকতা। সরচাইতে আশ্চয্যের ও দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয় এই যে, পবিত্র কোরআনের ধারক, বাহক ও প্রচারক নবী মুস্তফা (ছাঃ) যাঁর মুবারক মুখ দিয়ে নিশিদিন উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়েছে এই অমর মু'জিযার বাণী, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ-রূপে উম্মী বা নিরক্ষর। যদি তিনি হতেন পন্ডিত বা সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রীধারী, তাহলে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ ধারণা করতে পারতাম যে, তিনি যে সমস্ত মু'জিযার বাণী আউড়াচ্ছেন সেগুলো হয়তো বা তিনি অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ থেকে অধ্যয়ন করেছেন, নকল করেছেন, মুখস্থ করেছেন অথবা ধার করেছেন। ("আস্-শিফা ফী তারীফি হুকুকিল মুস্তাফা ঃ পৃষ্ঠা ২১৬-২৩৭")। এতদসম্পর্কে উক্ত লিখক কাযী আইয়াযের উল্লেখিত গ্রন্থ থেকে আরো উল্লেখ করেন ঃ-

ক) যুগ যুগ ধরে পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী মানুষের মনে যে দাগ কেটেছে, এর সম্মোহনী শক্তি দিয়ে মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে- কাযী আইয়ায তাঁর এ অমূল্য বইয়ের মাধ্যমে তৎপ্রতিও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং পাঠকের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ প্রসংগে তিনি যুবায়ের বিন মুতইমের কথাও উল্লেখ করেছেন, যিনি মাগরিবের নামাযে আঁ হযরত (সাঃ) -এর সুললিত কণ্ঠে সূরা আত্তূর উচ্চারিত হতে শুনেই বিমুগ্ধ-চিত্তে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। হযরত যুবায়ের বিন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে তখন সবেমাত্র মদীনা শরীফে এসে উপনীত হয়েছিলেন। রাছুলে পাক (ছাঃ) -এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত সূরা আত-তূরের আয়াতগুলো এই ঃ-

"তাদের সৃষ্টি কি আপনা আপনি হয়ে গেছে, না নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? নাকি তারাই পয়দা করেছে আসমান-যমীনকে? বরং তারা আদৌ এটা প্রত্যয় করেনা। নাকি তাদের কাছেই গচ্ছিত আছে তোমার প্রভু পরওয়ারদিগারের ধন ও সম্পদ সম্ভার, নাকি তারাই সর্বেসর্বা?" (সূরা তূর আয়াত-৩৫-৩৭ - মৌঃ আবদুস সামী অনুদিত বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, মুলঃ শাহ আবদুল আযীয দিহলভী ঃ পৃষ্ঠা ২২৪)।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের এই সম্মোহনী বাণী শ্রবণ মাত্রই যুবায়েরের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা অজানা অচেনা বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যেন তার হৃদয়-মন-প্রাণকে সব সময় নিজের অজান্তে টানতে লাগলো। তাই আর কালবিলম্ব না করে জীবনের এই সর্ব প্রথম মহাস্মরণীয় দিনে, এই ঐতিহাসিক মাহেন্দক্ষণে তিনি আঁ হযরতের (ছাঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে ইসলামে দীক্ষা নিলেন।

ইসলামের ইতিহাস তথা- পবিত্র কুরআনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এ ধরনের প্রচুর দৃষ্টান্তের রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ। একমাত্র কুরআনের পুত-পবিত্র বাণী শ্রবণ করেই কত কাফির আর কত দুশমনই যে ইসলামের শান্ত শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে, সত্যিই তার ইয়ত্তা নেই।

খ) আরব কাবিলার আসআ'দ বিন যারারাহ আঁ হযরতের (ছাঃ) চাচা হযরত আব্বাসের (রাঃ) এর কাছে উপনীত হয়ে একবার স্পষ্টাক্ষরেই একথা স্বীকার করে বললেন ঃ

'আমরা অযথাই মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে দোষারোপ করছি, আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছি। আমি নিশ্চিতভাবেই বলছি যে, নিঃসন্দেহেই তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। কস্মিনকালেও তিনি মিথ্যা নন, আর তাঁর মুখনিঃসৃত এই অমিয় বাণীও তার নিজস্ব নয়। বরং স্বয়ং মহান প্রভু আল্লাহর কাছ থেকেই আগত এ ঐশী বাণী।'

গ) বনু সোলাইম গোত্রের কায়স বিন নাসিরা হুযুরে আকরাম (ছাঃ) -এর সমীপে হাযির হয়ে মন্ত্রমুগন্ধবৎ কুরআনের আয়াত শোনলেন। অতঃপর তিনি আঁ হযরত (ছাঃ) -কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আঁ হযরত (ছাঃ) সকল প্রশ্নেরই বেশ সন্তোষজনক জবাব দিলেন। ফলে অনতিবিলম্বেই তিনি মুসলমান হয়ে স্বীয় কাবিলার লোকদের গিয়ে বললেন ঃ

"ইরান ও রোমানদের কত দেশাবরেণ্য কবি আর কত সেরা সাহিত্যিক এর রচিত অমর কাব্য আমার দেখবার ও শোনবার সুযোগ ঘটেছে। ঋষি ও জ্যোতিষীদের কথাও আমার শুনতে বাকী নেই, এমনকি হোমারের সুপ্রসিদ্ধ রচনা শোনারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর মুখনিঃসৃত এই বাণীর সমতূল্য বাণী আমি আজও কোথাও শুনিনি। আমার কথা যদি তোমরা মেনে নিতে চাও তাহলে আর অযথা কালবিলম্ব নয় এক্ষুণি -এই মহূর্তেই তাঁর পদপ্রান্তে হাযির হয়ে আনুগত্য স্বীকার কর।" মক্কা বিজয়ের কালে তাঁরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁর কাবিলার প্রায় সহস্রাধিক লোক রাছুলে মকবুল (ছাঃ) -এর হাতে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

ঘ) অনুরূপভাবে হযরত ওসমান বিন মাযউন (রাঃ) কুরআন মজীদের একটি আয়াত শ্রবনমাত্রই বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে তৎক্ষনাৎ ইসলাম কবুল করেন। পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি এই ঃ

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ন্যায়-নীতি, সততা এবং সদ্ব্যবহারের আদেশ প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অসৎ কর্ম, গুনাহ ও অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। এভবেই তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন যেন তোমরা তা গ্রহণ করো।"

ঙ) পবিত্র কুরআনের অলৌকিক আকর্ষন ও অভূতপুর্ব প্রভাব সম্পর্কে আরও একটি দৃষ্টান্ত ঃ তখন নবুওতের একাদশ বছর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আউস গোত্রের নাম করা সুধী সুয়েদ বিন সামিত মদীনা নগর থেকে মক্কাধামে আগমন করলেন হজ্জব্রত উদযাপন করতে এবং তাঁর কবিত্ব প্রতিভা দ্বারা হযরতকে (ছাঃ) বিমোহিত করতে। সমাজের একজন বেশ গণ্যমান্য ও নামকরা ব্যক্তি ছাড়াও বাগ্মিতা এবং বাকপটুতায় তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, তদানীন্তন সুধী সমাজ তাকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি আঁ হযরতের (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন ঃ আমার কাছে রয়েছে অমুল্য কবিত্বপূর্ণ বাণী আর, লোকমান হাকীমের হিকমাত। এই বলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনি তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন ঃ অতি উত্তম কথা কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা এর চাইতেও উত্তম ও হিতোপদেশপূর্ণ। অতঃপর রাছুলে করীম (ছাঃ) কুরআন পাকের কয়েকটা আয়াত পড়ে শোনালেন। সুয়েদ বিন সামিত বিমুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করে বললেন ঃ 'দুনিয়া ও আখিরাতের এক অমুল্য সম্পদই বটে। বরং ইহা তো হিদায়াতের বাস্তব নুর।' অতঃপর তখন আল্লাহ ও রাছুলের (ছাঃ)-এর প্রতি তাঁর এই ঈমান আনার অভিযোগে খাজ্‌রায গোত্রের লোকেরা অতি নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে ফেললো।

চ) কুরায়েশ কওমের সর্দার অলীদ বিন মুগীরা ছিলেন অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ এবং বাকপটু। ইসলামের প্রতি তার বৈরীভাব ছিল অতি প্রকট। দুরাত্মা আবু জেহেলের সাথে মিলে তিনি মুসলমানদের উপর যে নির্মম ও নৃশংসভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন তা শুনলে এখনও গা শিউরে উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে যায়। কিন্ত পরিশেষে তিনিও ইসলামের শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে কথাই বলছি ঃ

একদা তিনি সাহাবায়ে কিরামের খেদমতে হাযির হয়ে বলেন ঃ আচ্ছা, আজ তোমরা আমাকে কুরআনের একটা আয়াত শোনাও তো দেখি। তদুত্তরে তাঁরা কুরআন পাক থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ 'এ বাণী কস্মিনকালেও মানুষ্য রচিত নয় কিংবা কোন কবিরও কাব্য নয়।'

এই অলীদ বিন মুগীরা আরও একবার হযরত আবু বকরকে (রাঃ) অনুরোধ জানিয়ে তাঁর মুখ থেকে কুরআনের আয়াত শুনেছিলেন। অতঃপর কুরাইশ কওমের কাছে গিয়ে এভাবে মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'কুরায়শগণ, তোমরা যাকে বলছো যাদুকর, আসলে তিনি যাদুকর নন। এ হচ্ছে আল্লাহর শাশ্বত কালাম।'

আরবদের প্রায় সবাই ছিলেন স্বভাব কবি। তাই অলীদ বিন মুগীরার মাঝেও এই কবিত্ব প্রতিভার স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায়। একবার কুরায়শরা তাঁকে ধন-দৌলত, বিষয়-বৈভব ও মান-সম্মানের লোভ দেখিয়ে কুরআন পাকের অনুরূপ একটা

www.pathagar.com

সূরা রচনা করতে চেষ্টা করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতে অপারগ হয়ে পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে কুরায়শদেরক এভাবে তাঁর স্বীয় অভিমত জানালেন ঃ

'হে কুরায়শগণ! ইহা কোন কবির কবিতা নয় যে, আমি এর মুকাবিলা করতে পারবো। আর ইহা কোন পাগলের প্রলাপও নয় যাকে তোমরা পাগল বলছো। তিনি কস্মিনকালেও পাগল বা উম্মাদ নন। বরং আমাকেও তোমরা পাগল বলতে পারো। আর তোমরা নিজেদের অবস্থার কথাও একটু চিন্তা করে গভীরভাবে তলিয়ে দেখো। মুহাম্মদ (ছাঃ) তোমাদের কাছে একটা মহামূল্য জিনিস নিয়ে এসেছেন।'

ছ) হযরত যামদ আযদী বিন সা'আলাবা ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। ঝাঁড় ফুক বা মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করাই ছিল তার পেশা। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উম্মাদনার কথা শুনে তিনি একদিন তাঁর এলাজ করার উদ্দেশ্যে মক্কাধামে আগমন করলেন। মুলাকাতের পর রাছুলে আকরাম (ছাঃ) তাঁর সামনে আল্লাহর প্রশংসা ও কালেমা-ই তাইয়েবা পাঠ করলেন। ইহা শুনে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেন এবং এর পুনঃআবৃত্তির জন্য বার বার সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। অতঃপর চিৎকার করে উচ্ছাসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ 'আমি বহু কবির কবিতা, যাদুকরের মন্ত্রতন্ত্র এবং কাহেনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছি, কিন্তু এমনটি কোন দিনই শুনিনি' এই বলে রাছুলুল্লাহ'র (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে তিনি তৎক্ষনাৎ ইসলামে দীক্ষা নিয়ে ফেললেন।

প্রখ্যাত মনীষী নওফাল মাসীহী আফিন্দী তার 'সান্নাযাতু ত্বরাব' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন ঃ "পৌত্তলিক আরবরা যেমন অন্যান্য বস্তুকে সিজদা করতো ঠিক তেমনি তারা 'মুআল্লাকা' বা সপ্ত ঝুলন্ত কাব্যের উৎকর্ষতা শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রায় দেড়শো বছর ধরে একে সষ্ঠাঙ্গে সিজদা করেছে। কিন্তু ইসলাম ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হবার অব্যবহিত পর পবিত্র কুরআনের অপূর্ব বাগ্মিতা ও আলংকারিক শিল্পকলার দরুন তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ধীরে শিথিল হয়ে আসে।" (নওফাল মাসীহী আফিন্দী কৃত সান্নাযাতু ত্বরাব ফী তাকাদ্দমতিল আরাব ঃ পৃষ্ঠা-৭৯।)

পূর্ব্বোল্লিখিত মুআল্লাকার ৪র্থ কবি লাবীদ বিন আবি রাবিয়াহ প্রথম জীবনে ছিলেন ইয়েমেনের একজন পৌত্তলিক বাসিন্দা। তাঁর মনীষা, কবিত্ব প্রতিভা এবং বাগ্মিতার খ্যাতি সর্বত্রই লাভ করেছিল। কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও বাক পটুতার দরুন তিনি অন্যকে একান্ত তুচ্ছ ও হেয় মনে করতেন। একদিন তিনি তাঁর একটা কাসীদা পূণ্যধাম কা'বার পবিত্র গৃহ দ্বারে মুকাবিলার জন্য ঝুলিয়ে রাখলেন। কারণ তখনকার দিনে শুধুমাত্র সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম কাসীদাকেই এভাবে মক্কা মুয়াযযমার সিংহদ্বারে ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দেয়া হতো। লাবীদের কবিতার উচ্চগুণ দর্শনে সমসায়িক কবিদের মধ্যে কারো এই সৎ সাহস হলে না যে, তাঁর মুকবিলায় দাঁড়ায়। তারপর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর কুরআনী আয়াত নাযিল হলে লাবীদের এই মিথ্যা ও অলীক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী খন্ডনকল্পে পবিত্র কুরআনের 'কাউসার' নামক ক্ষুদ্রতম সূরাটি লাবীদের কাসীদার পার্শ্বে টাংগিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া হয়। খবর শুনে মদগর্বিত লাবীদ তৎক্ষনাৎ পবিত্র কা'বার দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হন। কিন্তু উক্ত সূরার প্রথম আয়াতটি নযরে পড়তেই তিনি হঠাৎ করে থমকে উঠেন। অতঃপর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলে উঠেন ঃ 'ওহী বা প্রত্যাদেশ ছাড়া এরূপ রচনা নিঃসন্দেহে মানব সাধ্যের অতীত'। বলা বাহুল্য কবিবর তখনই ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সূরা কাউসারের প্রথম আয়াত/বাক্যাটি হচ্ছে ঃ 'ইন্না আ'ত্বয়ীনা কাল কাউসার'।

তাফসীরুল কুরআনে সূরা কাউসারের শানে নুযুল বা ঐতিহাসিক পটভূমিতে (Historical background) লেখা আছে যে, উক্ত সূরাটি নাযিল হবার পর আরবের স্বনামখ্যাত কবি ও বাগ্মীরা ইহা দেখে স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। আর দেশ বরেণ্য কবি ও সেরা সাহিত্যেকরা তাঁদের নিজ নিজ কাসীদা সমূহকে তৎক্ষণাৎ কাবার দেওয়াল থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কথিত আছে সেই কবি লাবীদই কুরআনের অনুরূপ রচনাকে মানব শক্তির সাধ্যতীত মনে করে সূরা কাউসারের প্রথম আয়াতটির নীচে নিম্নরূপ মন্তব্য লিখেছিলেন ঃ-

"লাইসা হাজা কালামুল বাশার" অর্থাৎ- "এ বাণী মানব রচিত নয়।"

লাবীদ বিন আবি রাবিয়ার ইসলাম গ্রহণের বহুপরে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একদিন তাঁকে কবিতা আবৃত্তির জন্য অনুরোধ জানান। তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ সূরাতুল বাকারা ও আল ইমরানের তিলাওয়াত করতে শিখে আমি কবিত্ব চর্চাকে একরূপ ছেড়েই দিয়েছি। (ইবনু আবদিল বির কৃত 'আল ইসতিয়াব' ঃ পৃঃ ১৬৫, এবং জামহারাতু আশ' আরিল আরাব ঃ পৃঃ ৩১।) কারণ পবিত্র কুরআনের যে সাহিত্যিক মানের অপূর্ব স্বাদ আর যে রুহানী আকর্ষণী শক্তির মোহ রয়েছে, কবিত্ব চর্চায় তার শতাংশের একাংশও নেই। (তাবাকাত ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯।) এ কারণে আমি পবিত্র কুরআনকে অদ্যোপন্ত কণ্ঠস্থ করেছি। "মাওলানা মুফতী আব্দুল লতীফ কৃত 'তারীখুল কুরআন' ঃ ১ম এডিসন, পৃষ্ঠা ৩১, মুনগীর রহমানীয়া প্রেস, ১৩৪৩ হিজরী)।

নাবিগা আহজাদী আরবের প্রখ্যাতনামা কবি ও প্রবীণ সাহিত্যিক। পবিত্র কুরআনের সুবিমল বাক্যচ্ছটায় বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও অলংকারিক শিল্পকলা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'এ হচ্ছে সমুজ্জল নক্ষত্রের ন্যায়।' (আবুল ফারাজ আল আসপাহানীকৃত কিতাবুল আগানী ঃ ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৩০)।

কাযী আইয়াযের মতে কুরআন পাকে রয়েছে এমন সব ঘটনা, খবরাখবর এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ, যা পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তকে নেই। তিনি আস-শিফা পুস্তকে এ সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত সার্থক ও সংক্ষিপ্তাকারে। (কুরআনের চিরন্তন মু'জিজা পৃঃ ১৭৫-১৮৩- ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)।

www.pathagar.com

যেসব কারণে আল-কোরআন মনুষ্য সৃষ্ট কোন গ্রন্থ বা কিতাব হওয়া সম্ভবপর নহে, তার আরো কতিপয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল, যদিও এসব বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বেই কিছু আলোকপাত করা হয়েছে।

ক) আল-কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাব সম্পর্কে খোদ কোরআনই ঘোষণা দিয়েছে যথা- আল্লাহ্ বলেন, **"আমি যদি এ কোরআনকে পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তা হলে হে মুহাম্মদ, তুমি দেখতে পেতে উহা (সেই পর্ব্বত) আল্লাহ্'র ভয়ে ভীত হয়ে ধ্বংস ও দীর্ন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।। আর আমি এই ধরনের উপমাগুলি স্পষ্ট প্রকাশ করে থাকি মানুষেরা যেন যথার্থ মংগল ও কল্যাণার্থে চিন্তা ভাবনা করে।"** (সূরা হাশর আয়াত-২৯)।

খ) **"আল্লাহপাক নাজিল করেছেন এই উৎকৃষ্টতম বাণী অর্থাৎ কোরআন মজিদ, যার আয়াতগুলি সাদৃশ্যাত্মক ও পরস্পর সুসামঞ্জস্য পূর্ণ। যার উপদেশাবলী পুনঃ পুনঃ বর্ণিত। যারা আপন প্রভু পরওয়াদিগার সম্পর্কে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত তাদের দেহ এই কোরআনের কল্যাণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, অতঃপর বিনম্র ও সুকোমল হয়ে উঠে তাদের দেহমন আল্লাহ্'র স্মরণ ও ভজনের দিকে, এটাই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়েত। তিনি যাকে চান এর দ্বারা সৎপথ প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ যাকে হেদায়েত না দেন তার জন্য কোন হেদায়তকারী নেই।"** (সূরা যুমার-আয়াত-২৩)।

গ) মানুষের মনে প্রাণে দেহে কোরআনের প্রভাবের একটি চাঞ্চল্যকর বাস্তব নমূনা ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ মদীনায় হিযরতের পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনাবাসী আনসার ও মক্কা থেকে আগত মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এভাবে মোহাজের সাঈদ বিন-আবদুর রহমান ও সা'লাবাতুল আনসারীর সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয়। শয়তানের ধোকায় পরে একদিন সা'লাবাতুল আনসারী তার মোহাজের ভাই সাঈদ কোন এক জেহাদে চলে গেলে মুজাহেদ ভাইয়ের স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করার মত একটি বে-ফায়েশ কাজ করে ফেলেন। সাঈদের স্ত্রী বলেন- "তোমার ভাই জ্বেহাদে গেছে, আর তুমি তাঁর আমানত খেয়ানত করতে চাচ্ছ?" এতটুকু কথাই সা'লাবার অন্তরে এক তুফান বয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে পাহাড়ের দিকে পলায়ণ করেন এবং আল্লাহ'র দরবারে চিৎকার করে ক্ষমা চাইতে চাইতে আসমান জমিন তোলপার করতে লাগলেন। সাঈদ (রাঃ) জ্বেহাদ থেকে ফিরে সব কথা জানতে পেরে সা'লাবাকে সন্ধান করে পেয়ে তাকে চলে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। সা'লাবা বললেন, আমি এভাবে যাব না যতক্ষণ না আমার হাত আমার ঘারের সাথে না বেঁধে সেই রশি ধরে অপমানিত গোলামের মত টেনে টেনে না নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তা-ই করা হল। এমনকি সা'লাবার কন্যা খানসামাও পিতাকে রশি দিয়ে টেনেছিল। প্রথমে তাঁকে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ) - এর নিকট নিয়ে গেলে তাঁরা তাঁর জন্য ক্ষমা/তওবা/বা কোন সান্ত্বনার ব্যবস্থা করতে

www.pathagar.com

পারলেন না। শেষে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকট গেলে তিনিও কোন ব্যবস্থার কথা অস্বীকার করলেন। নিরাশ হয়ে সালাবা পূণরায় পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন/ছুটে গেলেন। সেখানে আল্লাহ'র ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকেন। এরপর একদিন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করেছি। আর এই সু-সংবাদ তাঁকে পৌছিয়ে দিন। তখন সালাবাকে আনার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নির্দেশে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) পাহাড়ের দিকে গেলেন। তাঁকে খুঁজে বের করে সু-সংবাদ শুনিয়ে নিয়ে আসেন। তখন রাত্র প্রায় শেষ এবং ফজরের নামাজ শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা শেষ কাতারে শরীক হয়েছেন। প্রিয় নবী (ছাঃ) নামাজে সূরা 'তাকাসুর' পাঠ করতেছিলেন। প্রিয় নবীজীর কণ্ঠে সূরা তাকাসুরের– 'আল হা-কু মু ত্তাকাছুর' এইটুকু শুনেই সা'লাবা চীৎকার করে উঠেন। আর যখন প্রিয় নবী (ছাঃ) পাঠ করলেন– 'হাত্ত্বা জুরুতুমু-লমাকাবের' তখন সা'লাবা আরও একটি চীৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করেন। আল-কোরআনের মাধুর্য তো এরূপ প্রভাবও সৃষ্টি করতে সক্ষম - (মৌঃ আমিনুল ইসলাম প্রণীত পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন)।

ঘ) মনুষ্য রচিত কোন কাব্য, সাহিত্য উপন্যাস, নাটক বা যে কোন প্রকারের পুস্তক/পুস্তিকা কয়েকবার পঠিত হলেই, উহা যত উন্নতমানেরই হউক না কেন, তা পড়ার আর কোন মাধুর্য্য বা আকর্ষন থাকে না। উহা বারবার পাঠে মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল কোরআনের ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। উহা যতবারই পড়া বা আবৃত্তি করা হউক না কেন ততবরাই এর আওয়াজ মনোমুগ্ধকর, সুর লহরী মধুর থেকে মধুরতর হতে থাকে এবং প্রতিবারই আকর্ষন ও মাধুর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু তাই নহে যতবারই উহা আবৃত্তি করা হউক না কেন প্রত্যেকবারই উহা তেলাওয়াতকারী/পাঠকের নিকট নতুন বলে মনে হবে। আর ইহা বাস্তব ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহা আল-কোরআনের একটি একক চাঞ্চল্যকর বৈশিষ্ট যা মানব সৃষ্ট কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ঙ) কোরআনকে সহজ করে দেয় হয়েছে বলে ঘোষিত। "অনন্তর ইহা (কুরআন) তোমার ভাষায় এই জন্য সহজ করে দিয়েছি যেন (অনায়াসে) তারা হৃদয়ংগম করতে পারে।" সূরা দুখান-আয়াত- ৫৮)। ফলে অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরাও অনায়াসেই কোরআনের মত একটি বিরাট গ্রন্থ মুখস্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী/কাফের মুনাফেকদের পক্ষে উহা মুখস্ত বা হেফ্জ্ করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে সম্পূর্ণ অলৌকিক, বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকর ভাবে এবং সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায় কোরআন মুখস্ত করিয়ে দেয়া হয়েছিল। (এই প্রসংগে একটি ভিন্ন প্রবন্ধ অত্র পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে।) বিশ্বব্যাপী মনুষ্য রচিত কোনপুস্তক/গ্রন্থ কি এরূপ সম্পূর্ন অলৌকিকভাবে বিনা প্রচেষ্টায় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষনসহ মুখস্ত করিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করা যায়?

www.pathagar.com

অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার বাস্তব সমাধানের পথ এভাবেই রচিত হয়েছে। মনুষ্য রচিত অন্য গ্রন্থ কিতাবের ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা, পটভূমি বা শানে নজুল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ট) কোরআনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা চিরস্থায়ীরূপে সংরক্ষণের ভার উহার নাজিলকারক স্রষ্টা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন **"এই ঝিকর (কোরআন) আমিই নাজিল করেছি এবং আমিই উহার সুনিশ্চিত সংরক্ষক" (সূরা হিজর, আয়াত- ৯)।**

ইহা ছাড়া এ মহা ঐশী গ্রন্থটি 'লৌহ মাহফুজে' সংরক্ষিত রয়েছে বলেও বহুবার ঘোষিত হয়েছে যেমন- আল্লাহ বলেন ঃ **"বরং ইহা সম্মানিত কোরআন যা 'লওহে মাহফুজে' সংরক্ষিত রয়েছে"** (সূরা বুরুজ, আয়াত- ২১-২২)। চিরস্থায়ী সংরক্ষণের এরূপ কঠোর নিশ্চয়তা প্রাপ্ত যা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয়ে রয়েছে এবং চিরকালই অনিবার্যভাবে সংরক্ষিত থাকতে বাধ্য। মনুষ্য রচিত এরূপ গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব আছে কি? আল-কোরআন ছাড়া মনুষ্য রচিত যে কোন পুস্তকের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী সংরক্ষণের এরূপ নিশ্চয়তার গ্যারান্টি সম্পূর্নভাবে অনুপস্থিত।

আল-কোরআনে আল্লাহতায়ালা খোদ কোরআনকেই বলেছেন **"মহা বিজ্ঞানময় কোরআন" (সূরা ইয়াছিন আয়াত-২)**। বলা বাহুল্য, কোরআনে যেমনি রয়েছে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য, তেমনি রয়েছে বিজ্ঞান ভিত্তিক সংখ্যাতত্ব বা গাণিতিক তথ্য। আল্লাহ বলেন **"আমার আয়াত গুলিকে তারা (সম্পূর্ন মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করত। আর অবস্থা এই যে আমি প্রত্যেকটি বিষয়েই গুণে গুণে লিখে রেখেছি" (সুরা নাবা-আয়াত ২৮-২৯)।**

"এবং তিনি তাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন এবং এক একটি জিনিষকে তিনি গুণে গুণে রেখেছেন" (সূরা আল-জ্বিন, আয়াত-২৮)। তাফসীর ঃ

"আর যে সব পয়গাম আল্লাহায়ালা পাঠিয়ে থাকেন উহার প্রতিটি অক্ষরও গুণে রাখ হয়। উহাতে একটি অক্ষর কমবেশী করার শক্তি বা ক্ষমতা রাছুল বা ফেরেশতার কারও নেই" (তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন)। আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন স্বরূপ কোরআনের প্রত্যেকটি শব্দ ও অক্ষর পর্যন্ত সুষ্ঠভাবে গুণে গুণে রাখার ফলে উহাতে ভুলত্রুটি সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব। ইহা ছাড়া কোরআনের বহু জায়গায় ঘোষিত হয়েছে যে কোরআন "লৌহ মাহ্ফুজে" সংরক্ষিত রয়েছে (সূরা বুরুজ আয়াত-২১-২২) যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে বিষয় এবং বস্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে সংরক্ষিত এবং গুণে বেছে রাখা হয় তাতে বিজ্ঞান সম্মত কারণেই ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। ঐশী গ্রন্থ তো দূরের কথা সম্পূর্ন ত্রুটিমুক্ত এবং গুণে বেছে সংরক্ষিত অর্থাৎ পুর্বোল্লিখিত সর্বগুণে গুণান্বিত কোন মহাগ্রন্থ রচনা করা সাধারণ মানবীয় কারণেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

চ) কোরআনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা পাঠকের মনের কথা বলে। যে উহা নির্ভেজাল বিশ্বাস ও গভীর মনোযোগের সাথে তফসীর, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ পাঠ করে, তখন পাঠকের অবশ্যই মনে হবে যে, কোরআন যেন স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তার একান্ত নিজস্ব সমস্যা ও সমাধানের কথাই বলছে।

ছ) কোরআনের আরো একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, উহা মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক তথা শারীরিক মানসিক সর্বরোগের নিরাময়কারী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন **"তিনি মু'মিনদের অন্তর সমূহে কোরআন দ্বারা আরোগ্য (শেফা/নিরাময়) দান করেন।" (সূরা তওবা আয়াত- ১৪ অংশ) "এবং তাদের অন্তর সমূহে যা কিছু (রোগ) হয় আল্লাহ'র উপদেশাবলী (কোরআন) তার জন্য শেফা বা আরোগ্য প্রদায়ক।" (সূরা ইউনুস আয়াত- ৫৭)।**

জ) **"এবং আমি কোরআনে এমন সব জিনিষ নাজিল করি যা মু'মিনদের জন্য শেফা (নিরাময়) স্বরূপ।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত- ৮২)।** উল্লেখ্য যে, কোরআন নাজিলের পর থেকে বিগত প্রায় ১৫০০ শত বৎসর যাবৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-সহ শত সহস্র সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, বুজর্গানে দ্বীন, দরবেশ, অলিআল্লাহ, পীর, ফকির, গাউস কুতুবগণ কোরআনের এই অকল্পনীয় বিস্ময়কর শেফা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কত মানুষের অন্তর/বাহিরের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর এ ব্যবস্থা চিরকালই চলতে থাকবে। মানুষের অন্তর বাহিরের রোগ নিরাময় স্বরূপ কোন গ্রন্থ রচনা করা কোন কালে কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব হবে কি?

ঝ) বিশ্বব্যাপী গ্রন্থকারেরা কোন বই/পুস্তক/গ্রন্থ লিখলে, লিখক স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে ঐ গ্রন্থের গ্রন্থকার বলে মালিকানা দাবী করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থকার তার রচিত গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু আল-কোরআনের বেলায় ইহা মোটেই প্রযোজ্য নয়। নিরক্ষর নবী (ছাঃ) নিজেকে এই মহাগ্রন্থের প্রণয়নকারী/রচয়িতা বা মালিকানা দাবী বা উহার স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষনের কোন দাবীদার নন। তিনি নিজে যেখানে মালিকানা বা সর্বস্বত্ব দাবী করেন না সেখানে জড়বাদী, বস্তুবাদী, নাস্তিক, কাফের/মুশরিকরা তাঁকে জোর করেই মালিকানা দিতে চাওয়া যেমন হাস্যকর তেমনি বোকামী এবং লজ্জাকরও বটে।

ঞ) আল-কোরআনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর শানে নজুল বা সূরা/আয়াত নাজিলের/অবতণের কারণ বা পটভুমি রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ কোরআনের সূরা/আয়াত/বাক্য নাজিল বা অবতারিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন বা বিষয়ের সমাধানের জন্য আল্লাহ'র নির্দেশ লাভের জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দিনের পর দিন

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানীরাও কোরআনের বিজ্ঞানময়তার কথা মুক্ত কণ্ঠে ও সর্বান্তকরনে স্বীকার করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী 'মরিস বোকাইলি' কোরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক "বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান" নামক একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন, যাতে তিনি প্রমান করে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানেরও বিস্ময় এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থটি প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বের কোন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা একেবারেই অসম্ভব। কোরআনে বর্নিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এই ফরাসী বিজ্ঞানী স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহন করেছেন বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখিত ফরাসী বিজ্ঞানীর বিখ্যাত পুস্তক বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে আমাদের দেশের প্রখ্যাত লিখক, কলামিষ্ট জনাব আখতারুল আলমের একটি ভাষ্য পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে হুবহু তুলে ধরা হল। এ লেখাটি দৈনিক ইত্তেফাকে ৭-৮-৮৬ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

"ওয়াশিংটন থেকে গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৬ ইং তারিখে চীনা বার্তা সংস্থা সিনহুয়া সংবাদ দিয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের জ্যোতিবিজ্ঞানীরা ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জে পাঁচশ' আলোকবর্ষ দূরে একটি নক্ষত্রের জন্মকালীন অবস্থা পর্যবেক্ষন করেছেন। বিশ্বে মানুষ এই প্রথম এ ধরনের মহাজাগতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল বলেও উক্ত বার্তা সংস্থা মন্তব্য করেছে। প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা অংগরাজ্যে অবস্থিত একটি মানমন্দিরে ১২ মিটার রেডিও দুরবীন ব্যবহার করে দুজন জ্যোতিবিজ্ঞানী একটি বিকাশমান নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। খবরটি প্রথম প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের 'সায়েন্স নিউজ' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তাতে বলা হয়, বিজ্ঞানীদ্বয় প্রথম ছায়াপথের মেঘপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত রেডিও তরংগ লক্ষ্য করেন। মেঘের অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছুরিত ওই রেডিও তরংগ নির্দেশ করে যে, ওই মেঘপুঞ্জ থেকে একটি তারকার জন্ম হচ্ছে। কি প্রক্রিয়ায় নাক্ষত্রিক মেঘপুঞ্জ জন্ম হয়, তা অবশ্য বিজ্ঞানীরা জানেন না। তবে এটা তাঁদের জানা আছে যে, নক্ষত্রটির জন্মের প্রক্রিয়া শেষ হতে এক লাখ বছর লেগে যাবে। প্রকাশ, এ নক্ষত্রের ভ্রুণটি আমাদের সূর্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভরের সমান। আমাদের সৌর মন্ডলের দশগুন জায়গা জুড়ে বিস্তৃত গ্যাস ও ধূলির মেঘের কেন্দ্রে অবস্থিত এ ভ্রুণ নক্ষত্রটি অতঃপর আশেপাশের এলাকা থেকে বস্তুকণা সংগ্রহ করতে শুরু করবে, এভাবেই আপনদেহে বস্তকণা টেনে নিয়ে আবর্তিত হতে হতে পুষ্ট হয়ে উঠবে এ শিশু নক্ষত্রটি। মার্কিন বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ ধরনের বৃহদায়তন উত্তপ্ত শিশু নক্ষত্র পরে ঠান্ডা ও ঘণীভূত হতে শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়ার সময় লাগে আরো ১০ থেকে ২০ লাখ বছর। এই ঘণীভূত অবস্থায় শেষ পর্যায়ে ঘটে পারমানবিক বিক্রিয়া এবং এ পারমানবিক বিক্রিয়াই নক্ষত্রের তাপ ও আলোকের মূল উৎস। এভাবেই একটি ভ্রুণ নক্ষত্র পরিপূর্ন নক্ষত্রে পরিনত হয় এবং আরো হাজার কোটি বছর পর্যন্ত এই নক্ষত্র জীবিত থাকে।

"আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, ছাত্র অবস্থায় কবে বিজ্ঞান পড়েছিলাম, ভুলে গেছি। তবে পরবর্তীকালে আল্লামা ইউসুফ আলীর কোরআনের ইংরেজী তরজমা ও তফসির

www.pathagar.com

পড়তে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, আজকের আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সর্বশেষ পর্যবেক্ষন ও আবিষ্কার বলে যা কিছু প্রচারিত ও প্রমানিত হচ্ছে, চৌদ্দশত বছর আগেরকার কোরআনে তার বহু ইংগিত উল্লেখ, এমনকি ব্যাখ্যা পর্যন্ত রয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে শুধু অদ্ভুত নয়, একান্ত কৌতুহলোদ্দীপক বলেও মনে হতে থাকে। যেহেতু আরবী শুধু পড়তে পারি, তাও কোরআনের আরবী, যাতে জের জবর পেশ ইত্যাদি রয়েছে, সুতরাং মনের খটকা দূর করতে বেশ বেগ পেতে হয়। এদিকে 'আল্লাহ মহাবিজ্ঞানী' এবং 'কোরআন বিজ্ঞানময়' গ্রন্থ এই বিশ্বাস সম্বল করে ইতস্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ক নানা পুস্তক-পত্রিকা হাতড়াতে থাকি। এরপর ফরাসী বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলির 'দি বাইবেল দি কোরআন এন্ড সায়েন্স' পুস্তকখানী হাতে আসে। ডঃ মরিস বুকাইলির সাথে যোগযোগ হয়। বইটি শেষ পর্যন্ত তরজমা করে ফেলি। আগে যেমন কোন কোন সময় মনে হত, কোরআনের তরজমাকারী ও তফসির লেখকগণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার পর্যবেক্ষনের সাথে কোরআনের মিল-মিছিল দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' তরজমা করতে গিয়ে সে ভুল ভেংগে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসলে পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের যে সব বিষয় রয়েছে কেবল আধুনিক যুগে এসে আধুনিক বিজ্ঞানের নবনব উদ্ভাবনী, আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষনের ফলেই সেসবের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হতে পারছে।

"ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই। সূরা ফাতেহার আয়াতে রয়েছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি বহু বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু"। তরজমা ও তফসীরকারবৃন্দ প্রধানতঃ 'রব' বা 'প্রতিপালক প্রভু' শব্দটির উপরে বেশী জোর দিয়েছেন। আধুনিক যুগে এসে কেউ কেউ যদিও বলছেন, 'আলামিন' শব্দটা 'আলেম' শব্দের বহুবচন, কিন্তু তরজমার বিষয়ে তাঁরা 'রাব্বুল আলামিনের' অর্থ করেছেন "সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক"। এভাবে এই 'আলামিন' শব্দের মধ্যেই কোরআনে 'বহু বিশ্বের' যে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে মুসলমান সমাজ ক্রমান্বয়ে সরে এসেছে। এই সরে আসাটা শুধু 'ধারণা' থেকে নয়- জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য থেকেও। অবশ্য আল্লামা ইউসুফ আলী, মুফতি মোহাম্মদ শফি প্রমুখ মনীষী প্রাচীন তফসিরকারকদের বক্তব্য টেনে বলেছেন ঃ এই সৌর জগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে (ইমাম রাজী)। মুফতি মোহাম্মদ শফি হজরত আবু সাঈদ খুদরির (রাঃ) এক হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ঃ "চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে, আর এ পৃথিবী পূর্ব হতে পশ্চিম ও উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকীগুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ।" হজরত মাকতিল (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, "জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার"। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশূন্য ভ্রমনকারীগন যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাজীর বর্ণনার চেয়ে অধিক নয়। (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)।

"আসলে, ডঃ মরিস বুকাইলি কোরআন ও বিজ্ঞান, সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন, খুব সম্ভব অতীতের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ তফসিরকারকদের দ্বারা তা আলোচিত হয়ে থাকবে। আমরা হয়ত সে সব খুব কমই জানি। তবে, বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

উন্নতির সাথে সাথে কোরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাণী সমূহ যে অনেকাংশ সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সে কথাটা ডঃ মসির বুকাইলির মত বহু বিজ্ঞানীই এখন স্বীকার করতে শুরু করেছেন। যেমন, উপরে উল্লেখিত নতুন নক্ষত্রের জন্ম সংক্রান্ত সংবাদের এক জায়গার বলা হয়েছে ঃ 'ছায়াপথ মেঘপুঞ্জ' থেকে ওই নক্ষত্রটির উদ্ভব ঘটেছে। কোরআনের ৪১ নং সূরার ১১ নং আয়াতে - নক্ষত্র সৃষ্টির আদি যে এই মেঘপুঞ্জ বা গ্যাসীয় পিন্ড - সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। ওই সূরায় যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অতীতে তার তরজমা করা হয়েছে 'ধুম্রকুন্ডলী'। অতীতে যখন গ্যাস আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন এছাড়া এ শব্দের অন্য অনুবাদ সম্ভবও ছিল না। আরবী 'দুখান' শব্দ হচ্ছে আসলে স্তর বিশিষ্ট এমন এক গ্যাস জাতীয় পদার্থ যা স্থিরভাবে ঝুলানো এবং যার মধ্যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনুকনা উচ্চতর কিংবা নিম্নতর তাপের দরুন কখনো কঠিন এমন কি কখনো তরল অবস্থায় বিদ্যমান। (ডঃ মরিস বুকাইলী)।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, ছায়াপথের বিরাটত্বের তুলনায় আমাদের সৌরজগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া এই ছায়াপথে যেসব নক্ষত্রের অবস্থান, সে সবের পরিমন্ডল খুবই বৃহৎ। এত বৃহৎ যে, যেখানে আলো তার সুতীব্র চলার গতিতে এক একটা সৌরজগত এক ঘন্টা সময়ে অতিক্রম করতে সক্ষম, সেখানে এই দৃশ্যমান ছায়াপথের পুঞ্জীভূত নক্ষত্ররাজির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছুতে সেই আলোর সময় লাগে প্রায় ৯০,০০০ বছর।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের আরো জানাচ্ছে, সৃষ্টির আদিতে রয়েছে নীহারিকা বা নেবুল যা মূলত ঃ গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ। চৌদ্দমত বছর আগের কোরআনেও বলা হয়েছে, বিশ্ব সৃষ্টির আদি পর্যায়ে রয়েছে 'দুখান' বা গ্যাসীয় পদার্থপুঞ্জ। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, বিশ্ব সৃষ্টির আদি পর্যায়ে নক্ষত্র ও গ্রহাদি ছিল একটি একক পিন্ড, পরস্পর সংলগ্ন বা অভিন্ন। কোরআনের আয়াতেও দেখা যাচ্ছে ঃ "অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমরা উহাদের পৃথক করে দিয়েছি ?" (কুরআন- ২০/৩০)। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমান করেছে মহাশুন্যে কোন বস্তুই স্থির নয়, প্রত্যেক বস্তুরই রয়েছে নিজস্ব গতিবেগ এবং মহাশুন্যের প্রতিটি বস্তুই সঞ্চরশীল। উপস্থিত ক্ষেত্রে মহাশুন্যের দৃশ্যমান দুটি বিশেষ বস্তু চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে কোরআনে যে বক্তব্য রয়েছে, প্রমানের জন্য তা তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

"(আল্লাহ হচ্ছেন) তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি, দিবস, চন্দ্র এবং সূর্য। ইহাদের প্রত্যেকেই পরিভ্রমনে নিয়ত রয়েছে নিজ নিজ কক্ষ পথে, নিজস্ব গতিবেগ সহকারে" (কুরআন- ২১/৩৩)। "সূর্য কখনই ধরতে পারিবেনা চন্দ্রকে কিংবা রাত্রি অতিক্রম করিতে পরিবে না দিবসকে। প্রত্যেকেই পরিভ্রমনে নিয়ত- নিজ নিজ কক্ষপথে নিজস্ব গতিবেগ সহকারে" (কুরআন- ৩৬/৪০)। অতীতে কোরআনের তরজমা ও তফসিরকারগণ প্রায় সবাই চন্দ্র সূর্যসহ মহাশূন্যের বস্তুনিচয়ের এই গতিবেগকে 'সাঁতার কাটা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডঃ মরিস বুকাইলি দেখিয়েছেন, এ প্রসংগে কোরআনে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে 'ঘূর্ণন'।

www.pathagar.com

কোরআন যখন অবতীর্ন হচ্ছিল, তখন ধারনা করা হত যে, সূর্যই ঘুরছে, আর পৃথিবী স্থির রয়েছে। ভূকেন্দ্রিক মতবাদ ভিত্তিক এই পদ্ধতির ধারনা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে টলেমীর আমলে চালু হয় এবং সে মতবাদ জারি থেকে ১৬শ খৃষ্ট শতাব্দীর কোপারনিকাসের আমল পর্যন্ত। হজরত মুহাম্মদের (দঃ) আমলেও (৭ম খৃঃ শতাব্দী) মানুষ সেই ধারনাই পোষন করত। কিন্তু এই আয়াতে কিংবা কোরআনের অন্যত্র কোথাও সেকালে প্রচলিত সেই ধারনা ব্যক্ত হয় নাই। বরং ব্যক্ত হয়েছে এমন তথ্য যা কয়েক শতাব্দী পরে সত্য বলেই প্রমানিত হয়েছে। ডঃ মরিস বুকাইলির অভিমত, কোরআন যে মুহাম্মদ (দঃ) বা তাঁর যুগের কোন মানুষের রচনা নয়, এটা তার বড় প্রমান।

উপরোউল্লেখিত নতুন নক্ষত্রের জন্মের সংবাদটিতে বলা হয়েছে ঃ "এই অবস্থায় এসে এটি পরিপূর্ন নক্ষত্রে পরিনত হয় এবং আরো এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত ওই নক্ষত্র জীবিত থাকে।" এ কথার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, প্রতিটি নক্ষত্রই একটা নির্দিস্ট সময় পর্যন্ত আবর্তিত হয়ে হয়ে এগিয়ে চলে, এবং একটা নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে তার অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসে। সূর্যও একটি নক্ষত্র। সুতরাং অন্যান্য নক্ষত্রের মতই তারও একই পরিনতি অবধারিত। এ সম্পর্কে কোরআনের ৩৬ নং সূরার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "সূর্য তার নির্ধারিত স্থলের (অবধারিত স্থান- আররী, মুসতাকার) উদ্দেশ্যে পথ-পরিক্রমায় নিয়ত। ইহা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তারই নির্ধারিত ব্যবস্থা"।

সুতরাং কোরআনের এই আয়াতের মর্মে এটা পরিষ্কার যে, গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পর সূর্যের এ পথ-পরিভ্রমন তথা গতিআবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং অন্য এক আয়াতের সূত্রে প্রকাশ, চন্দ্রের পরিক্রমনেরও একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে- একটা নির্দিষ্ট স্থলে পৌছানোর পর। উপরে নক্ষত্রের জন্ম সংবাদে 'জীবিত' থাকার মধ্যেই যে সে নক্ষত্রের মৃত্যুর সংবাদ লুকানো রয়েছে- সেটাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নক্ষত্রের এই মৃত্যু বা 'লাশে' পরিনত হবার ব্যাপাটা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'হোয়াইট ডেয়ার্ক' বা 'সাদা বামন' নামে পরিচিত। অন্য কথায়, সূর্য যেমন অন্যান্য নক্ষত্রও তেমনি, অথবা অন্যান্য নক্ষত্র যেমন সূর্যও একদিন অন্তিম দশায় পৌছে যাবে। আমাদের সৌরমন্ডলের নক্ষত্র সূর্যের এই নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে যাত্রার যে কথা ১৪শত বছর আগে কোরআন বলছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। সূর্যের সেই গন্তব্যস্থলটি আধুনিক বিজ্ঞান নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতেও সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানীরা কোরআনে কথিত সূর্যের সেই গন্তব্যস্থলের নামকরন পর্যন্ত করেছেন। নামটি হচ্ছে ঃ "সোলার এপেক্স"।

বস্তুত ঃ আধুনিক বিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে যে, গোটা সৌরমন্ডল ঠিক সেভাবেই (যেভাবে কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে) মহাশুন্যে অবস্থিত "কনস্টেলেশন অব হারকিউলাস' বা 'আলফা লাইরি' নামক একটি কেন্দ্রের দিকে

www.pathagar.com

এগিয়ে চলেছে। আর সে কেন্দ্রটির অবস্থান মহাশূন্যের ঠিক কোনখানে-আধুনিক বিজ্ঞান তাও সঠিকভাবে নির্নয় করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে গোটা সৌরমন্ডলের এগিয়ে চলার গতিও আধুনিক বিজ্ঞান নির্ধারন করে ফেলেছে, আর সেই গতিটা হচ্ছে মোটামুটিভাবে সেকেন্ডে ১২ মাইল। **আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি পন্ডিত অধ্যাপক যারা অহরহ বলে বেড়ান যে, কোরআন ও কোরআনের শিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপন্থী কিংবা বিরোধী, তাঁরা কি কোরআনের এই ধরনের বক্তব্যের সমর্থনে আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব প্রমান বা আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষন সম্পর্কে কিছুমাত্র ওয়াকিফহাল? আমাদের তরুন সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষন করছি।**

নতুন নক্ষত্রের জন্ম সম্পর্কে উপরে যে নিউজ উদ্ধৃত্ত করেছি, তা নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের সম্প্রসারন প্রক্রিয়ার ইংগিত। অর্থাৎ মহাবিশ্বের নক্ষত্র ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ মহাবিশ্বের বিস্তৃতির প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত। মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন বিদিত আপেক্ষিক থিওরিতে প্রথম উল্লেখ করেন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। পরবর্তীকালে যেসব বিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোকরিশ্মর বর্নালিবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষনায় নিয়ত, তারাও এই সম্প্রসারণের বিষয়টা সমর্থন করেন। প্রথমে তাদের নিকট এটা ছিল ছায়াপথের সম্প্রসারণ মাত্র। কিন্তু নতুন নক্ষত্রের জন্ম, নতুন বিশ্ব বা জগত সংগঠনের বর্তমান এই সংবাদটি প্রমান করছে ছায়াপথ-মহাকাশ, মহাবিশ্ব সত্যিসত্যি সম্প্রসারিত হচ্ছে, বর্ধিত হচ্ছে। ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' পুস্তকে দেখিয়েছেন, কোরআনের একটি আয়াতে যে বক্তব্য রয়েছে (সূরা ৫১ আয়াত ৪৭) তাতে আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারনের কথাই বলা হয়েছে। ওই আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন ঃ "আকাশ মন্ডলী, আমরা উহাকে সৃষ্টি করেছি কুদরতের বলে। নিশ্চয়ই আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করছি।"

এখানে যাকে 'আকাশমন্ডলী' বলা হয়েছে, তা আরবী 'সামাআ' শব্দের অনুবাদ। এর দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবেই পৃথিবীর বাইরে মহাশুন্য জগতের কথাই বুঝানো হয়েছে। 'আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করছি' -এই বাক্যটি হচ্ছে বর্তমান কালবাচক ও বহুবচনসূচক আরবী পদ 'মুসিউনার' -এর অনুবাদ। এর মূল ক্রিয়াবাচক শব্দটি হচ্ছে 'আউসাআ'। এর অর্থ, সম্প্রসারিত করা, আরো বেশী প্রশস্ত করা, বৃদ্ধি করা এবং বিস্তৃত করা। অতীতের বেশির ভাগ অনুবাদক যেমন তেমনি কোন কোন আধুনিক অনুবাদকও শব্দটির মর্ম যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পেরে অন্য রকম অর্থ করেছেন। এমনকি অধ্যাপক হামিদুল্লাহ তাঁর সুবিখ্যাত ফরাসী অনুবাদে 'আকাশ মন্ডল ও মহাবিশ্বের বিস্তৃতি দানের' কথা বলেও শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। আসলে, আকাশমন্ডলের সম্প্রসারণ, বর্ধিতকরন, নতুন কোন নক্ষত্রের জন্ম ইত্যকার বিষয় সেকালে যেমন, একালেও তেমনি অনেকের নিকট ধারনাতীত ব্যাপার। বিশ্বের মানুষ যে এই প্রথম নতুন একটি নক্ষত্রের জন্ম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে সে কথাটা উপরের সংবাদটিতেই স্বীকার করা হয়েছে। তবে, ডঃ মরিস বুকাইলি জানিয়েছেন যে,

www.pathagar.com

কায়রো 'সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স' সম্পাদিত 'মুন্তাকাব' নামক তফসীরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপরোক্ত 'মসিউনার' অর্থ করা হয়েছে ঃ "মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ"।

ডঃ মরিস বুকাইলি যেমন, তেমনি আজ যে কারো পক্ষেই আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও সুপ্রমানিত তথ্যের সাথে কোরআনের বর্ণিত এইসব বাণী ও বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষন করতে গিয়ে হতবাক না হয়ে উপায় থাকছে না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাঁকে ভাবতেই হচ্ছে ঃ চৌদ্দশত বছর আগে জীবিত কোন মানুষের চিন্তা ভাবনায় কিভাবে এ ধরনের আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক সত্য তথ্য ধরা পড়েছিল। বস্তুতঃ চৌদ্দশত বছর ধরে গোটা মুসলিম বিশ্ব যা বিশ্বাস করে এসেছে, এবং আধুনিক যুগে এসে ডঃ মরিস বুকাইলির মত বিজ্ঞানী গবেষকবৃন্দ যা বলেছেন, সেই বিশ্বাস ও বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেই বলতে হয়ঃ "কোরআনের কোন মানবীয় ব্যাখ্যা সম্ভব নয় অর্থাৎ কোরআন কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। অন্য কথায় কোরআন সত্য সত্যই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ'র নিকট থেকে শেষ নবীর (দঃ) উপরে নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব" (স্থান-কাল-পাত্র-লুব্দক-সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক- ২১শে শ্রাবন, ১৩৯২ বাংলা, ৭ই আগষ্ট- ১৯৮৬ ইং)।

বিংশ শতাব্দির এই শেষ প্রান্তে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আজ কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করে তুলেছে। মানুষ কত অচিন্তনীয়/অকল্পনীয় বস্তুই না আবিষ্কার করেছে। আধুনিক জগতের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হল "কম্পিউটার" এবং এই কম্পিউটার নির্ভুলভাবে তথ্য সরবরাহ করে থাকে বলেই স্বীকৃত।

উল্লেখ্য যে, কোরআন কোন মানুষের দ্বারা রচনা করা সম্ভব কিনা আধুনিক বিশ্বের বিস্ময় 'কম্পিউটার' থেকে এই তথ্য জানার এক প্রচেষ্টায় কম্পিউটার এরূপ তথ্য সরবরাহ করেছে যে, ইহা কোন মানুষের দ্বারা রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। কম্পিউটারে ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করার কথা নয়। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে কম্পিউটারে প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্যটি দুই দুইবার বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচার করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রচার করা হয়েছে ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাংলা সাল, ৪ঠা মার্চ, ১৯৯৩ ইং তথা ৯ই রমজান ১৪১৩ হিজরী। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোন দেশের প্রধান প্রচার মিডিয়া থেকে কোন তথ্য পরিবেশন/প্রচার করার কথা নয়। আমি (লিখক) নিজে উহা বিটিভিতে প্রচার করতে শুনেছি। বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের উন্নতি ও অবদানকে ধন্যবাদ এই জন্য যে, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই প্রমান করে ছাড়লো যে, কোরআন কোন মানুষের সৃষ্ট কোন গ্রন্থ নয় এবং হতেও পারে না।

কম্পিউটারে কোরআন ঃ চাঞ্চল্যকর তথ্য ঃ কোরআন নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত উহার তরজমা/তফসীরকারকগণ যুগে যুগে উহার তফসীর, ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ করে এসেছেন। বর্তমানেও উহা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। "কোরআন কোন মানব, দানব জ্বিন পরী বা অন্য কারও পক্ষেই

www.pathagar.com

রচনা করা সম্ভব নয়।" কোরআনের এই ঘোষণার বাস্তবতা প্রমানের জন্য বিভিন্ন তফসীরকারক/ব্যাখ্যা/বিশ্লেষক বিশেষ করে আধুনিক ব্যাখ্যাকারীগণ ব্যাপক গবেষণামূলক তৎপরতা চালান। আর ইহা করতে গিয়ে তারা কোরআনেই বিদ্যমান এক রহস্যজনক সংখ্যা বা গাণিতিক তত্ত্ব/তথ্য উদ্ধার করেন। এই তত্ত্ব ও তথ্য কম্পিউটারে প্রয়োগ করে ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা কোরআনের বিভিন সূরা/আয়াতের শব্দ/শব্দাক্ষরের সংখ্যার মধ্যে এক সুক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় বিভাজন/বুনুন/বন্ধন প্রক্রিয়ার ও প্রণালীর সন্ধান পান। ইহার ভিত্তিতেই কোরআনের অলৌকিত্বের এক বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কোরআনে উল্লেখিত এই সংখ্যাতত্ত্ব কম্পিউটারে প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার অলৌকিত্ব প্রমানের চেষ্টা চালান লেবাননের এক কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডঃ রাশিদ খলিফা মিসরী। উহার উপর ভিত্তি করে তিনি "This Wonderful Quran" - 'দিস ওয়ান্ডারফুল কোরআন' - 'আশ্চর্য এই কোরআন' নামে একটি বই লিখেন। এই বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন মৌলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। ইহা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮০ সনে প্রকাশিত হয়। একই বিষয়ে আহমদ দীদাত- "Al Quran- The Ultimate Miracle" - 'আল দি আল্টিমেট মিরাকল্' নামে আর একটি বই লিখেন। ইহা বঙ্গানুবাদ করেন এ. কে. মুহাম্মদ আলী। ইহা ১৯৯৩ সনে প্রকাশিত হয়। এই সব পুস্তক থেকে অতি সংক্ষেপে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল। আগ্রহী পাঠকগণকে উক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

কোরআনের গাণিতিক বুনুন/বন্ধন/বিভাজনের রহস্য ঃ আল-কোরআনের সর্বমোট ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি ছাড়া (সূরা ত্বওবা ছাড়া) প্রত্যেকটি সূরাই শুরু হয় "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বাক্য দ্বারা। এই বাক্যে রয়েছে ৪টি শব্দ তথ- 'ইছম', 'আল্লাহ', 'রাহমান' ও 'রাহীম'। এই চারটি আরবী অক্ষর/হরফের মোট সংখ্যা হচ্ছে- ১৯ (উনিশ)। কোরআনের ৭৪ নং সূরা আল মুদাস্‌সিরের ৩০ নং আয়াতেও রয়েছে- "আ'লাই হা তিস'য়াতা আশারা" - অর্থাৎ "এর উপরে রয়েছে উনিশ"। কোরআনে উল্লেখিত তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষ সংখ্যাটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত/ব্যবহৃত শব্দের সমষ্টিকে বিভাজন করার অদ্ভুদ/সক্ষমতাই চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরআনে উল্লেখিত ১৯ সংখ্যার বিভাজন/বুনুন সমগ্র কোরআনেই সুক্ষভাবে জাল বিস্তার করে রয়েছে। এখানে কতিপয় উদাহরণ দেয়া হল ঃ-

(ক) পূর্বোল্লিখিত– "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"- বাক্যের 'ইছম' শব্দটি সমগ্র কোরআনে মোট- ১৯ বার, 'আল্লাহ' নামটি (শব্দটি) মোট ২৬৯৮ বার, 'রাহমান' শব্দটি মোট ৫৭ বার, রাহীম শব্দটি মোট ১১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটি সংখ্যাই রহস্যজনকভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(খ) কোরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা রয়েছে- আর এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(গ) কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ১১৩ সূরাই বিছমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু ১১৩ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কমতি

www.pathagar.com

পূরণ করা হয়েছে অতি নিপুনতার সাথে সূরা "নমলের" মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে। এখন ১১৩+১ = ১১৪। ইহা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(ঘ) সর্বপ্রথমবার নাজিলকৃত সূরা "আল-আলাক্বের" ৫টি আয়াত সমূহের শব্দ ও অক্ষর উভয়ই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(ঙ) দ্বিতীয়বার নাজিলকৃত সূরা "আল-ক্বালামের" (সূরা নং ৬৮) যে ৯টি আয়াত হয় তার সংখ্যা ৩৮, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(চ) তৃতীয়বার নাজিলকৃত সূরা "আল-মুজাম্মিলের" (সূরা নং ৭৩) ১০টি আয়াতের শব্দ সংখ্যা ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(ছ) চতুর্থবারে নাজিলকৃত সূরা মুদাস্‌সিরের (সূরা নং ৭৪) ৩০ নং আয়াতেই রয়েছে রহস্যজনক সংখ্যা ১৯ (উনিশ) যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(জ) আরবী বর্ণমালায় মোট ২৮টি অক্ষর/হরফ রয়েছে। এর মধ্যে ১৪ অক্ষর বিভিন্ন সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'আলিফ', 'লাম', 'মিম' ইত্যাদি। এগুলিকে কোরআনের ভাষায় 'মুকাত্তায়াত' হরফ বলা হয়। এ গুলি সূরা প্রথমে ব্যবহারের প্রকৃত রহস্য ও অর্থ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কোরআনের ২৯টি সূরায় এই মুকাত্তায়াত/সাংকেতিক হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক হরফ/অক্ষর (মুকাত্তায়াত ছাড়া) হরফ/অক্ষর ১৪+ মুকাওয়াত যুক্ত হরফ ১৪+ মুকাওয়াত হরফ যুক্ত সূরার সংখ্যা + ২৯ = মোট ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই কোরআনী কোড বা সাংকেতিক (মুকাত্তায়াত) অক্ষর সূরা সমূহের আদীতে ব্যবহার এর কোন তুলনা হয় না। পূর্ব্বোআল্লিখিত উনিশ সংখ্যাটির সাথে এগুলি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বা বিজরিত। একটি দৃষ্টান্তঃ সাংকেতিক অক্ষর "নুন" এর কথাই ধরা যাক। এই মুকাত্তায়াত/সাংকেতিক অক্ষরটি দিয়ে সূরা 'আল-ক্বালাম' শুরু হয়েছে। আর এই 'নুন' অক্ষর সূরাটিতে মোট ১৩৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এই ১৩৩ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কোরআনের এই গাণিতিক তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কোন কোন জায়াগায় স্পষ্ট ইংগিতও দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ বলেন-

(১) "আমার আয়াত গুলিকে তারা (সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করতো। আর অবস্থা এই যে, আমি প্রত্যেকটি বিষয়ই গুণে গুণে লিখে রেখেছি" (সূরা আল নাবা, আয়াত- ২৮-২৯)।

(২) "এবং তিনি তাদের গোটাপরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন এবং এক একটি জিনিসকে তিনি গুণে গুণে রেখেছেন" (সূরা- আল জ্বিন, আয়াত-২৮)।

ডঃ রাশিদ খলিফা পবিত্র কোরআনকে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কম্পিউটার থেকে ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে গাণিতিক বুনুনের মাধ্যমে একটি গ্রন্থ রচনা করার ঘটনা আকস্মিকভাবে কতটুকু ঘটতে পারে এই তথ্য জানতে চাইলে কম্পিউটার জানায় যে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই ধরনের গাণিতিক বুনুন হয়তো আকস্মিকভাবে ঘটে যেতে পারে তবে তার সম্ভাবনা হল ৬২৬ সেপ্টেলিয়ান ভাগের এক

www.pathagar.com

ভাগ অর্থাৎ ৬২৬ সংখ্যার পর ২৪টি শূণ্য দিলে যত হয় তার এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ $^{১}/_{৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০}$ ভাগ। ইহা সম্পূর্ণ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অর্থাৎ উপরোক্ত সংখ্যার কোরআন শরীফ রচিত হলে তার মধ্যে হয়তোবা একটি আকস্মিকভাবে গাণিতিক বুনুনের মধ্যে পড়বে। সেই একটি চান্স ধরে নিলেও বর্তমানে আমাদের সম্মুখেই যে কোরআন রয়েছে সেটিই তো সেই একটি। বর্তমানে কোরআনের আয়াত, শব্দ, অক্ষর সম্বলিত প্রতিদিন ১টি করে কোরআন রচনা করলেও এতে উপরোক্ত সংখ্যক কোরআন রচনা করতে সময় লাগবে ১, ১৭১৫, ০৬৮, ৪০০, ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ বৎসর। কাজেই কোরআন কোন মানুষ্য বা অন্য যে কারও দ্বারা রচনা করা সম্ভব কিনা তা অত্যন্ত পরিস্কার। কোরআন রচনায় মানব জাতীর ব্যর্থতার রহস্যতো এখানেও।

আর এ কারণেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন, **"তারা কি কোরআনের ব্যাপারটি (সম্বন্ধে) অনুধাবন করে না?" (সূরা- আন-নিসা, আয়াত- ৮২)।**

উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল-কোরআনের অপূর্ব মনোরম মনোমুগ্ধকর প্রাঞ্জল ভাষা ও রচনা শৈলীর বিস্ময়কর সৌন্দর্য দর্শনে তৎকালীন আরবী ভাষায় পারদর্শী কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিতবর্গও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত। যার ফলে তারা এর অসাধারণ মাধুর্যকে কবির কাব্য, গণৎকারের বুলী, উন্মাদের প্রলাপোক্তি, যাদুর পরশ বা কীর্তি ইত্যাদি আখ্যয়িত করতে দ্বিধা করতো না, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে ইহা যে, আল্লাহ্'র নিকট থেকেই অবতারিত হয়েছে প্রথম প্রথম তারা তা সরাসরি স্বীকার না করলেও প্রকারন্তরে তারা মেনে নিতে বাধ্য হতো এই বলে যে, একমাত্র যাদুর পরশ ছাঢ়া নিরক্ষর মুহাম্মদ -এর পক্ষে এরূপ ঐন্দ্রজালিক ছন্দময় বাক্য রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহা তাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক মনে হতো এ কারণেও যে, কোরআনের আয়াত/সূরা সমূহ একদিকে যেমন অপরূপ মনোহর ও লালিত্যময় পদ্য ছন্দে, অপরদিকে মনোরম গদ্যছন্দে নাজিল হয়েছে। কোরআনের বিস্ময়কর, মনোমুগ্ধকর অতুলনীয় ছন্দময় রচনার কতিপয় নমূনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হেরা পর্বতের নিভৃত গোহায় রাছুল (ছাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত সর্বপ্রথম সূরা-সূরা আল-আলাক্বের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক সেই পাঁচটি আয়াত হচ্ছে ঃ-

১। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ইক্বরা বিছমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক্ব
খালাক্বাল ইন্ছানা মিন্ আলাক্ব
ইক্বরা অ রাব্বুকাল আক্রাম্
আল্লাজি আ'ল্লামা বিল্ ক্বালাম
আ'ল্লা মাল্ ইন্ছানা মা'লাম্ ইয়ালাম্।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লাহর
করুন ও কৃপা যার অনন্ত অপার।

www.pathagar.com

পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে, স্রষ্টা যেজন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোনিত মানবে সৃজন।
পাঠ কর তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
সে জানিত না যাহা, মানুষেরে তিনি দি'ছেন শিক্ষা তাহা।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের সূরা/আয়াত পঠন/ তেলওয়াতের সময় অনেক ক্ষেত্রেই শেষ হরফের 'যের', 'যবর', 'পেশ' উচ্চারিত হয় না বা উহ্য থাকে অথবা কিছুটা ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়।

২। কোরআন কখন/কোন রাত্রি থেকে রাছুলুল্লাহ'র উপর নাজিল শুরু হয় তা মানুষকে জানিয়ে দিয়ে সূরা 'আল ক্বদর' নাজিল হয়। তা হচ্ছে ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্না আন্‌যাল না-হু ফী-লাইলাতিল্ ক্বাদর্
অমা-আদ্‌রা কামা লাইলাতুল ক্বাদর্
লাইলাতুল্ ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহ্‌র
তানায্‌যালুল মালা-য়িকাতু অর রূ-হু ফী-হা
বি ইয্‌নি রাব্বিহিম্ মিন্ কুল্লি আমর্
ছালামুন্ হিয়া হাত্তা-মাত্বলায়িল্ ফাজর।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লাহর
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার
করিয়াছি অবতীর্ণ কোরআন পূন্য "শবে কদরে"
জানবে কিসে শবে ক্বদর কয় কারে?
ধরা'পরে হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবঁরাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকাল নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ এই শান্ত পূত রজনী।

৩। **সূরা আল্ ফাতিহা ঃ** ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর নাজিলকৃত প্রথম পূর্নাঙ্গ সূরা। ইহা নাজিলের পূর্বে কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল হয় নাই।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্‌হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ'-লামী-ন।
আর্‌রাহমা-নির রাহী-ম।
মা-লিকি ইয়াওমি দ্বী-ন।
ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা কা নাছ্ তাঈ'ন।

www.pathagar.com

ইহ্‌দিনাছ্ ছিরা-ত্বোয়াল্ মুছতাক্বী-ম।
ছিরা-ত্বোয়াল্লাযী-না আন্ আ'ম্‌তা আ'লাইহিম।
গাইরিল মাগদূ-বি আ'লাইহিম অলাদ্‌দোয়া-ল্লী-ন। (আ-মী-ন)

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লাহর,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লাহ'র মহিমা।
করুণা-কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি। আর শক্তি ভিক্ষা করি
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও
অভিশপ্ত আর পথ ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়োনা কভু!

৪। আল-কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা ঃ **সূরা কাওছার ঃ**

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্না-আ'ত্বোয়াইনা-কাল্ কাওছার
ফাছোয়াল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার
ইন্না-শা-নিয়াকা হুওয়াল আবতার।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করিলাম লয়ে আল্লাহর নাম,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।
অনন্ত কল্যাণ তোমা ' দিয়াছি নিশ্চয়
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড় ও দাও কোরবাণী তাঁরেই
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সেই।

৫। আল-কোরআনের সর্বশেষ সূরা ঃ **সূরা না-ছ ঃ**

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
কুল, আউ'-যু বিরাব্বিন্না-ছ
মালিকিন্না-ছ
ইলা-হি-ন্না-ছ
মিন্ শার্‌রিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্না-ছ
আল্লাযী ইউওয়াছওয়িছু ফী-ছুধু-রিন্না-ছ
মিনাল্ জিন্নাতি অন্না-ছ।

www.pathagar.com

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করিলাম লয়ে আল্লাহর নাম,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।
বল, আমি তারি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন
কেবল তাঁহার কাছে, ত্রিভূবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ
কুমন্ত্রদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।

৬। সূরা আত্তীন ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অত্তী-নি অয্যাইতু-ন,
অত্তু-রি ছী-নী-ন,
অ-হা-যাল্ বালাদিল্ আমী-ন,
লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্ছা-না ফী আহছানি তাক্ব-ওয়ীম
ছুম্মা রাদাদ্না-হু-আছ্ফালা ছা-ফিলী-ন,
ইল্লাল্লাযী-নাআ-মানু-অ.আ'মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি, ফালাহুম্ আজরুন্ গাইরু মামনূ-ন
ফামা-ই কায্যিবুক বা'দু বিদী-ন
আলাইছাল্লা-হু বি আহ কামিল হা-কি-মী-ন্।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করি ল'য়ে শুভ না আল্লাহর,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।
শপথ "তীন" "জায়তুন" "নিসাই" পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার–
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তা'রে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জন্মারে।
কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
"সুবিচার পাবে সবে" বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হায়?
আল্লাহ্ কি নন সব বিচারক চেঁয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

www.pathagar.com

৭। **সূরা আল-বালাদ্ ঃ**

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
লা-উক্বছিমু বিহা-যাল্ বালাদ।
অ-আন্তা হিল্লুম বিহা যাল্ বালাদ।
অ ওয়া-লিদিও অমা অলাদ।
লাক্বাদ্ খালাক্ব নাল ইন্ছা-না-ফী-কাবাদ।
আ ইয়াহ্ছাবু আল্লাই ইয়াক্বদিরা আ'লাইহি আহাদ।
ইয়াকূলু আহলাক্তু মা-লা লুবাদ।
আইয়াহ্ ছাবু আল্লাম্ ইয়ারাহূ আহাদ।
আলাম নাজ্আ'ল্লাহু আ'ইনাইন।
অ লিছানা ওয়া শাফাতাইন।
অ হাদাইনা-হু নাজ্দাইন।
ফালাক্ব তাহামাল্ আ'ক্বাবাহ্।
অমা-আদ্রা কা মাল্ আ'ক্বাবাহ্।
ফাক্ব বাক্বাবা।
আও ইত্আ'-মুন্ ফী-ইয়াওমিন যী মাস্বাগাত্।
ইয়াতী মান্ যা মাক্বরাত।
আও মিছ্কী নান্ যা মাতরাবাত্।
ছুম্মা কা'না মিনাল্লাযীনা আমানু অ তাওয়া-ছোয়াও বিছ্ছোয়াবরি অ তাওয়া ছোয়াও বিল মাহরহামাত্।
উলা-য়কা আছ্-হাবুল্ মাইমানাত্।
ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআইয়া-তিনা হুম আছ্হা-বুল মাশয়ামাত। আ'লাইহিম্ না-রুম মু'ছোয়াদাত।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করিলাম ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।
শপথ করি এই নগরের
যে হেতু বিরাজ করিছ হেথায়,
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ,
সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ?
"উড়ায়ে দিয়েছি রাশি রাশি টাকা
আমি"– সে বলে বিনাশিতে তোমারে,
সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে?

www.pathagar.com

আমি কি তাহার মংগল লাগি'
দেইনি তাহারে যুগল নয়ন?
জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি? দেখায়ে
দিইনি উভয় পথ সে কারণ?
কিন্তু প্রবেশ করিল না। সে
দুর্গম পথে উপত্যকার,
উপত্যকার দুর্গম লেই
পথ-জান তুমি সন্ধান তার?
সে পথ দাসেরে মুক্তি দান
ও অন্নদান সে ক্ষুধার্তরে
আশ্রয় দান ধুলি-লুণ্ঠিত কাঙালে,
"এতিম" আত্মীয়েরে।
এমনি করে সে হয় একজন
তাদের মতই, ঈমান যারা
আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তারা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হ'তে তা'রাই হবে
দক্ষিণ কর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা- হবে
বাম হস্তের অধিকারী তা'রা, তাদের তরে
আছে নিবদ্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

৮। সূরা আশ্-শাম্ছ ঃ

বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম
অশ্ শাম্ছি অদ্দুহা-হা।
আল ক্বামারি ইযা-তালা-হা।
অন্নাহা-রি ইযা-জ্বাল্লা-হা।
আল্লাইনি ইযা-ইয়াগ্শা-হা।
আছ্ছামা-রি অমা বানা-হা।
অল আরদ্বি অমা ত্বোয়হা -হা।
অ নাফ্ছিও অমা ছাওয়্যা-হা।
ফায়াল্ হামাহা ফুজু-রাহা।
অতাক্বওয়া-হা।
ক্বাদ্ আফ্লাহা মান্ যাক্কা-হা।
আক্বাদ্ খা-বা মান্ দাছ্ছা-হা।
ক্বায্যাবাত্ ছামূ দুর্ব ত্বোয়াগ্ওয়া-হা।
ইযিম্ বাআ'ছা আশ্ক্বা-হা।

www.pathagar.com

ফাক্বালা লাহুম রাছু-লুল্লাহি না-ক্বা তাল্লা-হি অ ছুক্বইয়া-হা।
ফা কায্‌যাবু-হু ফাআ'ক্বারু-হা ফাদাম্‌দামা আ'লাইহিম্ রাব্বুহুম বিসাম্‌হিম ফাছাওয়্যা-হা।
অলা ইয়াখা-ফু উদক্বা হা।

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুরু করি ল'য়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা আধার।
শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তা'র,
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে;
নভঃ-নির্মাণকারী তাহার;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার;
আত্মা, সুচারু গঠন তা'র।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করছে সাক্ষ্য দান–
আত্মশুদ্ধি হইল যার,
নিশ্চয় সার্থক জীবন,
আত্মায় কলুষিত করলি যে
চির-বঞ্চিত হ'ল সে জন।
সত্যেরে বলিল মিথ্যা "সামুদ" জাতি সে গর্বভরে
অগ্রসর হ'লো হতভাগ্যেরা
(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।
কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত –
সলিল করিতে পান
ওই আল্লার উটেরে
দিও না কো বাধা ব'ধো না প্রাণ।
বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী
তথাপি তাহার বধিল উটেরে,
তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা তাদেরে।
ধূলিসাৎ ক'রে ফেলিলেন খোদা তাদেরে;
এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোন ভয় কভু নাই তাঁহার)।

(সূরা/আয়াতের কাব্যরূপ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
"কাব্য আমপারা" থেকে গৃহীত)

www.pathagar.com

উপরোক্ত বিষয়গুলি সামগ্রিক ভাবে বিবেচনায় আনলে ইহা দিবালোকের মত এবং অনিবার্যভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সন্দেহবাদী, জড়বাদী কাফের/মুশরিক, মূর্তিপূজক মুনাফেকরা কোরআনের অবতারণা সম্পর্কে যে যা-ই বলুক না কেন, যে যত সন্দেহ-ই করুক না কেন তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও সম্পূর্ন বিজ্ঞান সম্মতভাবেই ধোপে টেকে না। ইহা অবতারিত/নাজিলকৃত মহা ঐশীগ্রন্থ হিসাবে যেমনি ছিল ১৪শত বৎসর পূর্বে (উহা নাজিলের কালে) তেমনি আছে আজও, তেমনি থাকবে চিরকাল।

আল-কোরআনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য বৈশিষ্টের কথা খোদ কোরআনেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইহা 'ক্বদরের রাত্রে বা মুবারক রাত্রে' অবতীর্ন হয়েছে, 'পবিত্র না হয়ে ইহা স্পর্শ করা যায় না', "ইহা পাঠের পূর্বে অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়", আর 'এই কিতাব সমস্ত প্রকার সন্দেহ মুক্ত' ইত্যাদি যা মনুষ্য সৃষ্ট কোন কিতাবের বেলায় প্রযোজ্য নহে।

এরূপভাবে কাফের মুশরিকরা শত চেষ্টা করেও কোরআন রচনার চ্যালেঞ্জ গ্রহনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে কোরআন ও কোরআনের অনুসারী মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য সমরক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস স্বাক্ষী কোরআন ও ইসলামের মোকাবেলায় তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে অন্যান্যরা চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পন পূর্বক ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছিল।

আল-কোরআনের উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ শুধু তখনকার দিনের আরবদের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছিল না, বরং ঐ চ্যালেঞ্জ সর্বকালের সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে, আর এই চ্যালেঞ্জ কিয়ামত (শেষ বিচারের দিন) পর্যন্ত সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানবজাতি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহনে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েই রয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েই যে থাকবে চিরকাল এতে সন্দেহের বিন্দুমত্রও অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

মহা-পবিত্র ঐশি গ্রন্থ আল-কোরআন সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তি, দূর্নীতি ও হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট থেকেই অবতারিত বলে ঘোষিত

আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, মহা-ঐশী গ্রন্থ আল-কোরআন তাঁরই নিকট থেকে তাঁর পবিত্র ফেরেশতা মারফত তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাছুল হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট প্রেরিত হয়েছে। ইহা নাজিল/প্রেরনের সময় ইহার চর্তুদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে যার ফলে ইহা সম্পূর্ণ দূর্নীতি, ভুলভ্রান্তি বা হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত। আল্লাহ আরো ঘোষণা করেছেন যে, ইহা (কোরআন) 'লৌহ মাহফুজে' সংরক্ষিত এবং এর প্রত্যেক বিষয়ই গুণে গুণে রাখা হয়েছে। কাজেই ইহাতে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা একেবারেই অসম্ভব এবং এতে কারো দ্বারা কোনরূপ পরিবর্তন করার যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইহা (কোরআন) অতি পবিত্র এবং পাক পবিত্র হওয়া ব্যতিরেকে ইহা স্পর্শ করাও যায় না। যেখানে শ্রষ্ঠা স্বয়ং কোরআনকে সর্বপ্রকার দূর্নীতি, ভুলভ্রান্তি ও হস্তক্ষেপ রাখার পূর্ন নিশ্চয়তা/গ্যারান্টি দিয়েছেন সেখানে যে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন যে একেবারেই অসম্ভব তা সুস্পষ্ট। আমাদের সম্মুখে আজ যে কোরআন বিদ্যমান রয়েছে ইহাই সেই ভুলভ্রান্তি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন সর্বপ্রকার দোষনমুক্ত পবিত্রতম কোরআন। প্রাসংগিক আয়াত সমুহের তরজমা ও তফসীর ঃ-

১। "নিশ্চয় যারা সদুপদেশ (এই কোরআন) সম্বন্ধে অবশ্বিাস করেছে উহা তাদের নিকট আসার পরও; এবং নিশ্চয়ই ইহা শক্তিশালী মহাগ্রন্থ। উহার সম্মুখ থেকে ও পশ্চাৎ থেকে উহার নিকট কোনই ভুলভ্রান্তি আসতে পারে না, ইহা সুপ্রশংসিত মহাজ্ঞানী (আল্লাহর নিকট) থেকেই অবতারিত" (সূরা (হা-মিম-সিজদা, আয়াত ৪১-৪২)। তফসীর ঃ-

(ক) (উপরোক্ত) দুইট আয়াতে পবিত্র কোরান শরিফের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহতা'লা বলতেছেন- 'হে রাছুল, অবিশ্বাসীরা যাই বলুক না কেন, তোমার মহাপ্রশংসিত ও মহাজ্ঞানী প্রভু থেকেই এ গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ন হয়েছে। ইহা এরূপ শক্তিশালী স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ যে, ইহার সম্মুখ থেকে অথবা ইহার পশ্চাৎ থেকে কোনই ভুল ভ্রান্তি ইহাতে প্রবিষ্ট হতে পারবে না। উপরোক্ত উক্তির মর্ম এই যে, ইহা এরূপ অতূলনীয় মহাগ্রন্থ যে, ইহার মধ্যে কোনই ভুল-ভ্রান্তি নেই। যুগ যুগান্ত ব্যাপি চেষ্টা করলেও কেহই এতে কোনরূপ ভুলভ্রান্তি বা দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করতে পারবে না। অধিকন্ত ইহা কোন কালেও পরিবর্তিত অথবা পরিবর্ধিত হবে না, ইহা যেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে চিরকাল ঠিক সেই রূপভাবেই বিদ্যমান থাকবে। বলা বাহুল্য পবিত্র কোরআন ব্যতীত জগতের আর কোন ধর্মগ্রন্থেরই এরূপ অলৌকিক বিশেষত্ব নেই। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

www.pathagar.com

(খ) 'এই কিতাব আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত, এর ভাষার পরিবর্তন পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারো নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে (এর) বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্য কারও নেই। যখনই কোন হতভাগ্য এরূপ (পরিবর্তন) করার ইচ্ছা করেছে তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক (অনিষ্টকর) কৌশল থেকে পাক পবিত্র রয়েছে। 'কোরআনের ভাষার' যে পরিবর্তন করার উপায় নেই তা প্রত্যেকেই দেখে এবং বুঝে যেহেতু ইহা সকলের চোখের সামনেই রয়েছে। কোরআন চৌদ্দশত বৎসর অবধি সারা বিশ্বে (দিনরাত) পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের (ক্বলবে) বুকে (অন্তরে) সংরক্ষিত রয়েছে। কেহ এর একটি 'যের' ও 'যবরের' ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে বালক এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল (মূর্খ) পর্যন্ত (সমস্ত) মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাড়িয়ে যায়। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

২। **"গায়েবী বিষয়ের জ্ঞাত একমাত্র তিনিই, তিনি তাঁর গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাকেও অবহিত করেন না। তবে হ্যাঁ, নিজের কোন মনোনীত পয়গম্বরকে, তখন উক্ত পয়গম্বরের সম্মুখে ও প্রশ্চাতে রক্ষী ফিরিশতাগণকে প্রেরণ করে থাকেন। যেন আল্লাহ তা'য়ালা জানতে পারেন যে, উক্ত ফিরিশতাগণ তাদের প্রভুর বার্তা ঠিকমত পৌছে দিয়েছেন। আর আল্লাহতা'য়ালা তাদের যাবতীয় অবস্থা আয়ত্বে রেখেছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত রয়েছেন" (সূরা জ্বিন- আয়াত-২৬-২৭)।** তফসীর ঃ-

প্রথর্ম কথা, রাছুলকে সেই গায়েবী (ইল্‌ম/জ্ঞান) দেয়া হয় যা রিসালতের কর্তব্য পালনের জন্য জরুরী বিবেচিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রহরা ও সংরক্ষণ কার্যের জন্য যে সকল ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, তারা শুধু রাছুলের (ছাঃ) নিকট ওহী সরাসরিভাবে পৌছে যাবার ব্যাপারটি-ই প্রহরা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন না, বরং রাছুল (ছাঃ) তাঁর খোদার পয়গাম সমূহ যে তাঁর বান্দাগন পর্যন্ত কোনরূপ (পরিবর্তন ব্যাতিরেকে) বেশকম ছাড়াই (হুবহু) পৌছে দিয়েছেন এই ব্যাপারটিকেও সংরক্ষণ করে থাকেন। রাছুল ও ফেরেশতা উভয়ের উপর আল্লাহর শক্তি এমন ব্যাপক ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে, ইহাদের একজনও যদি একবিন্দু পরিমান আল্লাহর মর্জির পরিপন্থী কাজ করেন তবে সংগে সংগেই ধরা পড়বেন, তা থেকে কেহই রক্ষা পেতে পারবেন না। আর যে সব পয়গাম আল্লাহতা'য়ালা পাঠিয়ে থাকেন উহার প্রতিটি অক্ষরও গুণে গুণে রাখা হয়। উহা থেকে একটি অক্ষরও কমবেমী করার কোন শক্তি বা ক্ষমতা রাছূল বা ফেরেশতা কারও নেই। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

৩। **"কখনও না-নিশ্চয় ইহা (কোরআন) সদুপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে উহা 'স্মরণ' করুক। উহা সেই সম্মানিত পুস্তিকা সমুহের অন্তর্ভুক্ত, যা সমুন্নত, পবিত্রতম। সেই লেখকগনের হস্তে রয়েছে যারা গৌরবান্বিত পুণ্যবান।" (সূরা আবাসা-আয়াত-১১-১৬)।** তফসীর ঃ-

(ক) এ কয়েকটি আয়াতও হজরত রাছুলুল্লাহকে শান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অজু ও গোসল ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় কেহই এ পবিত্রতম ও সম্মানিত মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফ স্পর্শ করবে না। (স্পর্শ করা যাবে না) হজরত আলী (রাঃ) ও এবন-মসউদ্ (রাঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধতম সাহাবাগন এবং অধিকাংশ তফসীরকার, মোহাদ্দেস ও ফকিহগণ সকলেই এই মত সমর্থন করেছেন। হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, অপবিত্র অবস্থায় কেহই কোরান শরিফ স্পর্শ করবে না। অবিশ্বাসী কাফের ও অংশীবাদী পোত্তলিকদিগের পক্ষে কোরান শরিফ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। (সহি বোখারী, দেবরানী প্রভৃতি) তফসীরে কোরান শরিফ (সংক্ষেপিত)।

উপরোল্লেখিত সূরা হা-মিম্-সাজদা, সূরা জ্বিন, সূরা আবাসা ও সূরা হাক্কার উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, মানব জাতীর হেদায়েত স্বরূপ প্রেরিত আল-কোরআন সর্ব্ব প্রকার দূর্নীতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় তাঁর নিকট থেকেই ফিরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -এর মারফত তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাছুল হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর নিকট প্রেরিত হয়েছে। উহা প্রেরণ কালে উহার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়ে থাকে যা'তে উহাতে কারও দ্বারা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন ইত্যাদি করা সম্ভব না হয়।

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেছেন যে, কাফের মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী ইহা কোন কবির কাব্য নয়, কাহিনীকারকের কাহিনী নয়, পাগলের পাগলামী বা গণকের উক্তি নহে বা যাদুকরের যাদুও নহে। উহা বরং লৌহমাহ্ফুজে সংরক্ষিত 'মকমুন' কিতাব যার প্রত্যেকটি বিষয় গুণে বেছে রাখা হয়েছে। কাজেই উহাতে যে কোন মহল থেকে যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ বা ভুল ভ্রান্তি বা দূর্নীতি করার যে কোন প্রচেষ্টা ধরা পড়তে বাধ্য।

কোরআন নাজিল হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই উহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে বা কোন প্রকার দূর্নীতি অবলম্বন করতে সক্ষম হয় নি বা উহার কোন আয়াত বাক্য, কোন শব্দ এমনকি উহার কোন 'যের', 'জবর' পর্যন্ত পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, আর হবেও না কোন দিন এতে বিন্দুমাত্রও কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করছেন যে, আমি উহা (কোরআন) নাজিল করেছি, আমিই এর সুনিশ্চিত সংরক্ষক। (সূরা হিজর আয়াত-৯)। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী আল-কোরআনের লক্ষ লক্ষ হাফেজ (মুখাস্তকারী) রয়েছেন- যারা উহা দিন রাত পড়ে (হেফ্জ) যাচ্ছেন। উহাতে যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা কমবেশী করা তাৎক্ষণিক ভাবে ধরা পড়তে বাধ্য।

কাজেই ইহা অত্যন্ত পরিস্কার যে, আল্লাহতা'য়ালার আল-কোরআনকে সর্ব্ব প্রকার দূর্নীতি, হস্তক্ষেপ, ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত রাখার উল্লেখিত অংগীকার বা ঘোষণা অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

কোরআন মহান স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত এবং তিনিই স্বয়ং এর সংরক্ষক বলে আগাম ঘোষণা

আদি মানব হজরত আদম (আঃ) কে ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণের সময়ই স্রষ্টা আল্লাহতা'য়ালা পরিস্কার অগ্রিম বলে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ব মাঝে মানুষকে স্রষ্টার বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য পথ নির্দেশ স্বরূপ সময় সময় হেদায়েত/আসমানী কিতাব/ছহিফা (শরিয়তী বিধান সমূহ) প্রেরিত হবে (সূরা বাকারা, আয়াত-৩৮)। আল্লাহর এই ঘোষণার বাস্তবায়ন স্বরূপই সর্ব প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য (১ লক্ষ বা ২ লক্ষ চব্বিশ হাজার) নবী/রাছুল বিশ্ব মাঝে মানুষকে হেদায়েত দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা কর্তৃক নাজিলকৃত ঐশী বা অবতারিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আল-কোরআনই হচ্ছে সর্বশেষ ও সর্বগুণে গুণান্বিত এবং স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক হেফাজত বা সংরক্ষনের গ্যারান্টিযুক্ত আসমানী গ্রন্থ। বিশ্বের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই এরূপ সর্বপ্রকার দূষন অর্থাৎ ভুল-ভ্রান্তি, হস্তপেক্ষ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন মুক্ত থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ গুলি যেখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন হয়ে গিয়ে এমনকি উহাদের আসল রূপ বা উহাদের আদি আসল ভাষারই বর্তমানে অস্তিত্ব আছে কিনা কেউ সঠিক বলতে পারে না, সেখানে আল-কোরআন সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তরমুক্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। ইহা কোরআনেরই একটি মু'জিযা বা 'অলৌকিকত্ব'। ইহা যেভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে তাতে এর মধ্যে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হবার এবং কোন কালেই ইহা নষ্ট বা বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এর হেফাজতের ভার স্বয়ং প্রেরকের হাতেই রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

আল্লাহ বলেন- **"নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশ (ঝিকর) অবতরন করেছি এবং আমি নিজেই উহার সুনিশ্চিত সংরক্ষক" (সূরা হিজর- আয়াত-৯)।**

(ক) অনন্তর আল্লাহতা'লা বলছেন যে, আমিই মানব জাতির জন্য উপদেশ স্বরূপ এই স্বর্গীয় কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষক। ইহার প্রত্যেক বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং জগতে কেহই উহার ব্যতিক্রম বা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতের স্পষ্টতর মর্মার্থ এই যে, আল্লাতায়ালা নিজ মহিমাবলে চিরকাল কোরান শরিফের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবেন, কেহই উহা বিকৃত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, অথবা রূপান্তরিত করতে পারবেনা। বিশ্ব জগতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় কোরান ব্যতিত এই অতুলনীয় গৌরব আর কোন ধর্মগ্রন্থেরই নেই। জগতের সমস্ত ধর্মগ্রন্থই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, বিকৃত অথবা রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, কেবলমাত্র কোরান শরিফই সম্পূর্ন অবিকৃত থেকে এই জলন্ত ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা ঘোষণা করছে। আজ পর্যন্ত ইহার একটি শব্দ, একটি বর্ণ এমনকি একটি 'জের', 'জবরেরও' ব্যতিক্রম হয় নাই এবং কেয়ামত (শেষ বিচারের দিন) পর্যন্তও হবে না। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

www.pathagar.com

(খ) আমি কোরআন অবতরণ করেছি এবং (এটা প্রমানহীন নয়; বরং এর অলৌকিকত্বই এর প্রমাণ। কোরআনের অলৌকিকত্বের বর্ননা অন্যান্য সূরায়ও দেয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ সূরাও রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব এই যে,) আমি এর (কোরআনের) সংরক্ষক ও পরিদর্শক। এতে কেউ বেশী-কম করতে পারেনা, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পষ্ট 'মু'জিযা' যা সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মু'জিযা এই যে, কোরআনের বিশুদ্ধতা, ভাষালংকার ও সর্বব্যাপকতার মোকাবিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিযাটি একমাত্র জ্ঞানী ও বিদ্বানরাই বুঝতে পারে। কিন্তু কম বেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো একজন অশিক্ষিত মুর্খও দেখতে পারে।

খলিফা মামুনের দরবারে একটি ঘটনা ঃ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ননা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পন্ডিত ব্যক্তিগনের জন্য অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ঈহুদী পন্ডিত আগমন করল। সে আকার আকৃতি, পোষাক ইত্যাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞতা সুলভ। সভা শেষে খলিফা মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি ঈহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন ঃ আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব। সে উত্তরে বলল ঃ আমি পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকাহ্ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপুর্ন তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি কি-ই ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিলেন? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমিই ঐ ব্যক্তি। মামুন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহন করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল? সে বলল ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ কম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ঈহুদীদের উপসানালয়ে উপস্থিত হলাম। ঈহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিনকপি কমবেশ করে লিখে খৃষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খৃষ্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা নির্ভুল কিনা, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

www.pathagar.com

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহন করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহতা'লা নিজেই এর সংরক্ষন করেছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এই ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহইয়া ইবনে আখতাম বলেন ঃ ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্বব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়ানার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কোরআনে পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আখতাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোরআনের কোন আয়াতে আছে ঃ সুফিয়ান বলেন ঃ কোরআনে পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে সেখানে বলেছে "বিমাস্ তুহফিজু মিন কিতাবিল্লাহে"। অর্থাৎ ঈহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর কিতাব/গ্রন্থ যথাক্রমে তওরাত ও ইঞ্জিল হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একারণেই যখন ঈহুদী ও খৃষ্টানরা (তাদের গ্রন্থ) হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে কোরআন পাকের হেফাজত সম্পর্কে আল্লাহতা'লা বলেন ঃ 'ইন্না লাহু লাহাফিজুন' অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহতালা স্বয়ং এর হেফাজত করার কারণে শত্রুর হাজারো চেষ্টা সত্বেও এর একটি 'নুক্তা' এবং 'যের' ও 'যবর' পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালাতের আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগীতা স্বত্বেও কোরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই শুধু লাখে লাখে নয় বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমেরও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। এরূপ ক্ষেত্রে তৎক্ষনাৎ বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তার ভুল ধরে ফেলবে। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

বর্ণিত ঘটনাটি থেকে ইহা পরিস্কার যে, আল্লাহতায়ালা কর্তক নাজিলকৃত ঐশী গ্রন্থ সমূহ বিশেষ করে তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থের হেফাজতের ভার/দায়িত্ব ঈহুদী ও খৃষ্টানদের উপরই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এই দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করার দরুন সেগুলি কালে কালে হস্তক্ষেপের পর হস্তক্ষেপ হয়ে, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকৃত হয়ে আসল রূপ বহু পুর্বেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি সমগ্র মানব জাতির হেদায়েত স্বরূপ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল-কোরআন নাজিল করেছেন এবং সে সাথে ইহাও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনিই স্বয়ং এই 'ঝিকর' (উপদেশ) অর্থাৎ কোরআন এর সুনিশ্চিত সংরক্ষক অর্থাৎ ইহা সংরক্ষনের দায়িত্ব সম্পূর্নভাবে তাঁর উপরেই ন্যাস্ত রয়েছে। স্রষ্টা যখন নিজেই তাঁর নাজিলকৃত ঐশী গ্রন্থ 'কোরআন' এর হেফাজতের ভার নিয়েছেন তখন কিভাবে উহা হেফাজত/সংরক্ষণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তবে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষনার

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন স্বরূপ আমরা যা দেখতি পাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, বিগত চৌদ্দশত বৎসরের অধিককাল ধরে ইহা অটুট, নির্ভুল, অম্লান, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয় ভাবে সমগ্র বিশে সুসংরক্ষিত ভাবেই বিরাজমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল-কোরআন দুই ভাবেই সংরক্ষিত হচ্ছে। যেমন, লিখিত গ্রন্থাগারে এবং অলিখিত মুখস্থ/হেফজের মাধ্যমে। লিখিতাকারে কোরআন তো আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। নাজিলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই সারা বিশ্বে অসংখ্য কোরআনে-হাফেজ বা কোরআন মুখস্তকারী রয়েছেন যারা এই কোরআনকে অত্যন্ত নির্ভূল, নিষ্ঠা ও সুস্পষ্টভাবে বক্ষে, মন-মগজে ধারণ করে রয়েছে যা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে কাগজে মুদ্রিত/লিখিত বা টেপে রেকর্ডকৃত কোরআন যদি (খোদা না খাস্তা) কোন কারণে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় বা ধ্বংস করে দেয়া হয় (যদিও বিশ্বব্যাপি এরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই), তথাপি একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, কোরআনকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে অথবা স্বল্পতম সময়ের নোটিশে এক বা একাধিক কোরআনে-হাফেজ একত্র হয়ে নিজ হাতে লিখে অথবা শ্রুতলিপির (ডিকটেশনের) মাধ্যমে একখান আদি, অটুট, মূল, পূর্নাংগ ও নির্ভুল কোরআন যার কোন শব্দ, অক্ষর, যের, যবর (আকার, ইকার) দাড়ি, কমা ইত্যাদি বিন্দু/বিষর্গও বাদ না দিয়ে (অর্থাৎ কোন পরিবর্তন না করেই) প্রস্তুত করে দিতে সক্ষম। অন্য কোন সংরক্ষন ব্যবস্থার কথা বাদ দিলেও শুধু এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই কোরআন চিরকাল অটুট, অক্ষয়, অম্লান ভাবে বিরাজমান থাকতে বাধ্য।

নিঃসন্দেহে ইহা (সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা) কোরআনের একটি চাঞ্চল্যকর অলৌকিকতা (মু'জিযা)। এভাবেই কোরআন সংরক্ষনের আল্লাহ'র উপরোক্ত বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি ও আগাম ঘোষণা অতি বিস্ময়কর ভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই বিরাজমান রয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর পথে বাধা ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য ধন সম্পদ ব্যয়কারী কাফের/মুশরিকরা পরিশেষে অনুতপ্ত, পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে বলে অগ্রিম ঘোষণা ঃ

নবুয়ত প্রাপ্তির পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার কাফের/মুশরিকদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেবার পরিবর্তে চরম বিরোধীতা ও প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। কালক্রমে চতুর্দিক থেকে প্রবল বিরোধীতার ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। হিজরত করে মদীনায় আসার পরও মক্কার কাফের/মুশরিকরা থেমে থাকে নাই। ইসলামকে ধ্বংস করার মানসে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেই থাকে। মদীনায় হিজরত করে আসার পর ২টি বৎসরও পার হল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কাফের/মুশরিকদের সম্মিলিত শক্তির সাথে মোকাবেলা করার মত পর্যাপ্ত শক্তি মুসলমানদের হয়ে উঠে নাই। এরই মধ্যে মক্কা থেকে প্রায় পৌনে তিনশত মাইল দূরে মদীনায় এসেই মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মক্কার কাফের/মুশরিকরা এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে 'বদর' নামক প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন রকমে জান-প্রাণ নিয়ে হিযরত করে আসা মুসলমানদের তখন শক্তি ছিল অতি নগন্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বদরে মুসলমানদের সাথে প্রথম মোকাবেলায়ই আল্লাহর সাহায্যে প্রায় অলৌকিকভাবে মক্কার শক্তিশালী কাফের/মুশরিকরা চরমভাবে বিদ্ধস্ত হয়ে গেল। তাদের প্রধান প্রধান নেতারা নিহত হল, আর বহু সংখ্যক বন্দী হল।

কিন্তু বদরে চরমভাবে বিদ্ধস্ত হবার পরও তারা দমে নাই। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য আরেকটা যুদ্ধের জন্য তারা পূর্ণদ্যোমে প্রস্তুতি নিতে লাগল। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে খতম করে দেয়ার জন্য নিজেদের অপরিমেয় মাল/সম্পদ উজার করে ব্যয় করতে লাগল।

এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ আগাম ঘোষণা করে দিলেন যে, কোরআনকে অস্বীকার করে আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ) ও মুসলমানদের গতিরোধ করার জন্য কাফের মুশরিকরা অকাতরে যে ধন সম্পদ ব্যয় করছে, পরিণামে তা তাদের কোনই কাজে আসবে না। তাদের সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিস্ফল হতে বাধ্য । ফলে তাদেরকে এরূপ ব্যাপক অপব্যয়ের কারণে অনুশোচনা ও আক্ষেপ করতে হবে।

পরবর্তীতে দেখা গেল যে, আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণা অনিবার্য ভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছে। 'ওহোদ', 'আহযাব' ইত্যাদি যুদ্ধে অজস্র সম্পদ ব্যয় করেও শেষ রক্ষা হল না। পরিশেষে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজিত হয়ে গেলে তারা (কাফের

www.pathagar.com

মুশরিকরা) চূড়ান্তভাবে বিদ্ধস্ত হয়ে যায়। তখন তাদের দুর্গতি, আক্ষেপ আর অনুশোচনার সীমা পরিসীমা রইল না। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমাও তফসীর ঃ

"যে সব লোক পরম সত্যকে (কোরআনের বাণীকে) মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের ধন সম্পদ খোদার পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করছে, এভাবে ভবিষ্যতে আরো (অধিক) খরচ করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। অবশেষে তারা পরাজিত হবে। আরো পরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা আনফাল, আয়াত-৩৬)। তফসীর ঃ

বদর যুদ্ধে চরম পরাজয়ের পর আবু সুফিয়ান প্রমুখ যে সকল অবিশ্বাসী কোরেশ নেতা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবার জন্য যুদ্ধায়োজন করে স্ব-স্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করতেছিল, এই আয়াত তাদের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলে দিলেন যে, যারা ইসলামের অনিষ্ট সাধনের জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করছে, উহারা এই উদ্দেশ্যেই নিজেদের আরও অনেক ধম-সম্পদ ব্যয় করবে। কিন্তু পরে যখন উহারা মুসলমানদের নিকট পরাস্ত হয়ে সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে, তখন এই অপব্যয়ের জন্য ভীষনভাবে অনুতাপ করতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা আরও বলে দিচ্ছেন যে, যারা আমার এই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্ববানী অবিশ্বাস করছে তাদেরকে অবশ্যই দোযখে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে (তফসীরে কোরান শরিফ)।

উপরোক্ত আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিক অর্থাৎ যারা আল্লাহ, তাঁর রাছুল (ছাঃ), কোরআন ও সত্য ধর্ম-ইসলামে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও রাছুলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করছে অচিরেই তারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে বাধ্য হবে। এ ছাড়া পরকালেও তারা হবে জাহান্নামী/নরকবাসী। উল্লেখ্য যে, এই ঘোষণা দিবার কালে মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য ছিল অতি নগন্য। এ নগন্য শক্তি নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী কাফের, কোরেশ মুশরিকদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করা তো দূরের কথা, ভালভাবে মোকাবেলা করাও ছিল প্রায় অসম্ভব। এহেন পরিস্থিতিতে তারা (কাফের/মুশরিকরা) কিভাবে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে বাধ্য হবে তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল নগন্য শক্তির অধিকারী মুসলমানদের সাথে মোকাবেলায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা চরমভাবে পরাভূত হয়েছে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক অবশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তারা চূড়ান্ত ভাবে পর্যুদস্ত/বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই আল্লাহ'র পথের গতিরোধকারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অজস্র সম্পদ অকাতরে ব্যয় করার পরও তারা যা পেল তা হচ্ছে অকৃতকার্যতা, অসাফল্য ও হতাশা যার ফলশ্রুতিতে তাদের আক্ষেপ, অনুসূচনা, অনুতাপ আর পরিতাপের অন্ত রইল না।

আল্লাহর উপরোক্ত আগাম ঘোষণা বা ভবিষ্যদ্বাণীটি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই প্রত্যক্ষভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছিল। যারা ইহা বিশ্বাস করতো তারা, এমনকি যারা উহা অবিশ্বাস করতো তারাও নিজ জীবনে নিজ চোখেই উহার প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে গেছে।

www.pathagar.com

কাফের মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধীতার মুখেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অবস্থা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়ার অগ্রিম ঘোষণা

নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই আল কোরআনের ক্ষুদ্র/বৃহৎ সূরা/আয়াত সমূহ নাজিল হতে থাকে। হাদিসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোন কারণে কিছুদিন অহী আসা বন্ধ থাকলে কাফের/মুশরিকরা এ বলে সমালোচনা করতে এবং অপবাদ দিতে থাকে যে, মুহাম্মদের খোদা তাকে ত্যাগ করেছে। এতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুটা মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ আগাম ঘোষণা করে দেন যে, 'হে রাছুল আপনার প্রভু আপনাকে (অবশ্যই) ত্যাগ করেন নাই, বরং আপনার প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়া হয়েছে এবং অচিরেই আপনাকে এমন কিছু দেয়া হবে যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

১। **"নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম ও কল্যাণময়। আর শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত কিছু দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন" (সূরা দোহা, আয়াত-৪-৫)**। তফসীর ঃ

(ক) ইহা একটি বিশেষ আগাম সুসংবাদ। এ সংবাদ নবী করীম (ছাঃ) কে আল্লাহতায়ালা দিয়েছিলেন এমন এক সংকটপূর্ণ সময়ে, যখন মাত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক তাঁর সংগী ছিলেন। আর সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী ও শত্রু। সত্যের এ মহা অভিযানে সাফল্য লাভের বাহ্যিক লক্ষণ অতি নিকটে বা দূরে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের দ্বীপ কেবল মক্কা নগরেই টিপটিপ করে জ্বলতে ও ক্ষীণ আলো বিকিরণ করতে ছিল। আর উহাকেই নির্বাপিত করার জন্য চতুর্দিকে প্রবল ঝড় উঠে ছিল। এরূপ সময়ে আল্লাহতায়ালা নবী করীম (ছাঃ) -কে বললেন, এ সব (উৎপীড়ন) হল এ ধরনের কাজের (নবুয়তী দায়ীত্ব পালনকালে) প্রাথমিক পর্যায়ের অসুবিধা ও বন্ধুরতা। ইহা দেখে আপনি কিছুমাত্র ঘাবড়াবেন না, কাতর হয়ে পড়বেন না। আপনার এ কাজের প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় প্রথম পর্যায়ের তুলনায় উত্তম (থেকে উত্তমতর) হবে। আপনার শক্তি, সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আপনার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। "আল্লাহর এ ওয়াদা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে। উহার সহিত আল্লাহর এ ওয়াদাও শামিল রয়েছে যে, পরকালে তিনি যে মর্যাদা লাভ করবেন, তা এ দুনিয়ার লব্দ মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা থেকে অনেক অনেক বেশী।" তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মত যেসব (উন্নতি ও) বিজয় লাভ করবে, সে সবগুলিই আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। তা দেখে আমি বড় খুশী হয়েছি। তখন আল্লাতায়ালা এ কথা নাযিল করলেন যে, 'পরকাল আপনার জন্য দুনিয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম'। আর শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত কিছু দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্টি হয়ে যাবেন। অর্থাৎ দিতে তো কিছু বিলম্ব হবে। কিন্তু সে দেবার দিন খুব বেশী দূরেও নহে। তখন আপনার প্রতি

www.pathagar.com

আপনার রব-এর দান ও অনুগ্রহের এমন বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, তা পেয়ে আপনি অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট হবে।

বস্তুতঃ ইহা কোন অমূলক ওয়াদা ছিল না। নবী করীম (ছাঃ) এর জীবদ্দশায়ই আল্লাহতায়ালার এই ওয়াদা (বহুলাংশে) বাস্তবায়িত হয়। (আরবের) দক্ষিণ উপকূল থেকে উত্তরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে পারস্যোপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরবদেশ নবী করীম (ছাঃ) এর শাসনাধীন হয়। আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই ভূখন্ড এক সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের আওতাভুক্ত হয়। ইহা এতদূর শক্তিশালী হয় যে, যে শক্তিই উহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে তাহাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহর ধ্বনিতে সমগ্র দেশ মুখরিত হয়ে উঠে অথচ মুশরিকরা এ দেশে তাদের মিথ্যা 'কালেমার' আওয়ায উচ্চে রাখবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের সম্মুখে সেসব জনগণের কেবল মস্তকই অবনমিত হয়নি, তাদের মন-মগজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উহার অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। লোকদের আকীদা, বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও বাস্তব কাজকর্মে এক বিরাট মৌলিক বিপ্লব সাধিত হল। চরম জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতি যে মাত্র তেইশটি বৎসরের মধ্যে এতখানি পরিবর্তিত হতে পারে বিশ্ব-ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। নবী করীম (ছাঃ) এর অন্তর্ধানের পর তাঁরই আরদ্ধ ইসলামী আন্দোলন এক প্রবল শক্তি নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের একটি বিরাট অংশের উপর ইহা বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার দিকে দিকে ও কোণায় কোণায় ইহা প্রবল প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর ওয়াদা মত তাঁর রাছুলকে দুনিয়ার জীবনে এতকিছু দান করেছিলেন। অতঃপর পরকালে তিনি তাঁকে যা কিছু দিবেন, তাতো এ দুনিয়ায় মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

(খ) "ওয়ালাল আখেরাতু খায়রুল্লাকা মিনাল উলা" এখানে 'আখেরাতুন'ও 'উলা' শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা এই যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে , এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নেবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নৈয়ামত দান করা হবে। এখানে "আখেরাত" কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা, যেমন- 'উলা' শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। এ আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞান গরিমা ও খোদায়ী নৈকট্যে উন্নতিলাভ সহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত।

"ওয়ালা ছাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতার্দা" অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা

www.pathagar.com

হয়নি। এতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমানে দেবেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কাম্যবস্তু সমূহের মধ্যে ছিল-ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় লাভ, শত্রু দেশে ইসলামের কালেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। (কুরতুবী)। হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেনঃ আল্লাহতা'য়ালা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন "হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরজ করবঃ হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি সন্তুষ্ট" (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

(গ) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা যে সকল দানে হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে সন্তুষ্ট করবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর অর্থ, মর্ম ও অভিব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর পার্থিব জীবনের অসাধারণ সাফল্য, তার জীবনেই (জীরিতাবস্থায়ই) সমগ্র আরবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা, উত্তরকালে তার অনুগামিগণ কর্তৃক বিশ্ব জয় এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার, তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অলৌকিক শক্তি, তাঁর জীবনের অসংখ্য অলৌকিকতা ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি, তার বক্ষ-বিদারণ ও শবে মে'রাজ, সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী মতবাদের আধিপত্য, তাঁর পারলৌকিক শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা, স্বীয় উম্মতের জন্য তাঁর 'শাফায়াত' বা মুক্তি অনুরোধের অধিকার এবং সমস্ত নবী ও সকল সম্প্রদায়ের অগ্রে তাঁর 'পুল-সিরাত' অতিক্রম ও স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ সমস্ত অনন্ত দানের অন্তর্ভূক্ত (তফসীরে কোরান শরিফ (সংক্ষেপিত)।

সূরা 'আদ দোহার' উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে (ইহকালে ও পরকালে) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়ার এবং অনতিবিলম্বে তাঁকে এমন কিছু প্রদানের কথা অগ্রিম ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে, যা পেলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অর্থাৎ নবুয়ত লাভের অতি প্রাথমিক অবস্থায়ই আল্লাহতায়ালা তাঁর নবী (ছাঃ) কে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন যে, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম তথা একেশ্বরবাদ, আল কোরআনের আদেশ/নিষেধ, হুকুম/আহকাম/শরীয়তি বিধানমালা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁকে যে সমস্ত বাঁধা বিপত্তি/প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে সে সমস্ত বাঁধা, বিপত্তি/প্রতিরোধ অতিক্রান্ত করেই তাঁর অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত থেকে উন্নতর করে দেয়া হবে।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের তরজমা ও তফসীর সমূহ থেকে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, যখন এবং যে পরিস্থিতিতে উল্লেখিত ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তখন সে পরিস্থিতিতে উহার বাস্তবায়ন একেবারে অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হচ্ছিল। অবিশ্বাসী মূর্তিপূজক তথা মক্কার প্রধান প্রধান নেতাগণের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে পিতৃ-মাতৃহীন, সহায় সম্বলহীন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গুটি কয়েক নব্য মুসলিম সহ কতদিন টিকে থাকতে পারবেন

www.pathagar.com

সেটাই ছিল তখনকার দেখবার বিষয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে, আল্লাহর উপরোক্ত আগাম ঘোষণার মধ্যে যা ইহকালে বাস্তবায়িত হবার ছিল তা তাঁর জীবদ্দশায়ই সাহাবাগণের সম্মুখে, তাদের উপস্থিতিতেই কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর যা পরকালে বাস্তাবায়িত হবার তা যে পরকালেই বাস্তাবায়িত হবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অরকাশ নেই।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই উল্লেখিত ঘোষণার পর্যায় ক্রমিক বাস্তবায়নের কিছু স্বরূপ /নমুনা, প্রকৃতি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১। নবুয়ত প্রাপ্তীর পর পরই মূর্তীপূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের ঘোষণা মক্কার কাফের/মুশরিকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ঘোর শুত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তারা তৌহিদ তথা মূর্তীপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বানে কিছুতেই সাড়া দিতে পারছিল না, বরং এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বাঁধার সৃষ্টি করতে লাগল। ফলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় ৩ বৎসর পর্যন্ত সংগোপনেই 'একেশ্বরবাদ' তথা-ইসলাম প্রচার করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। আর এই সময়ের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের ও ভয় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হলে, তিনি প্রকাশ্যভাবেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ইহা গ্রহণ না করার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য একদিন ছাফা পর্বতের পাদদেশে নিজ আত্মীয় স্বজনসহ কট্টর অবিশ্বাসী কোরেশ নেতাদের একত্রিত করেন এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহ'র এবাদত বন্দেগী করার আহ্বান জানালেন এবং তা না করলে এর পরিণতি সম্পর্কেও হুশিয়ার করে দেন। কিন্তু তারা (কাফের/মুশরিকরা) সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করে। এদের মধ্য থেকে তাঁরই আপন চাচা আবু লাহাব তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেঃ এর জন্যই কি তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকে এনেছ? 'তাব্বান লাকা', তোমার হাত ধ্বংস হউক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রতি আবু লাহাবের এরূপ রুঢ় ব্যবহার ও অসদাচরণের প্রতি উত্তরে এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে আশ্বস্ত করার জন্য সুস্পষ্টভাবে আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করে আল্লাহতায়ালা সূরা 'লাহাব' নাজিল করে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'হে রাছুল (ছাঃ) আপনার হাত নয়, বরং আবু লাহাবের হাতই- অর্থাৎ সে নিজে তার ধন সম্পদসহ এবং তার কাষ্ঠ বহনকারীনি স্ত্রীও অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে'। (সূরা লাহাব)।

উল্লেখ্য যে, 'বদর' জেহাদের অনতিবিলম্বে এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে (যার দরুণ তার সন্তান সন্ততিগণও তার নিকটে ঘেষ্ত না) তার ইহ-লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ঘোরতর বিরোধীকে ধারাধাম থেকে বিলুপ করে দিয়ে তার অনিষ্ঠকর হস্ত থেকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে নিরাপত্তা দান করেন।

২। মূর্তী পূজার বিরুদ্ধে তৌহিদ তথা একেশ্বরবাদ ঘোষিত হলে মক্কার প্রধান প্রধান অবিশ্বাসী/মূর্তীপূজকেরা যেমন অলিদ বিন মুগিরা, আস বিন ওয়ায়েল, আবু জেহেল প্রমুখ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শুধু বিরোধীতাই নহে বরং প্রচন্ডভাবে তাঁকে প্রতিরোধ, অত্যাচার, উৎপীড়ন করতে থাকে। তাদের শত্রুতা ও প্রতিরোধের মুখে

www.pathagar.com

কালক্রমে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও নবদিক্ষিত মুসলমানগণের পক্ষে মক্কায় টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অলৌকিক ও অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রবীন ও নবীন কোরেশ বীর যথাক্রমে হযরত হামজা (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। এ দু'জনের ইসলাম গ্রহণের ফলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলামের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল, বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ও কুফরী তথা সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল পন্থিদের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ/পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং দুইটি ভিন্ন ধারা সুস্পষ্ঠভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এভাবে আল্লাহতায়ালা ইছলাম বিরোধী শক্তির বিপরীতে একটি ইসলামের পক্ষের শক্তি খাড়া করে দেন। ফলে পূর্বের অবস্থা থেকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর শক্তির উন্নতর হয়।

৩। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃতুর্য্যর পর চাচা আবু তালেব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর রক্ষাণাকবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ভ্রাতুস্পুত্রকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিরোধের মুখে রছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শত্রুরা তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হতো না, তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে নিজ সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন হজরত খাদিজা (রাঃ)ও যিনি রাছুল (ছাঃ) -এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারী জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শত্রুদের প্রতিরোধের মুখে, তাদের সর্বপ্রকার যাতনা, নির্যাতন ও বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সদাসর্বদা জান মাল দিয়ে সাহস ও সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন তাঁরও ইন্তিকাল হয়ে যায়। অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ দুজনেরই ইন্তেকাল হয়ে গেলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েন। এ সুযোগে কাফের/মুশরিকরাও তাঁর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা শতগুলে বৃদ্ধি করে দিল। ('বিশ্ব নবী'- গোলাম মোস্তফা)। ফলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে থাকেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কার বিকল্প হিসাবে সেখান থেকে ৭০/৮০ মাইল দূরে 'তায়েফে' ইসলাম প্রচারের জন্য ২য় ফ্রন্ট খোলার মানসে তাঁরই পালক পুত্র যায়েদ-বিন-হারেসাকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু তায়েফও ছিল মক্কার ন্যায় অবিশ্বাসী মুর্তিপূজকদের শক্ত ঘাটি। তায়েফের কাফের/মুশরিকরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাঁকে প্রতিরোধ করতে দ্বিধা করল না। এভাবে তিনি সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হলেন। শুধু প্রত্যাখানই নহে বরং সেখানের মুর্তিপূজকেরা তাঁকে প্রত্যাঘাতও করতে থাকে। এমন কি প্রস্তরাঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিতেও তায়েফবাসীগণ ছাড়েনি। এমতাবস্থায়, তায়েফে ইসলাম প্রচারে সাময়িকভাবে বিফল হয়ে পুনরায় তিনি মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।

শত্রু পরিবেষ্টিত মক্কায় ফিরতে 'মুতইম-বিন আদী' রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর এক বন্ধ তাঁকে যথেষ্ঠ সহযোগিতা প্রদান করেন। মক্কায় ফিরে এসে তিনি বিভন্ন গোত্র এবং বহিরাগতদের নিকটও ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে চেষ্টিত হন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই কাফের/মুশরিকদের ঘোর বিরোধীতা ও বাঁধার কারণে লোকজনের মধ্য থেকে আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছিলেন না। এরূপ একটা নাজুক, অস্বস্তিকর ও রুদ্রময় পরিস্থিতিতে আল্লাহর এ ঘোষণা "তোমর প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে.

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর (উন্নত থেকে উন্নতর) করে দেয়া হয়েছে" বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দূরে বা নিকটে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা অবশ্যই অব্যর্থ। এর বাস্তাবায়ন বিলম্ব হলেও ইহা যে কোন না কোন সময় বাস্তবায়িত হবে এতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সংগী সাহাবীরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত।

হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন মক্কায় আসত। উল্লেখ্য যে, প্রাক-ইসলাম যুগেও মক্কায় এ রীতি প্রচলিত ছিল। হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদাই বহিরাগতদের মধ্যেও ইছলাম প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কাফের/মুশরিকদের প্রবল বিরোধীতার মুখে এবং বিপরীত ধর্মী প্রচারণায় অনেক সময় তিনি কাংক্ষিত ফল লাভ করতে পারতেন না যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

একবার হজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে কিছু সংখ্যক লোক আসলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার পার্শ্ববর্তী এক উপত্যকায় (আকবায়) তাদের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন এবং তিনি যে আল্লাহর রাছুল এবং তাঁর উপর যে অহী/কোরআন নাজিল হচ্ছে তাঁর কিছু অংশ পড়ে শুনালে তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটিই ইসলামের ইতিহাসে 'আকাবার প্রথম বায়াত' নামে পরিচিত। এভাবে ইছলাম মদিনায় প্রবেশের দ্বার উম্মুক্ত হলো এবং ইছলাম ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অবস্থাও উন্নতির দিকে এক ধাপ অগ্রসর হলো।

৫। পরবর্তীতে আরো দুই দুইবার মদীনা থেকে আরো অধিক সংখ্যক লোকজন এসে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে একই স্থানে সংগোপনে সাক্ষাৎ করে ইছলাম গ্রহণ করেন এবং জীবনে-মরনে সর্বাবস্থায়, সর্ববিষয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে সর্বাত্মক সাহায্য/সহযোগিতা করবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ (বায়াত) হলেন। তাঁরা হজরত (ছাঃ) -কে মদীনায় হিজরত করার জন্যও আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে সাহাবাগনকে মদীনায় হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নিজে হিজরতের জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন।

অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে প্রাপ্ত হয়ে তিনিও শত্রুদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র, বাঁধা/বিপত্তি অতিক্রম করে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপস্থিতি মদীনার লোকজনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো মক্কা ও তায়েফের বিরুদ্ধবাদীদের বিকল্প হিসাবে মদীনাকেই যেন আল্লাহতায়ালা ইসলামের ঘাটি হিসাবে মনোনীত করেছেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মক্কায় অবস্থান কালীন অবস্থা, পরবর্তীতে মদীনায় অবস্থানকালীন অবস্থার তুলনায় নিঃসন্দেহে শেষোক্ত অবস্থা উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

৬। **এক হাজার বনাম ঃ তিনশত তের ঃ** মদিনায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলামের শক্তির বৃদ্ধি মক্কার কাফের/মুশরিকদের নিকট ছিল অসহনীয়। তাছাড়া, বর্হিদেশের সহিত মক্কার বাণিজ্যিক পথ মদীনা ঘেষেই গিয়েছে। পরবর্তীতে মদীনায় মুসলমানদের শক্তি অর্জনের পর যদি তাঁরা তাদের বাণিজ্যিক পথ অবরোধ করে বসে সে আশংকাই

www.pathagar.com

তাদেরকে আরো শংকিত করে তুলে ছিল। ফলে মক্কার ন্যায় মদীনায়ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই ইসলামকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার মানসে আবু জেহেলের নেতৃতে ১০০০ লোকের এক সশস্ত্র বাহিনী মদীনার সন্নিকটে "বদর" নামক প্রান্তরে এসে সমবেত হল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও ৩১৩ জন সাহাবা নিয়ে অগ্রসর হলেন। এক হাজারের মোকাবেলায় মাত্র তিনশত তের। সংখ্যার বিচারে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অচিন্তনীয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এই মুষ্টিমেয় নিবেদিত প্রাণ মুসলিমদের হাতেই কাফের/মুশরিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হল। তাদের প্রধান প্রধান নেতারা নিহত হল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করলেন। মাত্র এক বৎসর পূর্বেও যেখানে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাতো দূরের কথা, ঘাতকদের হাত থেকে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকাও ছিল কঠিন, সেখানে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা ছিল একেবারেই অচিন্তনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহর ইচ্ছায় এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হল। নিশ্চয়ই ইহাও আল্লাহর পূর্ব্ব ঘোষণা মোতাবেক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর পূর্বাবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর করে দেয়ার একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

৭। **তিন হাজার বনাম সাতশত ঃ** পরের বছরের ঘটনা। ওহোদ প্রান্তরে এবার তিন হাজারের বিরুদ্ধে সাতশত। বদরে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে এবার আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তিন হাজারের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কার কাফের/মুশরিকরা মদীনার অদূরে ওহোদ নামক প্রান্তরে সমবেত হল।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং সেনাপতির বেশে এক হাজার লোকের এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেও পথিমধ্যে তিন শত মোনাফেক কেটে পড়ল। পরিশেষে বাকী সাতশত নিবেদিত প্রাণ সহচরদের নিয়েই জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। বিপক্ষে ছিল ২শত অশ্বারোহী সহ প্রায় ৪ গুন বেশী সৈন্য ও অস্ত্র-সস্ত্র। অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গিরিপথ রক্ষার জন্য ৫০ জন মুজাহিদকে নিয়োজিত করে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, কোন অবস্থাতেই যেন তাঁরা সেই গিরিপথ ত্যাগ না করে। যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায়ই মুসলমানদের তীব্র আক্রমনে কাফের মুশরিকরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে দ্রুতবেগে পালাতে শুরু করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হল এ যেন "বদরের" পুনরাবৃত্তি। এমতাবস্থায়, গিরিপথ রক্ষাকারীগণ মনে করল কাফের/মুশরিকরা পরাজিত হতে চলেছে। কাজেই তাদের ফেলে যাওয়া মালামাল সংগ্রহ করার ইহাই মোক্ষম সময়। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই পলায়নপর শত্রুদের পরিত্যজ্য মালামাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। আর এ অবস্থার পূর্ন সদ্ব্যবহার করলো শত্রুদের অশ্বারোহী বাহিনীর তখনকার সেনাপতি খালিদ-বিন-ওয়ালিদ। পরবর্তী কালে খলিফাদের আমলে বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি খালিদ-বিন-ওয়ালিদ যাকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর অসি উপাধিতে ভূষিত করে ছিলেন, তিনি অরক্ষিত গিরিপথের মধ্য দিয়ে পেছন দিক থেকে এসে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসল

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনীর উপর। পিছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমনে যা হবার তা-ই হল। মুসলমানেরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হল। ক্ষয়ক্ষতিও হল অনেক। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হলেন।

পরবর্তীতে ওহোদ যুদ্ধোপলক্ষে কোরআনে কতিপয় আয়াত নাজিল করে আল্লাহতা'য়ালা ওহোদ যুদ্ধটি সংগঠনের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন যা থেকে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের জন্য ওহোদ যুদ্ধ ছিল একটি পুরোপুরি সাজানো পরীক্ষা ক্ষেত্র। আপততঃ দৃষ্টিতে পরাজয় মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে তাঁদের তেমন কোন পরাজয় হয় নাই। (বোখারী শরীফ/সীরাতুন্নবী (আল্লামা শিবলী নোমানী/বিশ্বনবী (গোলাম মোস্তফা)। জয় বা পরাজয় না হলেও ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শিক্ষা হয়েছিল যথেষ্ঠ, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে বিশ্ব বিজয়ে মুসলমানেরা একই গর্ত থেকে দ্বিতীয়বার দংশিত হননি।

৮। **'ফাতহাম মুবিন' 'ফাতুহুন আযীম'- সুস্পষ্ট (মহা) বিজয় ঃ** (সূরা আল-ফাতহ)। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক স্পপ্নে দেখা "ওমরা" পালন বাস্তবায়ন উপলক্ষে ১৪০০ চৌদ্দশত সাহাবা সমেত মক্কার উপকণ্ঠে 'উসফান' নামক স্থানে উপনীত হয়ে যখন সংবাদ পেলেন যে মক্কা প্রবেশে কাফের/মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) গতিপথ কিছুটা ভিন্নতর করে "হোদায়বিয়া" (বর্তমান নাম সুমাইসিয়া) নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানেও জানা গেল যে শান্তিপূর্ণভাবে ওমরা পালনার্থীদেরকে নিষিদ্ধ মাসেও মক্কার অবিশ্বাসীরা বাঁধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাদের কতিপয় অশুভ তৎপরতার (যেমন হজরত ওসমান (রাঃ) কে নিহত করে দেযার খবর ছড়িয়ে পড়া) ফলে ঘোরতর অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এরূপ অবস্থায় সংঘর্ষ আসন্ন ভেবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সফর সংগীগণ সকলে সম্মিলিতভঅবে কাফের/মুশরিকদের বিরুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও প্রতিরোধ করার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে এরূপ এক 'বায়াত' বা 'অঙ্গীকারাবদ্ধ' হলেন। এ বায়াতকেই ইতিহাসে বায়াতে 'রেদুয়ান' বলা হয়ে থাকে। অবশেষে অনেক কথার্বাতা ও বাকবিতন্ডার পর কয়েকটি শর্ত বিশিষ্ট ১০ বৎসর মেয়াদী একটি চুক্তি বা সন্ধিতে উপনীত হওয়া গেল। ইতিহাসে ইহাই "হোদায়বিয়ার" সন্ধি নামে খ্যাত।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আপততঃ দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটি একটি অসম চুক্তি বলেই মনে হলো। সাহাবীদের অনেকেই বিশেষ করে হজরত ওমর (রাঃ) সন্ধির শর্তাবলীতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তিনি বার বার অসন্তুষ্টির মনোভাব প্রকাশ করতে ছিলেন। উল্লেখ্য যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কাজই বা কোন কথাই নিজ থেকে বলেন না বা করেন না (সূরা নজম আয়াত-৩)। এ চুক্তিও তিনি আল্লাহর নির্দেশেই করেছেন। চুক্তি সম্পাদন শেষে রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাহাবা সমেত ফিরতেছিলেন। পথিমধ্যে "কুরাউল গায়িম" বা "দাজনান" নামক স্থানে সূরা "আল ফাত্হ্" নাজিল হল। যার শুরুতেই আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "ইন্না ফাতাহ্ না

www.pathagar.com

লাকা ফাতহাম মুবিন"। অর্থাৎ (হে রাছুল) নিশ্চয় আপনাকে স্পষ্ট (মহা) বিজয় দান করা হয়েছে।) এই সূরা নাজিল হবার পর পরই রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্ত সাহাদেরকে ডেকে এনে একত্র করে, বিশেষ করে হজরত ওমর (রাঃ) উদ্দেশ্য করে এ আয়াত/সূরাটি পড়ে শুনিয়ে দিলেন। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন- সংক্ষেপিত)।

এ চুক্তির সুদূর প্রশারী ও বিস্তারিত ফলাফল এ ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা য়ায় যে, এ চুক্তির বদৌলতে ইসলামী ও কুফরী এ দুইটি যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি তা পরস্পর স্বীকৃতি পেল এবং পর বৎসরে মুলতবী "ওমরা হজ্জ" পালন সহ ১০ বৎসরের জন্য শান্তি স্থাপিত হবার সুবাদে মুসলমানেরা ধনে, জনে বলে, প্রচারে প্রসারে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হল। তাছাড়া, পরবর্তীকালে "মক্কা বিজয় সহ" বিশ্ববিজয়ে এ চুক্তির অবদান যে ছিল অপরিসীম সে সম্পর্কে সাহাবাগণের মনে কোন সন্দেহ ছিলনা। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাহাবাগণ যেমন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হজরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন- 'তোমরা মক্কা বিজয়কে মহাবিজয় বল, অথচ আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই আসল মহা বিজয় বলে মনে করি।' (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন ১৫ খন্ড), (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পুর্বেকার রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের অবস্থা, সন্ধি পরবর্তী কালের অবস্থার তুলনামুলক বিচারে নিঃসন্দেহে পরবর্তী অবস্থা, উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর। ইহা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার আরেকটি প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন।

৭। **মক্কা বিজয় ঃ** পরবর্তীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গসহ মক্কার কাফের/মুশরিকরা বিভিন্নভাবে অশুভ তৎপরতা চালিয়ে মুসলমানগণকে উত্যক্ত করতে থাকে। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ভাবলেন তাদের এসব অপতৎপরতা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যায় না। ফলে তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অনতিবিলম্বে রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ সহস্র মুজাহিদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য বহির্গত হলেন। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) যে এত দ্রুত এবং এত বড় বিরাট বাহিনীকে নিয়ে মক্কায় তাদের দরজায় উপস্থিত হবেন তা ছিল মক্কার কাফের/মুশরিকদের কল্পনার অতীত। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রতিরোধ তো দূরের কথা তাদের উপর কি শাস্তি নেমে আসছে তা ভেবেই সর্বক্ষণ অস্থির। এভাবে প্রায় বিনা যুদ্ধেই রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয় করলেন।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বেশী দিন নয় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেই রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় তায়েফ গমন করেছিলেন এবং সেখানে থেকে চরমভাবে নিপিড়ীত ও উৎপীড়িত হয়ে এসে কিভাবে শত্রু ঘেরা সেই মক্কায় পুনঃ প্রবেশ করবেন যা ছিল তাঁর জন্য এক ভয়ানক দুর্ভাবনা ও চরম উৎকণ্ঠা ও মর্মপীড়ার কারণ। সেদিন কেহই যখন তাঁকে মক্কায় আশ্রয় দিতে রাজী হচ্ছিল না, তখন একমাত্র মুতএম নামক এক হৃদয়বান ব্যক্তির আশ্রয়ে, একমাত্র সংগী যায়েদ বিন- হারেস কে নিয়ে কোন প্রকারে মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা পূর্বেই

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়েছে। (বিশ্বনবী গোলাম মোস্তফা)। তাছাড়া, যে ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি নিজ জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে অবস্থাটাও তো সকলের চোখের সামনেই। আজ দশ সহস্র মর্দে মুমিন বীর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সেই একই মক্কায় প্রবেশ করলেন। তায়েফ থেকে তখন মক্কায় প্রবেশ, আর এখন মদীনা থেকে মক্কায় প্রবেশ, এই দুই প্রবেশের মধ্যে কি আসমান ও জমিন প্রভেদ নহে?

ইহা তো রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে আল্লাহর দেয়া আগাম প্রতিশ্রুতি "তোমার প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়া হবে" -এ ঘোষণার আরও একটি বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকর বাস্তবায়ন।

৮। **হোনাইনের জ্বেহাদ ঃ এবার বার হাজার ঃ** মক্কা বিজয়ের পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বাঁধা দৈয়ার মত সেরূপ শক্তিশালী আর কেহই রইল না। মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল স্বরুপ বিভিন্ন গোত্র থেকে দলে দলে লোকজন এসে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু মক্কার অদুরে 'হাওয়াযেন' নামে এক যুদ্ধবাজ গোত্র ছিল। যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলে তারা নিজেদের উপর অতিমাত্রায় আত্ম গৌরব, অহংকারীত্ব বিদ্যমান ছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। ফলে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য তাদের মধ্যে জাগলো এক প্রতিহিংসা। সে মতে প্রস্তুত হতে লাগলো। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই সংবাদ পেয়ে মক্কা বিজয়ের সময়কার ঐ দশ হাজার এবং নব-দীক্ষিত আরও দুই হাজার সেনা সমেত মোট বার হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদেরকে জব্দ করার জন্য অভিযানে অগ্রসর হলেন। 'হোনায়েনের' নিকটবর্তী হলে সন্নিকটেই বিভিন্ন গিরিঘাটিতে লুক্কায়িত শত্রুরা আকস্মিকভাবে চলমান মুসলিম মুজাহিদদের উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে তাদের মধ্যে প্রাথমিক ভাবে একটা বিশৃংখলা দেখা দেয়। প্রধানতঃ নবদীক্ষিত অদক্ষ মুসলিম সেনানীরা যারা অগ্রভাগে ছিল তাদের দৃঢ়তার অভাবের কারণেই মুসলমানদের মধ্যে সাময়িক বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রাথমিক বিপর্যয়ের রেশ কেটে উঠার পর মুসলমানেরা পুনঃ একত্রিত হয়ে সম্মিলিত আক্রমনের দ্বারা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত করে দেন। তাদের নিকট থেকে অপরিমেয় গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ মাল) মুসলমানদের হস্তগত হয়। এখানেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর অবস্থা পূর্ববস্থা থেকে অনেক উন্নততর শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত হয়।

৯। **তবুক অভিযান ঃ এবার ত্রিশহাজার ঃ** রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক পরিচালিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ জ্বেহাদ সমূহের মধ্যে 'তবুকের' জ্বেহাদ অন্যতম। ইহাই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ জ্বেহাদ। উত্তরে মদীনা থেকে প্রায় তিনশত মাইল দূরে অবস্থিত 'তবুক' নামক স্থানে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস বা 'হেরাকল' উদিয়মান মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মদীনা আক্রমণের প্রয়াসে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে। সংবাদ

www.pathagar.com

পেয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও জেহাদের ডাক দেন এবং মদীনার সমস্ত সক্ষম মুসলমানদেরকে এ জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন এবং সেই সাথে সকলকেই যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানের জন্যও আহ্বান জানালেন। তখন মদীনায় প্রচন্ড গরম ও দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছিল। তা'ছাড়া বহু দূরের সফর, লোকজন এবং যানবাহনের সংখ্যা স্বল্পতাও ছিল প্রকট। এতদসত্বেও হিজরী নবম সনের রজব মাসে দশ সহস্র অশ্বারোহীসহ ত্রিশ হাজারের এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। তাঁদেরকে নিয়ে স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই অভিযানে যাত্রা করেন। (বোখারী শরীফ, ৩য় খন্ড)।

উল্লেখ্য যে, রোম সম্রাটের সাহায্য সহায়তায় ও অনুগ্রহে "গাচ্ছান" বংশের লোকেরা তখন সিরিয়ায় রাজত্ব করছিল। হেরাক্লিয়াস কর্তৃক তাদেরকে দিয়েই মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটানোর সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।

তাদের এরূপ ভয়ানক দূরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে মদীনার দিকে অগ্রসর হবার পূর্বেই বাঁধা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ফলে তিনি তাঁর উল্লেখিত বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়ে "তবুক" নামক স্থানে পৌছলেন। কারণ শত্রু পক্ষের সাথে ঐ স্থানেই মোকাবেলা হবে বলে পূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।

এদিকে শত্রুপক্ষ যখন জানতে পারলো যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত, তখন তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো এবং যুদ্ধসাধ মিটে গেল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে মোকাবেলা করার সাহস ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে দীর্ঘ বিশ দিন (মতান্তরে আরও কম বা বেশী দিন) অবস্থান করলেন। অবশেষে তাদের টিকিটিও যখন দেখা গেল না তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

সূরা আদ-দোহার উপরোক্ত আয়াতের তরজমা ও তফসীর থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহতা'য়ালা যখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে তাঁর প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর এবং উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম করে দেয়ার ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি দেন তখন ইহা বাস্তবায়নের অবস্থা বা পরিবেশ মোটেই অনুকূল ছিল না, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কালক্রমে পরিস্থিতি এমন প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, মক্কায় জীবন নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন ছিল। এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) শত অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে প্রথম বার তায়েফে গমন এবং দ্বিতীয় বার মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই রাছুল (ছাঃ)-ই এখন পাঁচ হাজার নয়, দশ হাজার নয়, ত্রিশ হাজার জলিল ক্বদর

www.pathagar.com

মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রোমান বাহিনীকে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা উন্নত থেকে উন্নতর, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দেয়ার আল্লাহর আগাম ঘোষণা পর্যায়ক্রমে/ধারাবাহিকভাবে এবং অতি চমকপ্রদভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করলে ইহা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)- কে ধাপে ধাপে এবং পর্যাযক্রমে সমস্ত বাঁধা-বিপত্তি, অত্যাচার, অনাচার, নিপীড়ণ, উৎপীড়ন, অবরোধ-প্রতিরোধ এর মধ্য দিয়েই তাঁর অবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে দিয়েছেন যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

আল্লাহর কোন ঘোষণাই ব্যর্থ হবার নহে বরং উহা অনিবার্য ও অপরিহার্য রূপেই বাস্তবায়নযোগ্য। উল্লেখিত তফসীর সমূহ থেকে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণাটিও তেমনিভাবে অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছিল যা তিনি (ছাঃ) সাহাবাগণসহ নিজ জীবনে নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। এভাবে পরকালে যা বাস্তবায়িত হবার তা পরকালেই বাস্তবায়িত হবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে "কাওসার" -তথা অনন্ত, অসীম, অশেষ কল্যান ও নিয়ামত প্রদানের আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির প্রাথমিক অবস্থায় মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তৌহিদ তথা একশ্বরবাদের ঘোষণা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জন্য এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতি ডেকে আনে। তদোপরি শৈশবেই তাঁর পুত্র সন্তানদের ইন্তিকালের কারণে কাফের মুশরিকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে নানাভাবে যেমন, 'লেজকাটা', 'নির্বংশ' ইত্যাদি বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে, যার ফলে তিনি কতকটা মর্মাহত ও হতাশ হয়ে পড়েন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে সান্ত্বনা দিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, **"(হে নবী) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওসার' প্রদান করেছি" (সূরা কাওসার আয়াত-১)** অর্থাৎ আপনাকে অফুরন্ত, অশেষ কল্যাণ, মঙ্গল ও নিয়ামত দিয়েছি, এমন নিয়ামত দুনিয়ার আর কাহাকেও দেয়া হয় নাই।

সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ **"হে নবী নিশ্চয়ই আপনাকে কাওসার প্রদান করেছি" (সূরা কাওসার - আয়াত-১)।**

(ক) সূরাটি নাজিলের সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর অবস্থা) ঃ এই সূরাটি যখন নাযিল হয় তখন নবী করীম (ছাঃ) অত্যন্ত কঠিন হতাশাব্যঞ্জক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন। নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় (মূর্তিপূজার বিপরীতে এক আল্লাহর উপাসনা করার তথা- একশ্বেরবাদের ঘোষণা দিলে সমগ্র দেশই তাঁর বিরোধীতা শুরু করে দেয়। ফলে নবী করীম (ছাঃ) অত্যন্ত কঠিন বিপদ ও জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে ছিলেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গোটা জাতিই তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করার জন্য হয়েছিল বদ্ধপরিকর। যে দিকে তিনি তাকাতেন সে দিকেই প্রবল বিরোধীতা তাঁকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী সাথী দূরে দূরেও কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের কোন লক্ষন দেখতে পাচ্ছিলেন না। এরূপ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নবী করিম (ছাঃ) -কে সান্ত্বনা দেয়ার ও তাঁর মধ্যে সাহস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ উপরোক্ত সূরা নাজিল করে সুস্পষ্ট ভাবে আগাম জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই, কারণ তাঁকে 'কাওসার' তথা অফুরন্ত অশেষ কল্যান ও মংগল দান করা হয়েছে। শুধু তা-ই নহে বরং এ সূরা নাজিল করে আল্লাহ তায়ালা একদিকে নবী করীম (ছাঃ)কে সান্ত্বনা দিয়েছেন, অপর দিকে শত্রুপক্ষের চরম ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাবার সুসংবাদও দিয়েছেন।

সে সময় কুরাইশ কাফেররা বলত "মুহাম্মদ সমগ্র জাতি থেকে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর এখন নিতান্ত বন্ধু বান্ধবহীন অসহায় ও নিরুপায় অবস্থা।" এ প্রসংগে ইকরামার বর্ননা হল- কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (ছাঃ) -কে বলত 'দুর্বল, অসহায়, নিরুপায় ও নিঃসন্তান এবং নিজ জাতি থেকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি' (ইবনে জরীর)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) এর পুত্র

www.pathagar.com

সন্তানদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন কাশেম (রাঃ)। তাঁর ছোট ছিলেন আব্দুল্লাহ (রাঃ)। সর্ব প্রথম কাশেমের (রাঃ) ইন্তেকাল হয়। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর ইন্তেকালের সময় মক্কার এক কট্টর কাফের সরদার, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ঘোর বিরোধী 'আস্ বিন ওয়ায়েল' বলেছিল ঃ 'মুহাম্মদ আবতার। তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন পুত্র সন্তান আর কেহ নাই। সে যখন মরে যাবে, তখন তাঁর চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে যাবে এবং তাঁর কারণে তোমরা যে অসুবিধায় পড়েছ তা থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পারবে।'

আব্দ ইবনে হুমাইদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যে বর্ণনা উদ্ধৃত করছেন তা থেকে জানা যায়, নবী করীম (ছাঃ) -এর পুত্র আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হলে আব জেহেলও এ ধরনের কথাই বলেছিল। ইবনে আবু হাতিম, শিমর ইবনে আতীয়া থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) -এর এই মর্মন্তুদ দুঃখে উকবা ইবনে আব মুয়ীত আনন্দের উৎসব করে চরম নীচতার পরিচয় দিয়েছিল। আতা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) -এর দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তেকাল হলে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব (নবী করীম (ছাঃ) -এর ঘরের সঙ্গেই লাগানো ছিল তার ঘর) দৌড়ে মুশরিকদের নিকট চলে গেল এবং তাদেরকে সু-সংবাদ (?) দিয়ে বলল ঃ আজ রাত্রে মুহাম্মদ 'আবতার' পুত্রহীন হয়েছে (বা তার শিকড় কেটে গিয়েছে)।

নবী করীম (ছাঃ) -এর এই মর্মবিদারক অবস্থার মধ্যেই সূরা 'কাওসার' তাঁর প্রতি নাজিল হয়। তিনি যেহেতু কেবল মাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী ও ইবাদত করতেন, কাফেরদের মুশরিকী আকীদা-আচরণকে তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করেছিলেন, কেবল্ মাত্র এ কারণেই সমস্ত কুরাইশ রাছুলের (ছাঃ) -এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে সমগ্র জাতির মাঝে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল, তা-ও কেড়ে লওয়া হয়। তিনি যেন গোটা সমাজে একজন পরিত্যক্ত ও আত্মীয়হীন ব্যক্তি। তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথীও সম্পূর্ন অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়লেন। চারিদিক থেকে তাদেরকে বিতাড়িত ও প্রপীড়িত করে তোলা হয়। উপরন্ত নবী করীম (ছাঃ) -এর পুত্র একজনের পর আর একজনের মৃত্যুতে তাঁর উপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। এরুপ অবস্থায় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে সহানুভূতি ও আন্তরিকতা জেগে উঠার পরিবর্তে তারা যেন আনন্দের অতিশয্যে ফেটে পড়ল। যে লোক কেবল আপনজনেরই নয়, অনাত্মীয় লোকদের প্রতিও যারপর নাই সহানুভূতিমূলক আচরণ করেছেন, এমন এক মহান ব্যক্তির প্রতি এরূপ আরচণ তাঁর মন ভেঙ্গে দেবার জন্য যাথেষ্ট ছিল। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'য়ালা এক সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রকায় সূরা নাযিল করে নবী করীম (ছাঃ)কে একটি অতিবড় সুসংবাদ দিলেন। এ ছোট্ট সূরার একটি বাক্যে তাঁকে যে সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে, অনুরূপ সুসংবাদ দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিনই দেয়া হয়নি। সে সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও শুনানো হল যে, আপনি 'শিকড়কাটা' বা 'লেজকাটা' নন, প্রকৃত নির্বংশ ও শিকড়কাটা তো আপনার শত্রুরা, আপনার বিরুদ্ধবাদীরাই। ('ইন্না শানিয়া লাকা হুয়াল আব্তার')।

www.pathagar.com

'কাওসার' শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উহার পূর্ন অর্থ, ভাব ও তাৎপর্য আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা, সম্ভবত দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায়ই একটি শব্দে তরজমা করা সম্ভবপর নয়। 'কাওসার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'সীমাহীন আধিক্য, অসীম বিপুলতা'। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে নিছক আধিক্যই বুঝায় না, বরং কল্যাণ, মঙ্গল ও নিয়ামত সমূহের ব্যাপক আধিক্য ও বিপুলতাই বুঝায়। উহাতে এমন বিপুলতার ভাব নিহিত আছে, যা প্রাচুর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। কাজেই উহার অর্থ কোন একটি কল্যান-মঙ্গল বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ, সুবিপুল মঙ্গল ও নিয়ামত সমূহের অশেষ প্রাচুর্যই ইহার অর্থ।

উল্লেখ্য যে, তখন রাছুলে করীম (ছাঃ) এর বৈষয়িক অবস্থা ছিল যারপর নাই খারাপ। শত্রুরা মনে করত যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) সর্বদিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জাতির লোকজন থেকে সম্পূর্ন নিঃসম্পর্ক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সহায়-সম্বল, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবহীন হয়ে পড়েছে। ব্যবসা অচল হয়ে গিয়েছে। একজন সন্তান ছিল, যার দ্বারা অধঃস্তন বংশ চলত ও নাম বেঁচে থাকত, কিন্তু সেও চলে গেল। অথচ তিনি এমন এক আদর্শ প্রচার শুরু করেছেন যা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছাড়া মক্কা-ই শুধু নয়, সমগ্র আরবদেশে তা শুনবার জন্য কেহই প্রস্তুত নয়। কাজেই জীবদ্দশাতেই ব্যর্থতা ও হাতাশা ছাড়া তাঁর অদৃষ্টে আর কিছুই লিখিত নেই। ফলে মৃত্যুর পর তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেহ দুনিয়ায় থাকবে না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'য়ালা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি।' ইহা থেকে স্বতঃই প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ যেন বলতেছেন ঃ 'তোমার বিরুদ্ধবাদীরা নির্বোধ। তারা মনে করে নিয়েছে, তুমি ধ্বংস ও সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছ। নবুয়তের পূর্বে যে সব নিয়ামত তোমার করায়ত্ত ছিল, তাও তোমার নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের এ কথা আদৌ সত্য নয়। তাদের ধারণা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন ও স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত সত্য কথা এই যে, আমি তোমাকে সীমাহীন কল্যান ও অসংখ্য ও অপরিমেয় নেয়ামত দানে ধন্য করেছি।' এই নিয়ামত ও কল্যানের মধ্যে দৃষ্টান্তহীন বৈশিষ্ট্য অন্যতম। নবী করীম (ছাঃ) উৎকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যপূর্ন নৈতিক চরিত্রে বিভুষিত ছিলেন। নবুয়াত, কুরআন, জ্ঞান, কর্মকুশলতা ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির ন্যায় অমূল্য নিয়ামত নবী করীম (ছাঃ)কে দান করা হয়েছিল। তাঁকে তাওহীদের বিপ্লবী আকীদা এবং উহার ভিত্তিতে রচিত এক পূর্নাংগ জীবন-বিধানও দেয়া হয়েছিল। এই জীবন বিধানের সহজ-সরল, সাধারন বোধ্য, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব নিয়ম সম্মত ব্যাপক ও সর্বাত্মক আদর্শ ও আইন-বিধান সমগ্র জগতে বিস্তার লাভ করার ও চিরদিন বিস্তার লাভ করতে থাকার যোগ্যতা সম্পন্ন।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (ছাঃ) -এর উল্লেখ-ধ্বনিকে সর্ব্বোচ্চ করে তোলার নিয়ামতও অনন্য সাধারণ ছিল। ইহার দরুন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি চৌদ্দ শত বৎসর পর্যন্ত দুনিয়ার দিকে দিকে ও কোণে কোণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বনিত হতেই থাকবে। নবী করীম (ছাঃ) -এর দাওয়াতী চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা-সম্পন্ন উম্মাত গড়ে উঠেছিল। এই উম্মাত দুনিয়ায়

www.pathagar.com

চিরদিনের জন্য সত্যদ্বীনের ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়াল। এই উম্মাতের লোকদের অপেক্ষা অধিক নেক-চরিত্র ও উচ্চ মানবিক মূল্যমান সম্পন্ন মানুষ দুনিয়ার অপর কোন জাতি আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি। এই উম্মাতে মুহাম্মদী বর্তমানে বিপর্যয়ের চরম সীমায় উপনীত হয়েও দুনিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় এখনও অধিক কল্যাণের অধিকারী, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রাছুলের প্রতি প্রদত্ত ইহাও আল্লাহ তায়ালার-ই দেয়া একটি বড় নিয়ামত। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর দ্বীনি দাওয়াতের পরম সাফল্য নিজ চক্ষেই দেখতে পেরেছেন। তাঁর নিজের চেষ্টায়ই একটি বিরাট জন-সংস্থা, একটি জাতি সমগ্র দুনিয়ায় বিস্তার লাভের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ামতেরও কি কোন তুলনা হতে পারে?

নবী করীম (ছাঃ) পুত্র সন্তান হতে বঞ্চিত ছিলেন। ফলে শত্রুরা মনে করেছিল, তাঁর নাম চিহ্ন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু (বিকল্প হিসাবে) আল্লাহ-তা'য়ালা মুসলমানদেরকে (উম্মাতে মুহাম্মদীকে) তার আধ্যাত্মিক সন্তানরূপে দান করলেন। তাঁর এই সন্তানরা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জগতে তার নাম উজ্জল থেকে উজ্জলতর করতে থাকবে। শুধু ইহাই নহে, নবী করীম (ছাঃ) -এর একমাত্র কন্যা-সন্তান হযরত ফাতিমা (রাঃ) -এর মাধ্যমে ঔরসজাত সন্তান ও বংশধরও তাঁকে দেয়া হয়েছে। এই সন্তানরা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নবী করীম (ছাঃ) -এর সহিত তাঁদের এই রক্ত সম্পর্কই হল তাঁদের একমাত্র গৌরব সম্পদ।

এই নিয়ামতসমূহ দুনিয়ায় লোক চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে। উপরন্তু এ নিয়ামতসমূহ নবী করীম (ছাঃ)-কে যে বিপুল প্রাচুর্য সহকারে দেয়া হয়ে ছিল, তাতে কারও এক বিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, 'কাওসার' অর্থ এমন দুইটি বড় বড় নিয়ামত, যা পরকালীন জীবনে আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে তাঁকে দিবেন। সেই নিয়ামত সম্পর্কে জানবার কোন উপায় আমাদের ছিল না। নবী করীম (ছাঃ)-ই সেই বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সে দুইটি নিয়ামতও এই 'কাওসার' এর মধ্যে শামিল। এ দুইটির একটি হল 'হাওযে কাওসার'। ইহা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তাঁকে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয়টি হল 'নহরে-কাওসার' – কাওসার ঝর্ণাধারা। ইহা তাঁকে জান্নাতে দেয়া হবে। এ দুইটি নিয়ামত সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্নিত হয়েছে। এই হাদীসসমূহ এত বেশী সংখ্যক বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহার যথার্থতা সম্পর্কে এক বিন্দু সন্দেহের উদয় হতে পারে না। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন, ১৯শ খন্ড - সংক্ষেপিত)।

(খ) কওসর-অনন্ত, কল্যাণ, অসংখ্য সম্পদ অথবা অনুপম সুমিষ্ট সলিলপূর্ন স্বর্গীয় নদী বা সরোবর। আল্লাহতায়ালা বলে দিলেন যে, অবিশ্বাসীরা পার্থিব ধন-সম্পদ, পুত্র-সন্তান ও 'জমজম' কুপের গর্ব করছে, কিন্তু উহা তো অনিত্য ও অচিরস্থায়ী। আমার রাছুলকে আমি উহার বিনিময়ে 'কওসর' অর্থাৎ অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য সন্তান ও অফুরন্ত সম্পদ দান করেছি এবং তাঁকে আমার মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 'ইসলাম', আমার

www.pathagar.com

পবিত্র বাণী 'কোরআন' ও অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-পদে অভিষিক্ত করেছি। এতদ্ভিন্ন পরলোকে তাঁরই উম্মত বা অনুগামী সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হবে এবং একমাত্র তিনিই আল্লাহর নিকট 'শাফায়াত' বা মুক্তি প্রার্থনার অধিকারী হবেন। এতদ্ভিন্ন একমাত্র তিনিই স্বর্গের (জান্নাতের) সুমিষ্ট সলিলপূর্ন 'কাওসার' নামক নদী (ঝরনা), হাউস বা সরোবরের আধিপত্য লাভ করে উহা থেকে সমস্ত স্বর্গবাসীকে (জান্নাতবাসীকে) চিরশান্তিময় ও পরম তৃপ্তিকর 'আবে কাওসার' পান করাবেন। মানুষের ইহ-পরলৌকিক জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চপদ, উচ্চতম মর্যাদা, অনুপম গৌরব ও অতুলনীয় সম্পদ আর কি হতে পারে? (তঃ কবির, হক্কানী ও আজিজী) (তফসীরে কোরান শরিফ)।

আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি। অর্থাৎ দান করা হয়ে গিয়েছে। ইহা আল্লাহতা'য়ালার ঘোষনার একটি নমূনা, প্রকৃতি বা ষ্টাইল। যেহেতু দেয়ার কাজটা অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য, সেহেতু যিনি দিবেন তিনি নির্বিঘ্নে বলতে পারেন যে, দিয়ে দিয়েছি ইহাতে অন্যথা হবার কোন সুযোগ নেই।

উপরোক্ত আয়াতটি কোরআন নাজিল শুরু হবার অতি প্রাথমিক পর্যায়ের একটি আয়াত। কোন্ পরিস্থিতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে কাওসার তথা অশেষ অফুরন্ত কল্যান নিয়ামত প্রদানের ঘোষনা দেয়া হয়েছিল পূর্বেই তার কিছু আভাস দেয়া হয়েছে। তৌহিদ বা আল্লাহ'র একত্ববাদের ঘোষনা দেয়ার ফলশ্রুতিতে চতুর্দিক থেকে বাঁধা, প্রতিরোধ, নিপীড়ন, নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মুষ্টিমেয় সাথী-সঙ্গী নিয়ে বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। পুত্র সন্তান ইন্তেকালের কারণে শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' 'লেজকাটা', 'নির্বংশ' ইত্যাদি বলে বিদ্রুপ করতে থাকে। ঠিক এহেন পরিস্থিতিতে এরূপ ঘোষনা দেয়া যে সীমাহীন/অফুরন্ত কল্যান, মংগল, নিয়ামত তাঁকে দেয়া হয়ে গিয়েছে। তা কেমন শুনায়? বিরাজমান পরিস্থিতিতে এরূপ ঘোষনা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট অতি হাস্যকর বলেই মনে হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ'র ঘোষণা অকাট্য এবং অনিবার্যভাবে বাস্তবায়নযোগ্য। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে উল্লেখিত কাওসার প্রদানের বর্ণিত আগাম ঘোষনাটিও বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, প্রতিরোধ, প্রত্যাখ্যান, নিপীড়ন, নির্যাতনকে চূড়ান্ত ভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা বর্ণিত তফসীর সমূহ থেকে সুস্পষ্ট এবং যা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিরাজমান।

www.pathagar.com

কাফের/মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধীতার মুখেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'ঝিক্‌র' তথা- তাঁর নাম, ডাক 'উল্লেখ ধ্বনি' বিশ্বব্যাপী মহিমান্বিত করে দেয়ার আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই যখন আল্লাহর নির্দেশে ঘোর পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন আরব সমাজকে এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য তথা- 'তৌহিদের' প্রতি আহ্বান জানালেন তখনই চিরাচরিতভাবে নবী রাছুলগনের আল্লাহর বিধান প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে যা হয় তাই শুরু হল। শুরু হল চরম বাধা, বিপত্তি, বিরোধীতা, প্রতিরোধ ও নির্যাতন। কালক্রমে পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হতে লাগল। অনতিবিলম্বে এমন এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যে, লোকজনকে ইসলাম গ্রহন করানো তো দূরের কথা, স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর পক্ষে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ল। এমনই এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর রাছুল (ছাঃ)কে সান্ত্বনা দান পূর্বক আগাম ঘোষনা করে দেন যে, আমি আপনার উল্লেখধ্বনী, 'ঝিকর', আলোচনা বা স্মরনকে বিশ্বময় মহিমান্বিত করে দিয়েছি (যা তারা অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে)। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণ আলোচনাকে (ঝিকর), আপনার উল্লেখধ্বনীকে সু-উচ্চকিত (মহিমান্বিত) করে দিয়েছি।" (সূরা ইনশিরাহ, আয়াত- ৩)।

অর্থাৎ আমার বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কাফের/মুশরিক/পৌত্তলিকেরা আপনার উপর যতই নির্যাতন, নিপীড়ন চালাক না কেন লক্ষ্য অর্জনে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হবে। তাদের সৃষ্ট এ বিপর্যয় সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তাদের মারাত্মক প্রতিরোধের মুখে আমি অবশ্যই আপনার 'ঝিকর' তথা- আলোচনা, উল্লেখধ্বনি, সুনাম, সুখ্যাতি বিশ্বজুড়ে মহিমান্বিত করে দেব।

তখনকার বিরাজমান চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেয়া আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষনা/প্রতিশ্রুতি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা কাহারও কল্পনায় আসছিল না। অবস্থা যেখানে দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছিল, সেখানে এরূপ ঘোষণা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট অতি হাস্যকর বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা অকাট্য, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্যভাবে কার্যকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য। পরবর্তীকালে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি কিভাবে অকাট্যভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল তা নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন তফসীর সমূহ থেকে সুস্পষ্ট। তফসীর ঃ-

(ক) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্ছে স্থাপন করেছি। অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহর নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত করা হয়েছে। এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে।' যেমন, (নামাজের খোতবায়, তাশাহুদে, আজানে, একামতে)। আল্লাহর নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহর নামের সাথে যুক্ত নামও সুখ্যাত হবে (এতে কোন সন্দেহ নেই)।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর আলোচনা উন্নত করার অর্থ এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমুলক কর্ম সমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নামও উচ্চারন করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদ সমুহের মিনারে ও মিম্বারে "আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাথে সাথে "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহও" বলা হয়ে থাকে। এছাড়া বিশ্বের যে কোন জ্ঞানী (গুনী) মানুষ তাঁর নাম সম্মান ব্যতিত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়। (তফসীরে মারে'ফুল কোরআন)।

(খ) "আর তোমারই জন্য তোমার উল্লেখধ্বনী সুউচ্চ করে দিয়েছিঃ (উপরোক্ত আয়াতটি) যখন নাজিল হয় অর্থাৎ এই কথাটি যে সময় বলা হয়েছিল, তখন কেহ চিন্তাও করতে পারত না যে, একক ও নিঃসংগ ব্যক্তির সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মাত্র রয়েছে এবং তাও কেবল মক্কা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সারা বিশ্বে কেমন করে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর সুনাম কত ব্যাপক ও সু-উচ্চ হবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহতায়ালা তাঁর রাছূল (ছাঃ) -কে এই আগাম সুসংবাদই শুনালেন। তার পরে এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সে সুসংবাদই তিনি পূর্নরূপে বাস্তাবায়িত করলেন। প্রথমতঃ তাঁর উল্লেখ ধ্বনি সু-উচ্চ করার কাজ করিয়েছেন স্বয়ং তাঁর দুশমনদের দ্বারাই। মক্কার কাফেররা নবী করিম (ছাঃ) -এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যে উপায় ও পন্থা গ্রহন করেছিল, তন্মধ্যে একটি পন্থা ছিল এই যে, হজ্জের সময় সমগ্র আরবের লোক যখন চতুর্দিক থেকে কাছিয়ে গুটিয়ে তাদের শহরে আসত, তখন কাফেরদের প্রতিনিধিদল হাজীদের এক এক তাবুতে উপস্থিত হত এবং তাদেরকে নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে দিত। তারা বলত 'মুহাম্মদ' নামে এক ভয়ানক ব্যক্তি এখানে রয়েছে যে মস্তবড় 'যাদুকর'। তাঁর যাদুর প্রভাবে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। কাজেই এ লোকটি থেকে তোমরা অবশ্যই দূরে থাকবে। হজ্জ ছাড়া অন্যান্য দিনে জিয়ারত কিংবা ব্যবসা উপলক্ষে আগত লোকদেরকেও তারা এ ধরনের কথাই শুনাত। এরূপ করে কাফেররা যদিও নবী করীম (ছাঃ) এর দূর্নাম রটাত ও লোকদেরকে তাঁর নিকট হতে দূরে রাখতে চেষ্টা করত, কিন্তু তাদের এই কাজের ফলেই তাঁর নাম আরব এর প্রতিটি কোণে পৌছে গেল। মক্কার অপরিচিত গন্ডির মধ্য হতে বের করে তাঁকে আরবের সমস্ত গোত্র ও কবীলার নিকট সুপরিচিত করে দিল তাঁর এ শত্রুরাই। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই লোকদের মনে তাঁর সম্পর্কে কৌতুহল জাগল। লোকেরা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করতে লাগল, এই ব্যক্তিকে? কোন সব লোক তার 'যাদুর' প্রভাবে পড়ে? আর তাদের উপর প্রভাবটাই বা কি পড়ে? মক্কার কাফেরদের প্রচার প্রোপাগান্ডা যতই ব্যাপক হতে থাকত, লোকদের মনে এই জিজ্ঞাসাও ততই ব্যাপক ও প্রবল হয়ে দেখা দিত। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে লোকেরা যখন নবী করীম (ছাঃ) -এর চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হল, লোকেরা যখন নিজেদের কাণে কুরআন মজীদ শুনতে পেল, তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা, আদর্শ ও মতবাদ জানতে পারল, যে জিনিসকে তারা 'যাদু' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাতে প্রভাবিত লোকদের (সাহাবীদের) জীবন ও চরিত্র

www.pathagar.com

আরবের সাধারন লোকদের হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দেখতে পেল, তখনই এই দূর্নাম ও বিরুদ্ধ প্রচারই সুনাম, সুখ্যাতি ও অনুকুল প্রচারের ফল দিতে লাগল। হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা এরূপ দেখা দিল যে, দূর ও নিকটের আরব গোত্র সমুহের প্রত্যেকটিকে যথেষ্ট সংখ্যক ইসলাম গ্রহনকারী লোক হয়ে গেল। কোন একটি গোত্রও এমন ছিল না, যাতে ইসলাম কবুলকারী একজন লোকও পাওয়া যেত না। রাছুলে করীম (ছাঃ) -এর দ্বীনি দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহ সম্পন্ন লোক ছিল না এমন একটি কবীলাও কোথায়ও ছিল না। নবী করীম (ছাঃ) -এর উল্লেখ ধ্বনির সুউচ্চ হবার ইহা ছিল প্রথম পর্যায়।

হিজরতের পর এর দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয়। এই সময় একদিকে মুনাফিক, ইয়াহুদী ও সমগ্র আরবের বড় বড় মুশরিকরা তাঁর দূর্নাম করার জন্য ব্যস্ত ছিল। আর অপর দিকে মদীনা শরীফের ইসলামী রাষ্ট্রে (মুসলমানেরা) আল্লাহভীতি ও আল্লানুগত্য, তাকওয়া, পরহেযগারী, নৈতিক পবিত্রতা, উত্তম সামাজিকতা, সুবিচার ও ইনসাফ, মানবীয় সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবের জন্য সুষ্ঠু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও পারস্পরিক লেনদেন এবং কাজকর্মে পরম সততা ও ন্যায়-পরায়নতার বাস্তব নিদর্শন পেশ করতে ছিল। আর তারা সাধারণ মানুষের মন মগজকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতেছিল। শত্রু পক্ষ যুদ্ধ করে নবী করীম (ছাঃ) -এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে খতম করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর নেত্রীত্বে ঈমানদার লোকদের যে সমাজ গড়ে উঠে ছিল, তার আভ্যন্তরীন নিয়ম, শৌর্যবীর্য ও মৃত্যু ভয়হীনতা দ্বারা এবং যুদ্ধকালেও নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন না করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অতুলনীয় মহত্ব প্রমান করে ছিল। সমগ্র আরব তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য হল। মাত্র দশটি বৎসরকালের মধ্যে নবী করীম (ছাঃ) -এর উল্লেখধ্বনি এতই সুদূরপ্রসারী ও দিকপ্রকম্পকারী হয়ে উঠল যে, বিরুদ্ধবাদীরা যে দেশে তাঁকে সর্বোতভাবে বদনাম করার জন্য পূর্ন শক্তি লাগিয়ে চেষ্টা চালিয়ে ছিল, সে দেশের প্রতিটি কোণ থেকেই, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ'র ধ্বনি উত্থিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল।

অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদার আমলে তাঁর খ্যাতি ব্যাপক হবার তৃতীয় পর্যায় সূচিত হয়। এ সময় সমগ্র জগতে তাঁর নাম যে উচ্চারিত হতে লাগল তা বর্তমান মূহুর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত ভাবে চলে আসছে। আর পৃথিবীর শেষ দিন কিয়ামত পর্যন্ত তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। দুনিয়ার যেখানেই মুসলমান বাস করছে, সেখানেই দিন রাত পাঁচ ওয়াক্তের আযানে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর নবুয়াতের ও রেসালাতের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়। তাঁর প্রতি 'দরুদ' পাঠ করা হয়। সাপ্তাহিক জুম্মার সালাতের খোতবায় নবী করীম (ছাঃ) -এর মংগলময় উল্লেখ অপরিহার্য ভাবে হয়ে থাকে উচ মিম্বারের উপর হতেও সুউচ্চ কণ্ঠে। বৎসরের বারোটি মাসে কোন একটা দিন এবং দিনরাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন একটা মূহুর্ত কখনই এমন হয় না, যখন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নবী করীম (ছাঃ) এর পবিত্র নামের উচ্চারন হয় না, তাঁর প্রতি দরুদ পাঠানো হয় না।

www.pathagar.com

বস্তুত ঃ কুরআন মজীদের সত্যতার ইহা এক জলন্ত প্রমাণ। নুবয়াতের একেবারে প্রাথমিক কালে আল্লাহতায়ালা যখন তাঁকে সম্বোধন করে বলে ছিলেন "আর তোমারই জন্য তোমার উল্লেখ-ধ্বনী সুউচ্চ করে দিয়েছি", তখন তাঁর (ঝিকির) পবিত্র উল্লেখ যে কোন দিন এত মর্যাদা ও একখানি জাঁকজমক সহকারে এবং এত ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা কোন লোকের ধারণায় পর্যন্ত আসতে পারত না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে বললেন ঃ 'আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমি কিভাবে আপনার উল্লেখ ধ্বনি সুউচ্চ করে দিয়েছি? আমি বললাম, তা আল্লাহই ভালো জানেন।' জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যখন ও যেখানেই আমার উল্লেখ হবে, তখন সেখানেই আমার সঙ্গে আপনারও উল্লেখ হবে।' (ইবনে জরীর, ইবনে আবু হাতিম, মুসনাদে আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে হাব্বান, ইবনে মারদুইয়া, আবু নয়ীম)। পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাসই অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহতায়ালার এ কথা (ঘোষনা) অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমানিত হয়েছে। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন-১৯ খন্ড)।

এ সূরাটিও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মক্কী জীবনে নাজিলকৃত প্রাথমিক সূরা সমুহের অন্তর্গত। কাজেই উক্ত ঘোষনাটিও প্রদত্ত হয়েছিল ইসলাম প্রচারের অতি সূচনা লগ্নেই। নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অতি সংগোপনে ইসলাম তথা তৌহিদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হন। যেমন, আল্লাহ বলেন,

১। হে রাছুল (ছাঃ) "আপনি আদিষ্ট বাণী প্রকাশ্যভাবে প্রচার করুন" (সূরা-হিজর আয়াত-৯৪)।

২। "আপনি আপনার পরিবার পরিজন ও নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করতে থাকুন" -সূরা শুয়ারা-আয়াত-২১৪।

৩। "আর হে নবী আমরা আপনাকে সমগ্র মানব জাতীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরন করেছি, কাজেই আপনি মানুষকে সুসংবাদ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করুন" (সূরা সাবা-আয়াত-২৮)।

উপরোক্ত ঘোষনাটি প্রদানের সময় বিরাজমান অবস্থা ঃ আর এসব নির্দেশ প্রাপ্তির পর উহা বাস্তবায়নকল্পে যখন রাছুল (ছাঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ও তৌহিদ তথা-একেশ্বরবাদ প্রচার শুরু করেন, তখনই শুরু হয় বাধা ও বিপত্তি। তৌহিদ বিরোধী অবিশ্বাসী (কাফের) মূর্তিপুজকেরা (মুশরিকরা) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিরোধিতা ও বৈরিতা শুরু করে দিল। তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতঃ তারই প্রদর্শিত আল্লাহর দ্বীন 'ইসলাম'কে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হল। কট্টর অবিশ্বাসী, মূর্তিপুজকেরা বিশেষ করে, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, আস-বিন-ওয়ায়েল প্রমুখ মক্কার প্রধান প্রধান সর্দারেরা কখনও এককভাবে, কখনও সম্মিলিতবাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর

www.pathagar.com

তৌহিদ ভিত্তিক ইসলাম ও নবদীক্ষিত মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা তাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে দিল। পরিশেষে ঘোষণা করে দিল যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) -কে যে হত্যা করতে পারবে বা তাঁর শিরচ্ছেদ করতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে (সীরাতুন্নবী - আল্লামা শিবলী নোমানী)।

এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার কট্টর ইসলাম বিরোধী তরুন কোরেশ বীর ওমর (পরবর্তীকালে ইসলামের ২য় খলিফা) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে হত্যা করার জন্য উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ধাবিতও হয়েছিল। এভাবে চতুর্দিক থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচন্ড বিরোধীতার মুখে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নব্যধর্ম ইসলাম এবং তাঁর নগন্য সংখ্যক অনুসারীগণ এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হন। এহেন ভয়ংকর বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আল্লাহর ঘোষণা "আমি তোমার জন্য তোমার 'ঝিকর' আলোচনা, উল্লেখ/স্মরণকে মহিমান্বিত করে দিয়েছি" কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা কারো কল্পনায়ও আসতে ছিল না। উপরোক্ত ঘোষণাটি প্রকাশ হবার পর তাৎক্ষনিকভাবে পরিস্থিতি উন্নতি হবার পরিবর্তে অবনতিই হতে লাগল। ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল বিরুদ্ধবাদীদের প্রচন্ড বিরোধীতা ও প্রতিরোধের মুখে, তাদের নাকের ডগার উপরেই। পরিস্থিতিটা অনেকটা এরূপ ছিল যে একদিকে পিতৃমাতৃহীন ভাই-ভ্রাতাহীন, নিজস্ব সহায় সম্বলহীন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথে নগন্য সংখ্যক নওমুসলিম যাদের অধিকাংশই আবার অন্যের গলগ্রাহী, অন্যদিকে প্রবল প্রতাপশালী মারমুখী কাফের মুশরিকরা যারা একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদকে সূচনাতেই ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে দ্বীন ইসলাম প্রচার তো দূরের কথা, নিজ জীবন নিয়ে টিকে থাকাই ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। এরূপ বিরূপ অবস্থায় আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণা ও উহার বাস্তবায়ন কার্যকরণের কথা কাফের মুশরিকদের নিকট অতি হাস্যকর ও দিবাস্বপ্ন বলেই প্রতিভাত হচ্ছিল।

বর্ণিত বিরাজমান পরিস্থিতিতে যদিও কাফের মুশরিকদের নিকট রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর 'ঝিকর' উল্লেখধ্বনি- নাম, যশ উচ্চকিত হবার ঘোষণা উপহাসের বিষয় বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু ঈমানদার, মোমিন মুসলমানেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে আল্লাহ'র ঘোষণা কোন অলিক কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন বা কোন ভিত্তিহীন কথা/ঘোষণা মাত্র নহে, এ ঘোষণা কোন না কোন সময়, যেখানে যেভাবেই হউক, অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এতে তাঁরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষন করতেন না।

উপরোক্ত ঘোষনা বাস্তবায়নের পর্যায় - ক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১। পরবর্তীতে নবীন কোরেশ বীর হজরত ওমর (রাঃ) ও প্রবীন বীর হজরত হামজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি হলো বটে কিন্তু দ্বীন ইসলামের সার্বিক পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি সূচিত হলো না এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উল্লেখধ্বনিরও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না।

www.pathagar.com

এরূপ অবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং সেই সাথে বিকল্প পন্থাও খুজতে লাগলেন। এরূপে মক্কায় সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়ে তিনি লোকজনকে ইসলাম গ্রহনের জন্য আহ্বান জানাতে 'তায়েফ' গমন করেন। কিন্তু তায়েফের লোকেরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে সম্পুর্ন ব্যর্থ হলো।

পরবর্তীতে মদীনা থেকে কিছু সংখ্যক লোক এসে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহন করলেন। ইসলাম-মদীনায় প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হল। পরিস্থিতি ভিন্নভাবে প্রবাহিত হবার শুভ সূচনা হল। পরবর্তীতে মদীনার বিভিন্ন গোত্রের নেতাসহ আরো বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন এসে মক্কার অদূরবর্তী 'আ'কাবা' নামক উপত্যকায় দুই দুইবার সংগোপনে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহন করেন এবং জীবনে মরণে সর্বাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য সহযোগিতা করার ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচার প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য রছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে 'ওয়াদাবদ্ধ' (বায়াত) হলেন। কালক্রমে মদীনার লোকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহনের ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। মদীনাবাসীগণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে মদীনায় হিজরত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এবং আল্লাহর নির্দেশে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত (প্রস্থান) করলে, মদীনাবাসীগণ অভূতপুর্ব সম্বর্ধনার মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানালেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষনার বাস্তবায়ন কল্পেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কার অবরোদ্ধ অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে বের করে এনে মদীনায় অনেকটা খোলামেলা স্বস্তিপূর্ণ স্বপক্ষের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসেন। এভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মদীনায় উপস্থিতিতে মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহনের জন্য আরও ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সে সাথে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নাম, ডাক, যশও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে।

কিন্তু মদীনায়ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি মক্কার কাফের মুশরিকদের নিকট অসহনীয় ছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ তাদের সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে এ আশংকায় অংকুরেই ইসলামকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য আবু জেহেলের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের এক সশস্ত্র বাহিনী এসে মদীনার অদুরবর্তী 'বদর' নামক প্রান্তরে সমবেত হয়। 'বদর' নামক প্রান্তরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নেতৃত্বে মুসলমানদের সহিত প্রথম প্রত্যক্ষ শক্তি পরীক্ষায় মক্কার বিরুদ্ধবাদী কাফের/মুশরিকরা অতি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করেন। সে সাথে তাঁর নাম, ডাক, ঝিকর আরও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে ওহোদ যদ্ধে নিজেদের ভুল ও আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) -এর সুস্পষ্ট নির্দেশ লংঘনজনিত কারণে সাময়িকভাবে নিজেদের উপর নিজেরাই দূর্যোগ ডেকে আনার পরও 'হোদায়বিয়ার সন্ধি', 'আহযাব' যুদ্ধ এবং পরিশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রাছুলুল্লাহর (ছাঃ) -এর নাম, ডাক, আলোচনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

www.pathagar.com

চারিদিক থেকে জনগণ দলে দলে ইসলমে প্রবেশ করতে থাকে যা আল-কোরআনে মহান আল্লাহ যা এভাবে ব্যক্তি করেছেন "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে তখন দেখতে পাবে দলে দলে লোকজন আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে" (সূরা নসর, আয়াত-১-২)। পরবর্তীতে মদিনার বাহিরেও একটি বিরাট এলাকা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কর্তত্বাধীনে চলে আসলে তাঁর গুণকীর্তন, মহিমা ঘোষণা, ঝিকর/স্মরণ করার পরিধি আরো ব্যাপক হয়। এভাবেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি যা এক সময় অবাস্তব, অকল্পনীয় ও হাস্যকর বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। আর তাঁর সাহাবীগণ তো বটেই এমনকি যারা তাঁর কঠোর বিরোধীতা করেছিল তাদেরও অনেকে (যারা জীবিত ছিল) নিজ জীবনে নিজ চোখেই উক্ত ঘোষনার প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন দেখে গেছে।

সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শুধু রাছুলুল্লাহর (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়, খোলাফায়ে রাশেদীন অথবা পরবর্তীকালে মুসলিম খলিফা/রাজা বাদশাদের আমলেই নহে বরং বিগত চৌদ্দশত বৎসর যাবতই বিরামহীন ভাবে বিশ্বব্যাপী আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ) -এর সুনাম সুখ্যাতি, স্মরণ বর্ধিত থেকে অধিকতর বর্ধিত হয়েই চলেছে। তাঁর নাম, ডাক, যশ, আলোচনা তাঁরই অনুসারী ঈমানদান মুমিন মুসলমানগন তো বটেই এমনকি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অমুসলিম মনিষীগণও সমভাবে করে যাচ্ছে। বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য অমুসলিম বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, কবি, সাহিত্যিক লেখক লেখিকা রাছুলুল্লাহর (ছাঃ) -এর গুণ কীর্তন গেয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। যেসব অমুসলিম মনীষি তাঁর প্রশংসা করে ঐতিহাসিক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বাংলা ভাষায় প্রচলিত অনেক পুস্তকেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে খ্যাতিমান লেখক উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেব কর্তৃক প্রণীত তার সুবিখ্যাত "অমুসলিম মনিষীদের চোখে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)" নামক পুস্তক থেকে চয়নিত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জোরালো প্রশংসা মূলক কতিপয় বিশিষ্ট অমুসলিম মনিষীর বক্তব্য/মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হল ঃ-

১। **নোপোলিয়ান বোনাপার্ট ঃ** আমি প্রশংসা করি ঈশ্বরের এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে পবিত্র নবী ও পাক কোরআনের প্রতি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলো। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো তাঁরা আরও অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মদ (ছাঃ) ছিলেন এক মহান ব্যক্তি।

২। **জর্জ বার্নাডশ ঃ** আমি মুহাম্মদ (ছাঃ) -কে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস তাঁকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মতো কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহন করতেন, তবে তিনি এর সমস্যগুলো এরূপভাবে সমাধান করতে পারতেন যাতে বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হত। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর ধর্ম আগামী দিনে পূর্ন স্বীকৃতি লাভ করবে যেমন আজকের ইউরোপ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।

৩। **প্রফেসর ষ্টিফেন্স ঃ** মহাবিজ্ঞতা প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে মুহাম্মদ (ছাঃ) একই সংগে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৪। **লিউ টলষ্টয় ঃ** মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি ছিল মানব চরিত্রের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আর এ কথা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ ছিল একান্ত বাস্তবভিত্তিক।

৫। **মহাত্মা গান্ধী ঃ** প্রতীচ্য যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হলো এক উজ্জল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিলো আলো ও স্বস্তি। ইসলাম একটি অসত্য ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহলে তারা আমার মতোই ইসলামকে ভালবাসবে ....।

৬। **টমাস কারলাইল ঃ** অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী ছিলেন মুহাম্মদ (ছাঃ)। আমি বলছি, স্বর্গের জ্যোতির্ময় বিদ্যুৎ ছিলেন এ মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট সকল লোক ছিলো জ্বালানীর মতো। অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিলো আগুনের স্ফুলিংগে।

৭। **স্যার উইলিয়াম ম্যুর ঃ** মহানবীর (ছাঃ) এর আবির্ভাবকালীন সময়ের মতো সামাজিক অধোগতি আর কখনও ঘটেনি এবং মহানবী (ছাঃ)-এর তিরোধানের সময় সমাজ জীবন যে পূর্ণতা পেয়েছিলো, তা আর কখনও দেখা যায়নি।

৮। **বাসওয়ার্থ স্মিথ ঃ** সংস্কারকদের মধ্যে মুহাম্মদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ট। ইতিহাসের সম্পূর্ন এক অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) একই সংগে তিনটি জিনিষের স্থপতি একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।

৯। **জন উইলিয়াম ড্রাপার ঃ** জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহন করলেন, যিনি মানব সমাজের উপর সর্বাধিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১০। **ফিলিপ কে হিট্টি ঃ** মুহাম্মদ (ছাঃ) তার স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ধর্মের পত্তন করলেন, যার ভৌগলিক বিস্তৃতি ও প্রভাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের অতিক্রম করে গেলো। মানব জাতির বিপুল অংশ আজো তাঁর অনুসারী।

১১। **আরনল্ড টোয়াইনবি (সিভিলাইজেশন অন ট্রায়্যাল- ১৯৪৮ ইং) ঃ** মুহাম্মদ (ছাঃ) ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যে চাহিদার জন্যে অশ্রুপাত করছে, সে চাহিদা কেবলমাত্র "মুহাম্মাদী সাম্য" নীতির মাধ্যমেই মেটানো হতে পারে।

১২। **বার্ট্রান্ড রাসেল (হিষ্টরী অব ওয়েষ্টার্ন ফিলোসফি- ১৯৪৮ ইং) ঃ** পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলেই আমরা ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে থাকি। অথচ এই সময়েই ভারত হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভুভাগে গৌরবোজ্জল ইসলামী সত্যতার বিকাশ ঘটে।

www.pathagar.com

১৩। এ **লিউনার্ড (হিজ মর‍্যাল এন্ড স্পিরিচুয়েল ভার্চ্যু)** ঃ এই পৃথিবীতে কোন মানুষ যদি কখনও ঈশ্বরকে দেখে থাকেন, কোন মানুষ যদি কখনও সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)।

১৪। **জন অষ্টিন** ঃ এক বছরের কিছু বেশী সময় হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) মদীনার শাসন দন্ড পরিচালনা করেছিলেন যা সমগ্র পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল মহা আলোড়ন। (মোহাম্মদ দি প্রফেট অব আল্লাহ ইন টি পি এস এন্ড কেসেডস উইকলি ২৪-৯-১৯২৭ ইং)।

১৫। **শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী** ঃ হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মুল্যবান, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তার আদর্শকে অনুসরণ করা।

১৬। **গীবন** ঃ বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর আনীত শরীয়ত সর্বলোকের জন্য প্রযোজ্য। এই শরীয়ত এমন বুদ্ধি বৃত্তিক মূলনীতি ও এ ধরনের আইনানুগ পদ্ধতিতে রচিত যে, সমগ্র বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

১৭। **এডওয়ার্ড মুনন্ট** ঃ চরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) যে সাফল্য লাভ করেছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁকে মানবতার মহান দরদী বলে বিশ্বাস করতেই হয়।

১৮। **জওয়াহের লাল নেহেরু** ঃ হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রচারিত ধর্ম, এর সত্যতা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়নীতি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণীত করে। তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল দিশারী।

১৯। **ওয়াশিংটন আরভিং** ঃ দুঃখের দিন গুলিতে তাঁর যে চেহারা ও সরল ব্যবহার দেখা যেত, বৃহত্তম ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার পরও তাঁর সেই একই অবস্থা ছিল। রাজকীয় আচার আচরণ থেকে তিনি এতদূরে ছিলেন যে, কোন ঘরে প্রবেশ করলে সম্মান প্রদর্শনমূলক কেউ কিছু করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

২০। **আর্থার এন ওয়ালটার (হাফ এন আওয়ার উইথ প্রফেট)** ঃ মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি মুহাম্মদ (ছাঃ) ছিলেন। মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোনদিন আর তা অতিক্রম করতে পারেনি কিংবা কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি।

২১। **মাইকেল এইচ হার্ট** ঃ মাইকেল এইচ হার্ট আমেরিকার একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক, জ্যোতিবিজ্ঞানী এবং লিখক। তিনি ১৯৭৮ ইং সনে "দি ১০০ এ র‍্যাংকিং অব দি মোষ্ট ইনফ্লুয়্যান্সিয়াল পিউপিল্‌স্ ইন হিষ্টরী" নামে একটি বিশ্ব-আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক লিখেছেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা "গিলবার্ট পাবলিকেশন" প্রকাশ করেছেন। মাইকেল এইচ, হার্ট তার উক্ত বিখ্যাত পুস্তকে মানব ইতিহাসের মোট ১০০ জন বিখ্যাত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মধ্যে

www.pathagar.com

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে এক নম্বরে স্থান দিয়েছেন। তিনি তার উক্ত বইয়ে লিখেন "দুনিয়ার সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদের নাম প্রথমে রেখেছি বলে অনেক পাঠকই আশ্চর্য হতে পারেন, তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রের বিশ্বের সর্বাধিক সফল ব্যক্তিত্ব"।

তাঁর জন্ম অতি সাধারণ পরিবারে, অথচ তিনি বিশ্বের প্রধান ধর্মের প্রবর্তক এবং পরবর্তীতে হয়ে উঠেন পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার মৃত্যুর তেরশত শতাব্দীর পরে আজও তাঁর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দির এই শেষলগ্নে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই চূড়ান্ত উন্নতির যুগেও মক্কার সেই উম্মী (নিরক্ষর) নবীকে বিশ্বের খ্যাতনামা অমুসলিম মনীষিগনও শুধু শ্রেষ্ঠই নয়, শ্রেষ্ঠতম হিসাবেই সুনাম করতে বাধ্য হচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে তো ইহাই দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর পুর্বোল্লিখিত বিস্ময়কর ঘোষণা বিংশ শতাব্দীর এই শেষ লগ্নেও অতি বিস্ময়করভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট শুধু মনুষ্য জাতিই নহে বরং তিনি নিজেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপুল প্রশংসা করে তাঁর মান মর্যাদা উচ্চতার চরম শিখরে আরোহন করিয়েছেন। তাঁর প্রশংসামূলক অসংখ্য বাণী আল-কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত রয়েছে- যার কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

১। ঈমানদারগণের (বিশ্বাসীগণের) জন্য রাছুল (ছাঃ)-উপর দরুদ পড়া অর্থাৎ শান্তি বানী প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক ঃ আল্লাহ বলেন- "আল্লাহ স্বয়ং তদীয় ফেরেস্তাগণসহ নবী (ছাঃ)-এর প্রতি আশীর্বাদ (দরুদ)/রহমত বর্ষণ করে থাকেন। 'হে ঈমানগারগন তোমরাও তৎপ্রতি শুভাশিষ এবং শান্তিপ্রদ শান্তিবানী প্রেরণ কর' (অর্থাৎ দরুদ পড়)।" (সুরা আহযাব-আয়াত-৪৬)। যেখানে স্রষ্টা স্বয়ং তাঁর ফেরেশতাগন সহ তাঁর উপর সালাম/শান্তি/রহমত পেশ করেন সেখানে মানুষের কি করা উচিৎ তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

২। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রত্যেকেই নিজের জীবন, মা, বাপ, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি অপেক্ষা অধিক ভালবাসা (ফরজ- বাধ্যতামুরক) (সূরা- আহযাব- আয়াত- ৬। (হাদিস-বোখারী)।

৩। এখানে উল্লেখ্য যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক নাম 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ চরম প্রশংশিত, অপর নাম 'আহমদ' অর্থাৎ চরম প্রশাংসাকারী। ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-ই ছিলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত ব্যক্তি। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ স্বয়ং প্রশংসা করে তাঁকে মর্যাদার এক চরমশিখরে আরোহন করিয়েছেন। তেমনিভাবে তিনিও ছিলেন আল্লাহ'র শ্রেষ্ঠতম প্রশংসাকারী।

উপরোক্ত বিবরণ পর্যালোচনা ছাড়াও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবিরাম স্মরণ করার এবং স্মরণ রাখার আরো কতিপয় অক্ষয়, অম্লান ব্যবস্থার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

www.pathagar.com

১। **কালেমায় ঃ** 'কালেমা' হচ্ছে ইসলামের এক নম্বর স্তম্ভ বা খুঁটি এবং ইসলামের মূল ভিত্তি। এসব কালেমার একটি বাক্য হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ/উপাস্য নেই-মুহাম্মদ আল্লাহর রাছুল"। অন্য একটি কালেমার বাক্য হচ্ছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাছুল ও তাঁর বান্দাহ" ইত্যাদি। প্রত্যেক মুসলমানকেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মনে প্রাণে আন্তরিক বিশ্বস্ততার সাথে এসব কালেমার উপর স্থির/দৃঢ় থেকে অবিচল নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অন্যান্য যাবতীয় আদেশ/নিষেধ, হুকুম আহকাম পালন করতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে অবলীলাক্রমেই আল্লাহ ও রাছুল (ছাঃ)-কে স্মরণের মাধ্যমেই মুমিনের যাত্রা শুরু।

২। **সালাত ঃ** ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে 'সালাত' বা 'নামাজ'। আল্লাহ আল-কোরআনের মাধ্যমে সালাত/নামাজ কায়েম করার জন্য বহু বার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এসব নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে দৈনিক ৫ বার নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্বকীয় (ফরজ) নামাজ আদায় করা হয়। এসব ফরজ নামাজ ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রকারের নামাজ রয়েছে যেমন, প্রতি শুক্রবারে জুমার, দুই ঈদের, রমজান মাসের তারাবীহ, রাত্রে তাহাজ্জুদ, সুন্নত , নফল ইত্যাদি নামাজ। আর এ ছালাত বা নামাজ আদায় করতে গিয়ে যেভাবে রাছুল (ছাঃ)-এর নাম স্মরণে এসে যায় তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) **আজান ঃ** অত্যাবশ্বকীয় নামাজ ৫ বার জামাতের সহিত আদায় কল্পে মুসুল্লিগণকে (নামাজীগণকে) একত্র করার জন্য বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে দিন-রাত আহবান (আজান) জানানো হচ্ছে। এ আজানেও রয়েছে উপরোক্ত কালেমার বাক্য যথা 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "মুহাম্মদ আল্লাহর রাছুল"। দিন রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে এমন কোন সময় নেই যখন কোথাও না কোথাও আজান হচ্ছেনা। কাজেই দিবারাত্রি সকল সময়ই রাছুল (ছাঃ)-কে স্মরণ করা হচ্ছে।

(খ) **আজানের দোয়া ঃ** আজানের পর পরই আজানের সু-নিদিষ্ট দোয়া/প্রার্থনা করা হয় যা রাছুলুল্লাহকে (ছাঃ) নিবেদিত ও উৎসর্গকৃত। আজানের দোয়ার একটি বাক্য হচ্ছে "তাঁকে (রাসুল্লাহ (ছাঃ)কে) দান কর সুমহান মর্যাদা, বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর" ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী দিন রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে এমন কোন মূহুর্ত নেই যখন আজান এবং আজানের দোয়া ও সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাছুল্লাহ (ছাঃ) স্মরণ করা হচ্ছে না।

(গ) **এক্কামত ঃ** নামাজ/সালাত শুরু করার পূর্ব্ব মূহুর্তে আজানের প্রায় অনুরূপ আরও একটি আহবান জানানো হয় যাকে "এক্কামত" বলা হয়। মুসল্লি বা নামাজীগণ যাতে একত্রে সংঘবদ্ধ ভাবে এক সাথে নামাজ শুরু করতে পারেন সেই জন্যই এক্কামতের ব্যবস্থা। এই এক্কামতেও রয়েছে আজানেরই অনুরুপ বাক্য "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "মুহাম্মদ আল্লাহর রাছুল।" এভাবে এক্কমতের মাধ্যমেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নাম অবিরাম স্মরণ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

(ঘ) **'আত্তাহিয়াতু' এবং দরুদ ঃ** সালাতে/ নামাজে 'আত্তাহিয়াতু' এবং 'দরুদ' পড়া নামাজেরই একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। এই আত্তাহিয়াতু ও দরুদের রয়েছে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাছুল এবং হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রহমত বরকত বর্ষিত হোক" ইত্যাদি। কাজেই নামাজের এই গুরুত্বপুর্ণ অনুষ্ঠানেও বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ অবিরত ও অনিবার্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-এর নামোল্লেখ, ঝিকির, বা স্মরণ করে থাকেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর, ঝিকর, নাম, সুখ্যাতি সু-উচ্চকিত করার ইহা একটি বিস্ময়কর পন্থা।

কোরআন পাঠ ঃ (সাধারণ নামাজে) ঃ সালাত/ নামাজ আদায় বা পড়ার জন্য কোরআনের কোন 'সূরা' বা 'আয়াত' (বাক্য) পাঠ করা নামাজেরই একটি অপরিহার্য অংগ। কোরআনে রাছুলুল্লাহ সম্পর্কিত অসংখ্য সূরা/আয়াত রয়েছে। নামাজে কোরআন পাঠের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে রাছুলুল্লাহ সম্পর্কিত সূরা /আয়াত সমূহও পাঠ করা হয়ে থাকে। ফলে নামাজে কোরআন পাঠের মাধ্যমেও আল্লাহর রাছুল (ছাঃ)-কে সদা সর্বদা স্মরণ করা হচ্ছে।

(ঙ) প্রতি রমজান মাসে বিশ্ব জুড়ে অসংখ্য মসজিদে "খতমে তারাবীহ" নামক এক বিশেষ সালাত/ নামাজ পড়া হয়ে থাকে যাতে নামাজে কোরআন 'খতম' করা (মুখস্ত) পড়ে শেষ করা হয়। কাজেই প্রতি রজমান মাসে কোরআনে উল্লেখিত রাছুল (ছাঃ)-এর সম্পর্কিত অসংখ্য সূরা/ আয়াত পঠনের মাধ্যমে তাঁর নাম নেয়া বা ঝিকির হয়ে যাচ্ছে।

(চ) মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক 'জুমার' দিন এবং বৎসরে ২টি ঈদের দিন-অতীব পবিত্র দিন হিসাবে গন্য করা হয়। পবিত্র জুমা ও ঈদের দিনে নামাজে 'খোতবা' পাঠ করা হয়। এসব 'খোতবা'র মাধ্যমে রাছুল (ছাঃ)-এর সুপ্রশংসিত বাণী উচ্চারণ করা হয়ে থাকে এবং তাঁর জন্যে দরূদ/দোয়া করা হয়ে থাকে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম ঝিকর/স্মরণ করার ইহাও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা।

(ছ) **কোরআনে হাফেজ ঃ** বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ "কোরআনে হাফেজ" তথা কোরআন 'মুখস্তকারী' রয়েছেন যারা দিনরাত কোরআন (মুখস্ত) পড়ে থাকেন। এসব হাফেজগণ, এমন কি শিক্ষা নবীশ হাফেজগণও বিশ্বময় দিনরাত কোরআন পাঠের মাধ্যমে অবিরাম ভাবে রাছুল (ছাঃ) কে স্মরণ করে যাচ্ছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাঁর ফেরেশতাগণসহ রাছুল (ছাঃ) -এর উপর দরুদ ও ছালাম/রহমত বর্ষন করে থাকেন। কাজেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর দরূদ ও ছালাম পেশ করা মুসলমান প্রত্যেকের উপরই নির্দেশ যা পালন করা বাধ্যতামুলক এবং অপরিহার্য্য। এরূপ ছালাম ও দরুদ পেশ করতে গেয়ে বিশ্বব্যাপী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্মরণ/ঝিকর করা হয়ে যাচ্ছে।

(জ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-বলেছেন তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কিছু বলেনা না। (সূরা নজম আয়াত -৩) অর্থাৎ তিনি যা বলেন সব কিছুই আল্লাহ্‌র নির্দেশেই বলেন এবং আল্লাহর তরফ থেকেই বলেন যা পুর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, যে আমার নাম শুনলো অথচ আমার উপর দরুদ পড়লো না সে অভিশপ্ত,

www.pathagar.com

বখিল যার ধ্বংস অনিবার্য। কি সাংঘাতিক কথা! ইহা জানার পরেও কি কোন ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তাঁর (ছাঃ) নাম শুনে দরূদ/ছালাম পেশ না করে থাকতে পারে?

(ঝ) শেষ নবী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাছুল ও প্রিয় নবী। আল্লাহর নির্দেশ তোমাবেক তাঁর উপর দরুদ ও ছালাম পেশ করার মধ্যে এবং তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলমানগণ চিরাকাংখী। ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ নিজ ঘরে, অঁফিসে আদালতে, দোকানে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সর্বত্র, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে কোন কোন সময় দিনব্যাপী, পক্ষকাল, এমন কি মাসব্যাপি "ঈদে মিলাদুন্নবী, "সিরাতুন্নবী" অনুষ্ঠান করে থাকেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর "ঝিকরকে" (স্মরণকে) উচ্চকিত করার ইহাও একটি বাস্তব পন্থা।

(ঞ) ইহাছাড়া, কোন শুভ কাজ শুরু করার সময়, যেমন নূতন ঘর বাড়ী, নূতন দোকান, ব্যবসা, নতুন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, জন্ম বা মৃত্যুর পর ইত্যাদি অসংখ্য দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে "মিলাদুন্নবী" কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ দিবানিশি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'স্মরণ' ও তাঁর নাম 'ঝিকর' তথা- সূ-উচ্চকিত করে যাচ্ছেন। আল্লাহর পুর্বোল্লিখিত ঘোষণা বাস্তবায়নের ইহা আরও একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

(ট) ছোয়াব/পুন্য লাভের আশায় ঃ পুর্বেই বলা হয়েছে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরুদ/ছালাম পেশ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি পথ। আল্লাহর রহমত, বরকত অর্জন করতে হলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরুদ ও ছালাম পেশ অপরিহার্য। এ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১। হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করবেন, দশটি গোনাহ্‌ মাফ করবেন এবং তাঁর দশটি মর্ত্তবা বাড়িয়ে দিবেন। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড- ২৩ পৃঃ)।

২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহতায়ালা তাঁকে সত্তরটি রহমত দান করবেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য সত্তরবার মাগফেরাত কামনা করবেন। (মেশকাত শরীফ- বোখারী -শরীফ, পৃঃ ৭, (১ম খন্ড)।

৩। ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল ও গৃহীত হবার পর্যায়ে পৌছায় না, যাবৎ দোয়ার সহিত নবী (ছাঃ)-এর প্রতি দরুদ না পড়া হয়। (তিরমিজি শরীফ- বোখারী শরীফ ১ম খন্ড)।

(ঠ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ-এর উল্লেখিত হাদিস সমূহ অনুসরণ করতে দিয়ে মুসলমানগণ ছোয়াব/রহমত লাভের আশায়, গোনাহ মাফের আশায়, মর্ত্তবা বৃদ্ধির আশায় নামাজে,

www.pathagar.com

রোজায়, হজ্জে, মক্কায়, মদীনায়, নিজ গৃহে, মজিদে, মাদ্রাসায়, ব্যক্তিগতভাবে, সমস্টিগতভাবে, নিভৃতে, মানুষের অজান্তে, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনার সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পড়ে থাকেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশ্বময় মুসলমানগণ দরুদকে দোয়া প্রার্থনার অংগ/অংশ হিসাবেই গ্রহণ করেছে। এভাবেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিশ্বব্যাপী মুসলমানের দিবারাত্রি স্মরণ করে চলেছে।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঝিকর/সুনাম/সুখ্যাতি মহিমান্বিত করার আরও একটি ব্যবস্থা এই যে, ইসলামী জলসা/সভা সমিতি/ ওয়াজে, তফসীর মাহফীলে, তবলীগে ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ইসলামী জলছায়/অনুষ্ঠানে কোরআন হাদিস থেকে বলতে, উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম অবলীলাক্রমেই এসে যায় অর্থাৎ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। রাছুল (ছাঃ)-কে স্মরণে আনার ইহা আরও একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

তাছাড়া সময় সময় বিভিন্ন ইসলামী দিবসে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদেরকে, ছাত্র ছাত্রীদেরকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে লিখার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্মরণকে অব্যাহত রাখার একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা।

এসব ছাড়াও বিশ্বব্যাপী যেমনি মুসলিম, তেমনি অমুসলিম কবি সাহিত্যিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, লেখক, লেখিকা, বুদ্ধিজীবি, ঐতিহাসিকগণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কত গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, সাহিত্য, জীবনী গ্রন্থ, পুঁথী, নাত-ই রাছুল লিখেছেন বা লিখে চলেছেন এবং লিখতে গিয়ে কত কালী, কত কাগজ ব্যয় করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। বিশ্বজুড়ে তাঁর জীবনের উপর কত সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, কত আলোচনা সভা, কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাঁকে উপলক্ষ করে কত নাত, গান, গজল, কত কাউয়ালী গাওয়া হচ্ছে তার কোন হিসাব কিতাব নেই। বিশ্বের অন্য কোন মানুষের ক্ষেত্রে তার নাম/ঝিকর/স্মরণ রাখার এরূপ সর্বাত্মক আয়োজন আর দ্বিতীয়টি আছে কি? না, অবশ্যই নেই, থাকা-সম্ভবই নয়।

একমাত্র আল্লাহর সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নাম, মহিমা, উল্লেখই দিবানিশি প্রতি মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'ঝিকরকে' সু-উচ্চকিত ও মহিমান্বিত করার আল্লাহর উল্লেখিত অগ্রিম ঘোষণার কি চাঞ্চল্যকর ও বিস্ময়কর বাস্তবায়ন!

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দানের অগ্রিম ঘোষণা

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা ও রাছুল (ছাঃ)-(আব্দুহু ওয়া রাছুলুহু)। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি আল্লাহরই নির্দেশে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একাশ্বরবাদের ঘোষনা দেন। কিন্তু মক্কার কাফের/মুশরিকরা তাঁর এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাঁর উপর যারপর নাই অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন শুরু করে দেয়। মক্কার কাফের/মুশরিক সর্দারেরা বিশেষ করে আবু জেহেল , আবু লাহাব, আস-বিন-ওয়ায়েল, ওয়ালিদ বিন- মুগিরা, আবু সুফিয়ান, ওবায়-বিন-খল্‌ফ্‌ প্রমুখেরা কখনও ব্যক্তিগত ভাবে, কখনও বা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রাছুলের (ছাঃ)-এর প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। এমন কি "দারুন নাদুয়ায়" –সম্মেলন কক্ষে একত্রিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করতে থাকে। তারা এরূপ ঘোষণা করে দেয় যে মুহাম্মদকে যে হত্যা/শিরচ্ছেদ করতে পারবে তাকে একশত উট ও একশত স্বর্ন মুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। এরূপ ঘোষণা দেয়ার পর হজরত ওমর (রাঃ) অমুসলিম থাকা কালে রাছুল (ছাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খোলা তলোয়ার নিয়ে ধাবিতও হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বাভাবিক মানবিক কারণেই কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লে, আল্লাহতায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করে আগাম ঘোষণা করে দেন যে, কাফের/মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন করে দিয়েই তাঁকে নিরাপদ রাখবেন। বর্তমানে তাঁর প্রতি তারা যে জ্বালাতন/নির্যাতন চালাচ্ছে তা নিতান্ত সাময়িক। নবুয়তের দায়িত্ব পালনের প্রাথমিক অবস্থায় সর্বকালেই নবী রাছুলগণ এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই এতে ঘাবরাবার কিছুই নেই।

এ প্রসংগে আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর (আল্লাহতায়ালার) দৃষ্টির সম্মুখেই রয়েছেন। ফলে, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, ঈহুদি, নাছারাগন তাঁর বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র আর তাঁকে হত্যার জন্য যত অপচেষ্টাই চালাক না কেন, তা তিন ব্যর্থ করে দেবেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নিরাপত্তার এই নিশ্চয়তা প্রদানের ফলে দেখা গেল যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অসংখ্যবার মারাত্মক বিপদ, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর সমূহ ঃ

১। **"আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবুর করুন (ধৈর্য ধরুন), বস্তুতঃ আপনি আমার দৃষ্টির সামনেই (নজরেই আছেন) এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন" (সূরা তূর ঃ ৪৮)**। তফসীর ঃ

www.pathagar.com

শত্রুদের শত্রুতা/বিরোধীতার পরিপ্রেক্ষিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হেফাজতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। এরপর তাঁকে আল্লাহতা'য়ালার সপ্রশংস-পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানব জীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

২। **"নিশ্চয়ই তারা এক চক্রান্তে চক্রান্ত করছে। এবং আমিও এক কৌশলে কৌশল করছি। অতএব অবিশ্বাসীদিগকে অবসর দাও- অল্প সময়ের জন্য তাহাদেরকে অবকাশ প্রদান কর"। (সূরা তারেক ঃ ১৫-১৭)** তফসীর ঃ

তারা (সত্যকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য) নানা অপকৌশল করছে এবং আমিও তাদেরকে ব্যর্থ ও দন্ড দেয়ার জন্য নানা কৌশল (ব্যবস্থা) করে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, আমার কৌশলই প্রবল হবে। আপনি যখন আমার কৌশলের কথা শুনলেন অতএব, আপনি কাফেরদেরকে (ভয় করবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আযাব কামনা করবেন না, বরং তাদেরকে) অবকাশ দিন (বেশি দিনের জন্য নয়), বরং তাদেরকে অবকাশ দিন কিছুদিনের জন্য, এবং দেখতে থাকুন তাদের পরিণতি কি দাঁড়ায়। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন সার-সংক্ষেপ)।

৩। **"তোমাদের মধ্যে যে কেহ বাক্য গোপন করে এবং যে উহা প্রকাশ করে এবং যে কেহ রজনীযোগে লুক্কায়িত থাকে এবং দিবাভাগে বিচরণ করে, সকলই সমান। তাঁর জন্য তাঁর সম্মুখে ও তাঁর পশ্চাতে প্রহরীশ্রেণী রয়েছে, যারা আল্লাহর আদেশে তাঁকে সংরক্ষণ করছে" (সূরা রায়াদ ঃ ১০-১১)**। তফসীর ঃ

মানুষের পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা বা প্রকাশ করা এবং রাত্রিতে লুক্কায়িত থাকা বা দিবসে বিচরণ করা আল্লাহর নিকট সমতুল্য। কারণ তিনি মানুষের সকল অবস্থাই অবগত আছেন।

(উল্লেখিত) আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংরক্ষণের বিষয় উল্লেখ করছেন। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলে দিচ্ছেন যে, আমার রাছূলের শত্রুগণ প্রকাশ্যে অথবা সংগোপনে, দিবাভাগে অথবা রজনীযোগে, সম্মুখে অথবা পশ্চাৎ হতে যেরূপেই তাঁর অনিষ্ট করার চেষ্টা করুক না কেন, তারা তাতে কখনই সফলকাম হতে পারবেনা। কারণ, তাদের গুপ্ত ও ব্যক্ত প্রত্যেক বিষয়ই পরস্পর অনুরণকারী ফেরেশতাগণ তাঁর সম্মুখে ও তাঁর পশ্চাতে অবস্থান করে তাঁকে সর্বদাই রক্ষনাবেক্ষন করছেন। সুতরাং তাঁর ব্যাপক অনিষ্ট সাধন করা অবিশ্বাসীদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

৪। **"হে রাছুল? তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে তা প্রচার কর এবং যদি তা না কর, তবে তাঁর কোন প্রেরিত বার্তাই প্রচার করলে না,**

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ তোমাকে মনুষ্যকূল থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না" (সূরা মায়েদা ঃ ৬৭)। তফসীর ঃ

হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মক্কায় অবস্থানকালে প্রধানতঃ পৌত্তলিকতা বিরোধী আয়াত সমূহই অবতীর্ণ হয়েছিল। তার ফলে কোরেশরা তাঁর উপর ক্ষেপে গিয়ে ভয়ানক অত্যাচার শুরু করে, এমন কি তাঁর প্রাণ বিনাশে উদ্যত হয়। তিনি কোরেশদের নৃশংস অত্যাচারে মক্কায় অবস্থান করতে অসমর্থ হওয়ায় প্রিয় জন্মভুমি পরিত্যাগ করে মদীনা গমন করেন। মদীনা আগমনের পর ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের তীব প্রতিবাদমূলক জ্বলন্ত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হতে থাকে। অথচ মদীনায় তখন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ক্ষমতাশীল এবং পরাক্রান্ত সম্প্রদায় বলে পরিগণিত। পক্ষান্তরে, হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা গমনে কোরেশদের ক্রোধ বহ্নি দ্বিগুন তেজে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। তদ্ব্যতীত তারা আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহকেও হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনাশ সাধনের জন্য উত্তেজিত করে তুলেছিল। একদিকে এই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদল, অন্যদিকে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহায় কেবল মক্কার ধর্মপ্রাণ স্বদেশত্যাগী 'মোজাহের' এবং মদীনার সত্যানুরাগী নিরীহ 'আনসার' সম্প্রদায়। এরূপ বিপদজনক অবস্থায় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদলের বিরুদ্ধে সত্য প্রচার করতে হলে মানব প্রকৃতির পক্ষে একটু শংকিত অথবা বিচলিত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তাই আল্লাহ স্বীয় প্রিয়তম রাছুলকে সাহস প্রদান পূর্বক বললেন, 'তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, যদি তুমি তা লোকদিগের মধ্যে তাদের ভয়ে প্রচার করতে না পার, তবে তো তুমি আমার কোন কার্যই সম্পন্ন করতে পারলে না। অতএব তুমি নিঃসংকচিত্তে আমার প্রত্যাদেশ প্রচার কর। মানব জাতির শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করব।'

এখানে উল্লেখ্য যে, "আল্লাহ আপনাকে শত্রু থেকে রক্ষা করবেন" এ আয়াত নাজিল হবার পূর্বে (মদীনায়) কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, ঈহুদী গুপ্তঘাতকদের প্রতিরেধে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়ে ছিল। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত (ছাঃ) জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রহরিগণকে নির্দেশ দিলেন, "আচ্ছা আপনারা এখন চলে যান, আল্লাহ আমাকে তাঁর নিজ হেফাজতে গ্রহণ করেছেন"। (ইছলাম গোপনা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা-পৃঃ ২১৬-২১৭)। আল্লাহ'র হেফাজতের নিশ্চয়তা পেয়ে পাহারায় নিযুক্ত প্রহরীগণকে সরিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটণা।

এ আয়াতে প্রমানিত হয় যে, হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহতা'য়ালার সংরক্ষিত নবী ছিলেন এবং তিনি তাঁর রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন কোরেশদের আক্রমণ ও ইহুদী জাতির ষড়যন্ত্র হতে একাধিক সংকট মূহুর্তেও হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করে আল্লাহতায়ালা জগদ্বাসীকে সেই প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রদর্শন করেছেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রনে রেখে কাফের, কোরেশ, মুশরিক, মুনাফেক, ইহুদী-নাসারাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে বহুবার রক্ষা করেছেন যা বর্ণিত আয়াত সমুহের তরজমা

www.pathagar.com

ও তফসীর সমূহ থেকে সুস্পষ্ট। আল্লাহর নিজস্ব ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অত্যন্ত অলৌকিক ও বিস্ময়করভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)- কে যে ধ্বংসকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছিলেন তার কতিপয় বাস্তব উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল, যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ঃ-

১। **অমুসলিম থাকাকালীন অবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে হত্যা করতে গিয়ে ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহন ঃ** মক্কার কাফের মুশরিকেরা যখন দেখল যে, মূর্তিপূজা বিরোধী নতুন ধর্ম ইসলামের দিকে আহ্বানকারী একেশ্বরবাদী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারী নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি শত নির্যাতন, অত্যাচার, জুলুম, এর বিনিময়েও তাদেরকে স্বীয় ধর্মমত থেকে বিচ্যুত করা যাচ্ছে না, বরং সমস্ত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করেই তাদের সংখ্যা ও শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইসলাম ধর্মের মূল হোতা খোদ রাছুল (ছাঃ)-কে জীবিত রেখে তাঁর ধর্মকে খতম করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তখনই তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে ঘোষণা করে দিল যে, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে পারবে তাকে একশ স্বর্ণ মুদ্রা ও একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।' (বিশ্বনবী ঃ গোলাম মোস্তফা)।

সে সময় কাফের মুশরিকদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (ছাঃ) ও নব-দীক্ষিত মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিল, তাদের মধ্যে ছিল অন্যতম কোরেশ বীর ওমর বিন-খাত্তাব। ইতিমধ্যে ওমর নিজে কতিপয় নও-মুসলিমকেও জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। উপরোক্ত পুরস্কার ঘোষণার পর ওমর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য কাল বিলম্ব না করে খোলা তলোয়ার হস্তে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে ঘোষণা করেছিল যে, সে মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর শিরচ্ছেদ না করে ঘরে ফিরবে না। এভাবে খোলা তলোয়ার হস্তে ধাবমান অবস্থায় পথে তারই এক বন্ধু নাঈমের সাথে দেখা হলো। নাঈম তার এরূপ রুদ্রমূর্তি ধারনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর দিল যে, সে মুহাম্মদের (ছাঃ)-এর শিরচ্ছেদ করতে বেরিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওমরের অজ্ঞাতেই তার এই বন্ধু ইসলাম গ্রহন করে ফেলেছিলেন। ওমরের এরূপ ইচ্ছা দেখে নাঈম কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তার দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করার জন্য প্রকাশ করেদিলেন যে, তার ভগি ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদও ইসলাম গ্রহন করে মুসলমান হয়ে গেছে। কাজেই মুহাম্মদ কে হত্যা করার পূর্বে নিজ ঘরই আগে সামলান উচিত। এ সংবাদে ওমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রথমে তাদেরকেই শায়েস্তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হলেন। তাদের ঘরের নিকটবর্তী হতেই ভগ্নি ফাতেমার সুললিত কণ্ঠে কোরআনের সুমধুর আওয়াজ তার কর্ণে প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় ওমরের আর ধৈর্যের সীমা রইল না। ঘরে ঢুকেই ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে আক্রমন করে বসল। প্রহারে প্রহারে তাদের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ভগ্নির গায়ে রক্ত দেখে ওমর খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ফাতেমার কণ্ঠে কোরআনের সুমধুর আওয়াজ তাকে অনেকটা প্রভাবিত করে ফেলেছিল। মুসলমান হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই তারা দৃঢ়কণ্ঠে তা স্বীকার করে বলল যে, জীবন থাকতে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করবেনা। তাদের এ তেজোদৃপ্ত

www.pathagar.com

ঘোষণায় দমে গিয়ে ইতিপুর্বে ফাতেমার কণ্ঠে শ্রুত কোরআনের অংশটুকু দেখানোর জন্য বললে, ভগ্নি তা দেখাতে প্রথমে ইতস্ততঃ করছিল। শেষে পবিত্র হয়ে আসার কথা বললে ওমর তাই করল। তা পাঠান্তে ওমর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তার মনে এক অপুর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হলো যার আবেশে সে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। ওমর যেন এক নতুন বিস্ময়কর আলোর সন্ধান পেয়ে গেল। এভাবে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অবিলম্বে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাবার জন্য সাঈদকে অনুরোধ করল। সাঈদ ওমরকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাঁরই অন্যতম সাহাবী আরকাম (রাঃ)-এর গৃহে আবু বকর (রাঃ) ও হামজা (রাঃ) সহ অবস্থান করছিলেন। ওমরের আগমন সংবাদ শুনে তাঁরা খানিকটা শংকিত হয়ে পড়লেন। হামজা (রাঃ) ঘোষণা করেন, 'ভয় নেই, ওমর যদি ভাল উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে ভাল কথা, অন্যথায় তার তলোয়ার দিয়েই তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হবে'। ওমর ঘরে ঢুকতেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষন করে বললেন, আর কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে হে ওমর। ওমর জবাব দিল 'লড়াই শেষ হয়েছে, এখন আত্মসমর্পন তথা ইসলাম গ্রহনের পালা'। এই বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ"। এভাবে আল্লাহর নবী (ছাঃ)-কে হত্যা করতে এসে ওমর নিজেই চুড়ান্তভাবে আত্মসমর্পন করে ইসলাম গ্রহন করল।

এ ওমর (রাঃ)-ই ইসলামের বিশ্ববিখ্যাত ২য় খলীফা। ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহন সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত গ্রন্থ "বিশ্বনবী" তে যেভাবে মন্তব্য করা হয়েছে তা এরূপ ঃ-

"ওমরের ইসলাম গ্রহন বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার, শির নিতে এসে শির দান করবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু এই ব্যাপার বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নহে। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইসলামকে নিয়ে এই সত্য যুগে যুগে প্রকাশিত হয়েছে। যতবারই ইসলামের শিরে আঘাত এসেছে ততবারই আঘাতকারী পরাজিত হয়েছে, ভক্ষকবেশে এসে রক্ষক বেশে ফিরেছে। কত নমরুদ, কত ফেরাউন, কত আবরাহা-ইনা ইহার শিরে আঘাত হেনেছে। কত নাছারা, কত কোরেশ, কত তাতার, কত সেলজুকই না একে ধ্বংস করতে প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু ইসলাম কোথাও মরেনি। প্রতিটি কারবালায় এজিদই নিহত হয়েছে, হোসেনের মৃত্যু হয়নি।

ইহাই ইসলাম, আগুনে পুড়ে না, পানিতে ডোবে না, পিপাসায় কাতর হয় না। দুঃখ, দৈন্য, ঝঞ্জা, বিপদের মধ্যে দিয়েই তার জয়যাত্রা।"

২। তায়েফে ভয়ংকর বিপর্যয় পরিস্থিতি থেকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিত্রান ঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুয়াত প্রাপ্তির বেশ কয়েক বছর পরও মক্কার কাফের, মুশরিক, কোরেশরা ইসলাম গ্রহনের পরিবর্তে এর প্রচন্ড বিরোধিতা করতে থাকে এবং রাছুলুল্লাহ

www.pathagar.com

(ছাঃ)-এর প্রতি প্রতিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেয়। এমতাবস্থায় হযরত (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালেব ও সহধর্মিনী বিবি খাদিজা (রাঃ) ইন্তিকাল করলেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে ও বাইরে প্রায় নিঃসংগ হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় কোরেশরা নবীজী (ছাঃ)-এর প্রতি নির্যাতন, জুলুম, অত্যাচারের মাত্রা ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি করে দিল। দিনে দিনে তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে, মক্কায় ইসলাম প্রচারতো দূরের কথা, জীবন নিয়ে তিষ্টে থাকাই দায় হয়ে পড়ল। একদিকে কাফের কোরেশদের অত্যাচার নির্যাতন, অপরদিকে নবুয়তের দায়িত্ব পালনের সুদৃঢ় সংকল্প ও তৌহিদ তথা ইসলাম প্রচারের অলংঘনীয় নির্দেশ এরূপ চরম সংকটের মধ্যে পতিত হয়েও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিন্দুমাত্র বিচলিত বা নিরাশ হলেন না। পক্ষান্তরে মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে মানুষকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া অথবা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় কিনা, তার বিকল্প চিন্তা ভাবনাও করতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মক্কা থেকে ৭০-৮০ মাইল দূরে 'তায়েফ' নগরীতে গিয়েই ইসলাম প্রচার তথা মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য মনস্থির করেন। ফলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁরই পালক পুত্র যায়েদ বিন- হারেসাকে সংগে নিয়ে তায়েফ নগরীতে উপস্থিত হলেন।

তায়েফের লোকেরাও মক্কার কাফের কোরেশদের মতই ছিল কট্টর অবিশ্বাসী মূর্তিপূজক। মক্কার কাবা ঘরই ছিল তাদের প্রধান তীর্থস্থান বা উপাস্যস্থল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফবাসীদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করার জন্য তথা একেশ্বরবাদ ও তৌহিদের দিকে আহ্বান জানালেন এবং ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করলেন। কিন্তু মূর্তি প্রেমিক, অবিশ্বাসী তায়েফবাসীরাও তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতঃ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দিল। মক্কার কাফের কোরেশদের মতই তারাও তাঁর উপর ভয়ংকর জুলুম নির্যাতন চালাতে লাগল। শুধু তাই নয়, যতই দিন যেতে লাগল ততই অত্যাচার জুলুমের মাত্রা বৃদ্দি করতে লাগল। এমনকি তারা তাঁকে সহ্য করতে না পেরে তাঁর উপর পাথর পর্যন্ত মারতে শুরু করে দিল। তাদের সীমাতিরিক্ত জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচারে হযরত (ছাঃ)-এর দেহ রক্তাক্ত হয়ে যেত। অসম্ভব নির্যাতনের ফলে সময় সময় তিনি সংজ্ঞাহারাও হয়ে যেতেন। তাদের এরূপ প্রচন্ড জুলুম অত্যাচারে নবীজী (ছাঃ)-এর জীবন মরণ সমস্যা পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল। এহেন ভয়ানক পরিস্থিতিতে তাঁর একমাত্র সংগী যায়েদ বিন- হারেসা সমস্ত প্রকার অসহনীয় নির্যাতন/জ্বালাতন উপেক্ষা করে তাঁকে কোন রকমে আগলে রাখতেন।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর উপর তায়েফবাসীরা কিরূপ ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। পরবর্তীকালে তায়েফে সৃষ্ট এই ভয়ংকর অবস্থার কথা স্মরণ করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী উম্মুল মু'মেনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, 'তায়েফের বিপর্যয় ওহুদ যুদ্ধের মারাত্মক অবস্থার চেয়েও ভয়ংকর ছিল এবং এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক

www.pathagar.com

ঘটনা'। স্বর্তব্য যে, ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিহত হবার সংবাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এরূপ বিপর্যয়ের হাত থেকেও মহান আল্লাহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্ধার করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলাম আপনা আপনি কায়েম হয়ে যায়নি বরং জীবনকে বাজি রেখে, চরম বিপর্যয় ও ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়েই ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে।

৩। **হিজরতের রাতে রাছুলুল্লাহর (ছাঃ)-কে হত্যার ভয়াবহ চক্রান্ত ব্যর্থ ঃ** মক্কা ও তায়েফের অধিবাসী কাফের-মুশরেকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক তাদেরকে তৌহিদ তথা দ্বীন ইসলাম গ্রহনের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হলেও মদীনার অধিবাসীরা ইসলামের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে শুরু করল। হজ্ব বা অন্য কোন উপলক্ষে মদীনাবাসীদের অনেকে মক্কায় আগমন করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে দীক্ষা গ্রহন করে (বায়াত হয়ে) ইসলাম গ্রহন করতে থাকে। এভাবে মক্কা থেকে মদীনায় ইসলামের বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ইসলাম প্রচারের একটা উজ্জল সম্ভাবনা দেখতে পেলেন।

এদিকে কাফের/মুশরেকরা মক্কায় মুষ্টিমেয় মুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতন ক্রামগত বৃদ্ধি করেই চলেছে। কালক্রমে এরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হল যে, নবদীক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে তো বটেই এমনকি স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষেও মক্কায় অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় মদীনায় ইসলামের বিপুল সাড়া লক্ষ্য করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত (প্রস্থান) করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তারা কিছু সংখ্যক ছাড়া একে একে প্রায় সকলেই মদীনায় চলে গেলেন। অনতিবিলম্বে মদীনাবাসীগণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও মদীনায় হিজরতের জন্য সাদর আহ্বান জানালেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। শীঘ্রই আল্লাহর নির্দেশ লাভ করে যথাসময়ে মদীনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে কাফের মুশরেকরা মুসলমানদেরকে নিরাপদে মদীনায় যেতে দিয়ে মস্তবড় ভুল করে ফেলেছে বলে মনে করল। তারা ভাবল যে, মদীনায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি তাদের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে। মদীনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে একদিন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কাও আক্রমন করে বসতে পারেন তারা সে আশংকাও করতে লাগল। তাছাড়া সিরিয়ার সাথে মক্কার বানিজ্য পথ মদীনা ঘেঁষেই গিয়েছে বলে তাও মদীনার মুসলমানদের সরাসরি হুমকীর আওতায় এসে যাবে। এমন একটা পরিস্থিতি যখন বিরাজমান, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তখনও মদীনায় চলে যান নাই। যদিও যে কোন সময় যাত্রা শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ চিন্তায় শংকিত মক্কাবাসী কাফের কোরেশরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে কি করা যায় তা নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য "দারুন নাদুয়ায়" বা সম্মেলন কক্ষে এক সভায় মিলিত হল। সভায় বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হল। কেহ বলল তাঁকে চলে যেতে দেওয়া হোক, কেহ বলল তাঁকে আটকে

www.pathagar.com

রাখা হোক, আবার কেহ বলল তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হোক ইত্যাদি। কিন্তু এসব কোন প্রস্তাবই সকলের মনঃপুত হল না। অবশেষে আবু জেহেল প্রস্তাব করল, মুহাম্মদ (ছাঃ) জীবিত থাকলে আপদ আপদই থেকে যাবে। অতএব তাঁকে হত্যা করলেই সমস্ত আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আবু জেহেলের এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করল। কিন্তু কে তাঁকে হত্যা করবে? এককভাবে কেউ তাঁকে হত্যা করলে তাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বগোত্র বন হাশেম, বনু মুত্তালিবের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে একা কারো পক্ষে তাদের মোকাবেলা করা কঠিন হতে পারে ভেবে সকলে সম্মিলিতভাবেই তাঁকে হত্যা করে এর দায়িত্ব সকল গোত্র মিলে একত্রে গ্রহণ করতে মনস্থ করল। সে মতে প্রত্যেক গোত্র থেকেই একজন করে সশস্ত্র লোক নিয়ে একদল সশস্ত্র ঘাতক বাহিনী তৈরী করা হল।

হিজরতের রাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাসগৃহের চতুপার্শ্বে নিচ্ছিদ্র বেষ্টনী সৃষ্ট করে সেই সশস্ত্র ঘাতক বাহিনী অবস্থান নিয়ে নিল। এদিকে কাফের/মুশরেকদের এ ঘোরতর ষড়যন্ত্রের কথা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যথাসময়ে ওহীর মাধ্যমে পুরোপুরি জেনে গেলেন। ফলে হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে গভীর রাতে সকলের অজান্তে, সকলের চোখে ধুলি দিয়ে তাদের কড়া বেষ্টনীর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘাতক বাহিনীর কেহই ইহার বিন্দু-বিষর্গও টের পেল না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে সশস্ত্র ঘাতকদের কঠোর বেষ্টনী, অবরোধ থেকে সম্পূর্ন অক্ষত অবস্থায় ও সম্পূর্ণ নিরাপদে বেরিয়ে চলে গেলেন অথচ শত্রুদের কেহই একটু আঁচও করতে সক্ষম হল না।

এভাবে আল্লাহতা'য়ালা স্বীয় রাছুল (ছাঃ)কে তাঁর হেফাজতে রেখে সম্পূর্ন অলৌকিক ভাবে তাঁকে হত্যার একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন।

৪। **হিজরতের পথে সওর পর্বতের গুহায় শত্রুর এক ভয়ংকর বিপত্তি থেকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর রক্ষা ঃ** হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হিযরতের রাত্রে মক্কায় নিজ গৃহে সশস্ত্র কাফের/মুশরিক কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে বেরিয়ে এসে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক অন্যান্য আনুসংগিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে, আবু বকর (রাঃ)-কে সংগে নিয়ে অতি সংগোপনে মক্কা থেকে ৩-৪ মাইল দূরবর্তী সওর পর্বতের এক নিভৃতে গুহায় আত্মগোপন করলেন।

এদিকে সশস্ত্র ঘাতকেরা রাছুলুল্লাহর (ছাঃ)-এর গৃহে তাঁকে দেখতে না পেয়ে তারা হযরত (ছাঃ)-কে খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে ছুটতে লাগল এবং ঘোষণা করে দিল যে, মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে যে হত্যা করতে পারবে তাঁকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। উটের লোভে শত্রুরা অস্ত্র হাতে নিয়ে চতুর্দিকে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে তারা সওর পর্বতের সেই গুহার অতি নিকটে উপস্থিত হল। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে দেখে ফেলে হযরত (ছাঃ) কে বললেন যে, 'শত্রুরা এত নিকটে এসে পড়ছে যে, তারা নীচে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় আমাদের অবস্থা কি হবে?' রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত অবিচলিত ও কুণ্ঠাহীনভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কোনই কারণ নেই। আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন।'

সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা গুহা মুখে তাকিয়ে দেখল যে, মাকড়াসার এক বিরাট জাল সম্পূর্ণ গুহা মুখটিতে আবৃত করে রয়েছে। ফলে গুহায় কেউ থাকা অসম্ভব ভেবে তারা সেখানে প্রবেশের কোন চেষ্টা না করেই ফিরে আসল। মাকড়সার জাল বা গুহা মুখে ডিমসহ কবুতরের বাসা (বোখারী শরীফ ঃ ৫ খন্ড) দেখেও যদি তারা সেই গুহায় প্রবেশ করত তবে কি ভয়ংকর অবস্থারই না উদ্ভব হত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা মাকড়সার জালের মত দুর্বলতম বস্তু দিয়েই করেছেন। এভাবে আল্লাহতায়ালা তাঁর রাছুল (ছাঃ)-কে সওর পর্বতের গুহায় আসন্ন এক মহাবিপর্যয় থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন।

৫। হিজরতের পথে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে গিয়েও সশস্ত্র সুরাকা বিন- মালিকের ব্যর্থতা ও আত্মসমর্থন ঃ হিজরতের পথে সওর পর্বতের গুহা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মদীনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। রাস্তায় যে কোন সময় বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এই আশংকায় মক্কা-মদীনার প্রচলিত পথ পরিহার করে তাঁরা অপ্রচলিত ভিন্ন পথে চলতে থাকেন।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে হত্যা করতে পারলে একশত উট পুরস্কারের ঘোষনা ইতিমধ্যে বন্য আগুনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘোষণা আরবের "বনু মোদলাজ" - গোত্রের এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সুরাকা বিন মালিকের নিকট পৌছলে, সে পুরস্কারের লোভে তৎক্ষনাত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর দিকে তীব্রবেগে অগ্রসর হচ্ছিল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে শান্ত থাকতে বললেন এবং আসন্ন বিপদ মুক্তির জন্য এই বলে দোয়া করলেন 'হে আল্লাহ, তার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও' (বোখারী শরীফ ঃ ৫ খন্ড)। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দোয়ায় সুরাকার ঘোড়ার পা কংকরময় মাটিতে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রোথিত হয়ে গেল। এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য সুরাকা প্রস্তুত ছিল না। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দোয়ার কারণেই যে তার এই অবস্থা হয়েছে তা বুঝতে তার আর বাকী রইল না। সামনে আরো বিপদ হতে পারে এই আশংকায় শংকিত হয়ে সে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'নিশ্চয়ই আপনাদের বদ দোয়ায় আমার এই বিপদ এসেছে'। আমার জন্য দোয়া করুন আমি মুক্তি পেয়ে যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করব না, বরং শত্রু বিতাড়নে সাহায্য করব"। (বোখারী শরীফ ঃ ৫ খন্ড) এই বলে সে আত্মসমর্পন করল।

এভাবে সুরাকা বিন মালেক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে এসে নিজেই আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। পরিশেষে তার অনুরোধে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে একটি "নিরাপত্তা পত্র" প্রদান করেন (বোখারী শরীফ ঃ ৫ খন্ড)।

www.pathagar.com

এই ঘটনা নিঃসন্দেহে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরাপত্তা দানের আল্লাহর অগ্রিম প্রতিশ্রুতিরই আর একটি প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন।

৬। হিজরতের পথে বারিদার ঘাতক বাহিনী কর্তৃক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়েও হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সদলবলে আত্মসমর্পন।

হযরত রাছুল (ছাঃ)-কে হত্যার পুরস্কারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে এ পুরস্কারের লোভে "আসলাম" গোত্রের বারিদা নামক এক দলপতির নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি দুর্ধর্ষ দল হযরত (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু রাছুল (ছাঃ)-এর অলৌকিক প্রভাবে বারিদা সদলবলে আত্মসমর্পন পূর্বক ইসলাম গ্রহন করে মদীনার পথে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহযাত্রী হবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা খ্যাতনামা কবি গোলাম মোস্তফার "বিশ্ব নবীতে" এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "কাফেলা যখন মদীনার নিকটবর্তী হল, তখন আর এক বিপদ আসল। হর্যরতকে হত্যা করতে পারলে একশত উট পুরস্কার মিলবে এই প্রলোভনে আসলাম গোত্রের বারিদা নামক এক দলপতি ৭০ জন রণদূর্দম বেদুঈন বীর সংগে হযরতের পথ আগলিয়ে অপেক্ষা করতেছিল। হযরতকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষনাৎ তারা তাঁকে আক্রমন করতে অগ্রসর হল।

হযরত তখন সুললিত কণ্ঠে গম্ভীরভাবে কোরআন পাঠ আরম্ভ করলেন। বারিদা ও তার সংগীগন হযরতের নিকটবর্তী হতেই সেই অপূর্ব সুর-লহরী তাদের কর্ণ কূহরে প্রবেশ করল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তারা থমকে দাঁড়াল। আর অগ্রসর হতে পারল না। চরণ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে এলো, হস্ত যেন শিথিল হয়ে গেল। হযরত বারিদার মুখের দিকে তাকালেন। বারিদা সেই তীব্র জ্যোতি সহ্য করতে পারল না। ভিতর হতে তার অন্তর যেন দ্রবীভূত হয়ে গেল। অশ্ব হতে অবতরন করে হযরতের নিকটে এসে বিনীতভাবে বলল, "হযরত, ক্ষমা করুন। না বুঝে দুস্কর্ম করেছি"। হযরত সন্তুষ্ট হলেন। বারিদাকে তিনি ক্ষমা করলেন এবং সকলকে ফিরে যেতে বললেন। বারিদা অনুনয় করে বলতে লাগল, "হযরত, আমরাও আপনার সংগে যাব। আমাদেরকেও আপনার চরণে স্থান দিন" আমরাও কালেমা পড়ছি। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ"। তৎক্ষনাৎ ৭০ জন দস্যু মুসলমান হয়ে গেল। বারিদা মহাউৎসবে অগ্রে অগ্রে চলতে লাগল। আপন আপন শিরস্ত্রান ছিড়ে বর্শা ফলকে জড়িয়ে তারা জয় পতাকা প্রস্তুত করল। এক অপূর্ব মিছিল গড়ে উঠল। ৭০টি আরবী অশ্ব বীর পদভারে দুলতে দুলতে চলতে লাগল, ৭০ খানি নাংগা তলোয়ার রৌদ্র কিরনে ঝলসে উঠিল, ৭০ খানি বর্শাফলকে ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে লাগল, ৭০টি কম্পকণ্ঠে অঞ্চল মুখরিত করে ধ্বনি উঠল, "আল্লাহু আকবার"।

"কোন যাদুমন্ত্রে এমন হল, একজন নহে, দুইজন নহে, ৭০ জন রক্তমাতাল নর শার্দুল-মূহুর্তের মধ্যে কিরূপে বশীভুত হয়ে গেল। হযরতকে হত্যা করতে এসে নিজেদের ঘৃনিত পশু জীবনকেই হত্যা করে বসল।"

নিঃসন্দেহে এই ঘটণা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরাপত্তা দানের আল্লাহর প্রতিশ্রুতির আরও একটি বাস্তবায়ন।

www.pathagar.com

৭। **ওকবাহ ইবনে আবী-মোয়ায়েৎ কর্তৃক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রাননাশের চেষ্টা ব্যর্থ ঃ** ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, (প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারী অন্যতম সাহাবী) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে আমি বললাম, মক্কার মোশরেকরা নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর যে অমানুষিক জুলুম অত্যাচার করেছিল তন্মধ্য থেকে আমাকে একটা জঘন্য ঘটনা শুনান। তিনি বললেন, 'একদা নবী করীম (ছাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ ওক্ববাহ ইবনে আবী মোয়ায়েৎ তথায় এসে তার কাপড় দিয়ে হযরত (ছাঃ)-এর গলায় পেচিয়ে ভীষণভাবে টানতে লাগলো। (ফলে হযরতের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল, এমতাবস্থায়) আবু বকর (রাঃ) দৌড়ে এসে ওকবার কাঁধে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি একটি লোককে এ জন্য মেরে ফেলতে চাও যে, যিনি বলেন আমার প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ, অঁথচ তিনি তাঁর দাবীর পক্ষে তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে কত কত উজ্জল প্রমান পেশ করেছেন'। (বোখারী শরীফ)।

৮। **আরব বেদুঈন কর্তৃক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'নজদ' এলাকায় এক অভিযান শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে এক গাছে স্বীয় তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে সেই গাছের তলায়ই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিদ্রা যেতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ এক আরব বেদুঈন তথায় উপস্থিত হয়ে হযরত (ছাঃ) এর তরবারীখানা হস্তগত করতঃ তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। আঘাত করার পূর্বে সে হযরত (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দৃঢ় ও নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, "আল্লাহ"। মহানবী (ছাঃ)-এর শান্ত, গুরু গম্ভীর কণ্ঠে "আল্লাহ" শব্দ শুনে তার অন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সে থর থর করে কাঁপতে লাগল এবং তার হাত থেকে তরবারী খসে পড়ল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় তরবারী উদ্ধার করতঃ এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে জবাব দিল, তাকে রক্ষা করার কেহই নেই। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও বললেন না, তোমাকেও আল্লাহই রক্ষা করবেন। হত্যায় উদ্যত জানের শত্রু, সেই শত্রুকেও দয়ার্ল নবী ক্ষমা করে দিতে ইতস্ততঃ করলেন না। মহানবীর (ছাঃ)-এর অসীম মহত্বের কারণে তার মনপ্রান বিগলিত হয়ে গেল। সে নবীজী (ছাঃ)-এর পদতলে এসে ইসলাম গ্রহন করল। এভাবে সেই বেদুঈন রাছুল (ছাঃ) -কে হত্যা করতে পড়ে নিজেই আত্মসমর্পন করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। (বোখারী শরীফ)।

৯। **রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে ঈহুদীদের হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ ঃ** এক মুসলমান দুইজন অমুসলমানকে পথিমধ্যে সুযোগ পেয়ে মেরে ফেলেছিল। অমুসলমান হলেও তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে জান ও মাল রক্ষিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ছিল। ঐ মুসলমান ব্যক্তি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। শরায়তের বিধানানুসারে ঐ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের "দিয়াত" (শরীয়ত নির্ধারিত রক্তপণ) প্রদান করতে হয়। ঈহুদী বনু নজীরের সংগে মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি অনুসারে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের অংশীদার বনু-নজীরের

www.pathagar.com

ছিল। এ জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আবু বকর, ওমর, আলী প্রমুখ কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে তাদের মহল্লায় আগমন করেছিলেন। ঈহুদীরা প্রকাশ্যে তাদেরকে সাদর আহ্বান জানালো, এবং খাতির তাওয়াজ ও বন্ধুত্বের পরিচয় দিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যরূপ দুরভিসন্ধি করল যে, তাদেরকে একটি কুটির দেয়ালে সংলগ্ন বসার স্থান করেছিল এবং এরূপ পরামর্শ করল যে, কোন এক ব্যক্তি উপরে উঠে গিয়ে গোপনে দেয়ালের উপর থেকে একটি বড় পাথর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ফেলে দিয়ে তাঁকে প্রাণে বধ করে ফেলবে। তারা এরূপে তাঁর প্রাণনাশ করার ষড়যন্ত্র করল, এমন কি আমর ইবনে জাহাশ নামক এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে দেয়ালের উপর চড়ল। সংগে সংগে আল্লাহতায়ালা ওহীর মারফত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সমস্ত ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিলেন। তৎক্ষনাৎ তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন এবং তাঁর সংগী ছাহাবাগণও চলে আসলেন। এভাবে ঈহুদীদের রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আল্লাহর রহমতে ব্যর্থ হল। (বোখারী শরীফ ৩য় খন্ড, পৃঃ ২১৪-২১৫)।

১০। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে ঈহুদীদের গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ ঃ একদা বনু-নজীর গোত্রীয় ঈহুদীদের রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সংবাদ পাঠালো যে, আপনি আমাদের সর্বদাই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আমরা সমস্ত বিতর্ক অবসানের ব্যবস্থা স্থির করেছি যে, আপনি স্বীয় সংগীগণসহ তিনজন আমাদের বস্তিতে আসুন, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তিনজন আলেম উপস্থিত করব। যদি আপনারা আমাদের আলেমগণকে আপনাদের দাবী মানাতে পারেন তবে আমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাব। প্রকাশ্যভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের আলেম নামীয় ব্যক্তিদের সংগে গুপ্তভাবে ছোরা দিয়ে দিল। এরূপে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু তাদেরই এক ব্যক্তির মারফত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত হয়ে গেলেন। (ফতহুল বারী)। এরূপ ঘটনায় যখন তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে সন্ধিচুক্তি ভংগকারী বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দেশত্যাগের আদেশ দেন। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হল যে, দশ দিনের মধ্যে দেশত্যাগী করতে হবে। দশদিন পর যাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে (বোখারী শরীফ ঃ ৩য় খন্ড, পৃঃ ২১৪-২১৫)।

১১। ঈহুদী রমনী কর্তৃক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ ঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক খয়বর বিজয়ের পর পরই যখন সেখানে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হল তখন ছাল্লাম ইবনে- মেশকাম নামক এক ঈহুদীর স্ত্রী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে তিনি তার দাওয়াত গ্রহণ করেন। সেই ঈহুদী মহিলা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ মিশ্রিত বকরীর মাংস তাঁকে (ছাঃ)-কে খেতে দিল। তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবী ও খাওয়ায় শরীক হয়েছিলেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিষ মিশ্রিত মাংস মুখে দিতেই বুঝতে পারলেন যে মাংসে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মুখ থেকে মাংসের টুকরা বের করে ফেললেন এবং বলে উঠলেন যে, মাংসে বিষ মিশ্রিত রয়েছে তোমরা (খাওয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবা) মাংস খেয়ো না। কিন্তু বিশর ইবনে- বারা (রাঃ) নামক সাহাবী ইতোমধ্যেই ঐ মাংসের কিছু অংশ খেয়ে

www.pathagar.com

ফেলেছিলেন যার প্রতিক্রিয়ায় তিনি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবাগন সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য চাপ দিলে ঈহুদী মহিলা মাংসে বিষ মিশ্রনের কথা স্বীকার করে এবং বলে যে তার উদ্দেশ্য ছিল রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য নবী কিনা তা পরীক্ষা করা। সত্য নবী হয়ে থাকলে বিষের কথা জেনে ফেলবেন এবং বেঁচে যেতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় ভন্ড নবীর হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। মহানবী (ছাঃ) এহেন ভয়ংকর হত্যার ষড়যন্ত্রের পরও ব্যক্তিগতভাবে তাকে ক্ষমা করে দিলেন বটে কিন্তু বিশর- ইবনে বারা (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যার জন্য অবশেষে ঐ মহিলাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। (আবু হোরায়রা ঃ বোখারী শরীফ)।

উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা প্রমাণিত যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত নিরাপদ নবী (ছাঃ)।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পরে তো বটেই এমন কি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও তাঁকে বিভিন্ন সংকটময় সময়ে আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ন নিরাপদ রেখেছেন। নবী করীম (ছাঃ) শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন এতিম হয়ে পড়লে দাদা আবদুল মুত্তালেব, পরে চাচা আবু তালেবের গৃহে লালিত পালিত হন। তাঁর এই পিতৃমাতৃহীন সহায় সম্বলহীন অবস্থা থেকে মুক্তি দান সম্পর্কে আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ **"আমি কি আপনাকে এতিম পাই নাই? এবং পরে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আমি কি আপনাকে গরীব পাই নাই, পরে আপনাকে ধনবান করেছি।" (সূরা- আদ-দোহা)।**

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সমগ্র মানব জাতির আদর্শ (সূরা আহযাব, আয়াত-২১)। কাজেই তাঁকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে নিয়ে তাঁকে দিয়ে নবুয়তের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আর এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তাঁকে সময় সময় মারাত্মক বিপদ এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীনও হতে হয়েছে। কিন্তু যেহেত আল্লাহতায়ালা তাঁকে পূর্বেই পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছেন, সেইহেতু সাময়িক বিপর্যয় ছাড়া তাঁর আর ধ্বংসাত্মক কোন ক্ষতি করতে কেহই সক্ষম হয় নাই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে দুনিয়াতে যে মিশন অর্থাৎ নবুয়তী কার্যক্রম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তা পূরন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। তাঁর যদি নিরাপত্তারই কোন ব্যবস্থা না থাকত, কাফের/মুশরিকরা যদি তাকে হত্যা করতেই সক্ষম হত, তাহলে আল্লাহ তাঁর 'নুর' বা 'জ্যোতিকে' কিভাবে পূর্নতা দান করতেন? আল্লাহ বলেন, **"তারা ইচ্ছা করে যে, তাদের ফুঁৎকার দ্বারাই আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেন এবং যদিও অবিশ্বাসীরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। তিনি স্বীয় রাছুলকে সুপথ ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি উহাকে সকল ধর্মের উপর সুপ্রকাশিত (বিজয়ী/সুপ্রতিষ্ঠিত) করে দেন এবং যদিও অংশীবাদীরা (এতে) অসন্তুষ্ট হয়"। (সূরা ছফ, আয়াত-৮-৯)।** আল্লাহ তাঁর নূর/জ্যোতি তথা- দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ বিজয়ী না করা পর্যন্ত (সাময়িক ভাবে কিছু কিছু বিপর্যয় ছাড়া) তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

অবশেষে যখন তাঁর মিশন পূরা হল, তিনি বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবং যখন আল্লাহর (সাহায্য) ও বিজয় সমাগত হল এবং লোকেরা দলে দলে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করা শুরু করলো (সূরা নাসর), তখন তো ইহাই প্রকাশ পেল যে, দুনিয়াতে তাঁর অধিক দিন অবস্থান করার আর প্রয়োজন নেই এবং বিশ্ব মাঝে তাঁর প্রয়োজন শেষে আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে পরপারে নিয়ে যাবার প্রচ্ছন্ন ইংগিতও দিয়ে দিলেন (সূরা নাসর)।

বর্ণিত আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর সমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক তাঁর নবুয়তী কার্যক্রম পূর্ণ করার জন্য অর্থাৎ তার মিশনকে সফল করার জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দানের যে আগাম ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা অতি বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকরভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন যা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রোমানদের পুনঃ-বিজয় এবং মুসলমানদেরকেও মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী

আরবের উত্তরে ডানে ও বামে যথাক্রমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য নামে ২টি বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। রোম সাম্রাজ্য শাসন করত আহ্‌লী কিতাব তথা খৃষ্টানরা আর তাদের অধিপতি ছিল হিরাক্লিয়াস বা হেরাকল। পক্ষান্তরে, পারস্য সম্রাট ছিল অগ্নি উপাসক খসরু পারভেজ। পাসরিকরা অগ্নি উপাসনা করতো। এ দুইটি প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই সংঘর্ষ বিদ্যমান ছিল। তবে নবুয়তের ৫ম বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৪ সালে উল্লেখিত সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ বেধে যায়। এ ভয়াবহ যুদ্ধে রোমানরা ক্রমাগত ভাবে হারতে থাকে এবং হারতে হারতে তাদের সাম্রাজ্যের প্রায় সমুদয় অংশই হাত ছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়। রোমানদের পক্ষে পারসিকদেরকে রুখে দাড়ানোর শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয়ে দাড়িয়েছিল যে, রোমানরা যে আর কোন দিন মাথা তুলতে পারবে তা কারো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। এমনি সময়ে আল্লাহতা'য়ালা উপরোক্ত সূরা নাজিল করে আগাম জানিয়ে দিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরাজিত রোমানরা পারসিকদের উপর পুনঃ বিজয়ী হবে এবং সেসাথে মুসলামানেরাও আল্লাহ'র দেয়া সাহায্যে বিজয়ী হয়ে আনন্দিত হবে (মক্কার কাফের/মুশরিকদেরকে পরাজিত করার মাধ্যমে)। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমূহ (শানে নজুল ও বিশেষ বিশেষ শব্দার্থসহ) ঃ

"রূমীয়গণ পরাস্ত হয়েছে নিকটতর ভূমিতে এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কতিপয় বৎসরের মধ্যে। পূর্বে এবং পরে আল্লাহরই আদেশ। এবং সেদিন বিশ্বাসীরাও (ঈমানদারেরাও) আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত ও করুনাময়। ইহা আল্লাহ'রই অংগীকার, আল্লাহ স্বীয় অংগীকারের অন্যথা করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা অবগত নহে" (সূরা রুম, আয়াত- ১-৬)।

(ক) **শানে নজুল ঃ** এ পবিত্র সূরা হিজরতের ছয় অথবা সাত বৎসর পূর্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রোম জাতির এবং অত্যাচারী কোরেশদিগের উপর অত্যাচারিত মুসলমানদের আসন্ন মহাবিজয়ের স্পষ্টতর ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বানী এ সূরার সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী সূরায় আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির সহিত মুসলমানদিগের নৈকট্য ও সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় পৌত্তলিক কোরেশরা মুসলমানদিগের ন্যায় ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের প্রতিও ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষন করতো। পক্ষানন্তরে, অগ্নিপূজক পারসিকদেরকে তারা নিজেদের নিকটবর্তী ও সমমতাবলম্বী বলে ধারণা করতো। ইতিমধ্যে অগ্নিপূজক পারসিক জাতির

www.pathagar.com

সহিত যুদ্ধে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী রোম জাতির শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হওয়ায় পৌত্তলিক কোরেশদিগের মধ্যে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হয়। তারা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, তোমাদের ও খৃষ্টানদিগের আল্লাহ তো এক, কিন্তু তোমাদের আল্লাহর কোন শক্তি নাই। কারণ অগ্নিপূজক পারসিকদিগের আক্রমণ থেকে তোমাদের আল্লাহ রুমীয়দেরকে রক্ষা করতে পারলো না। সুতরাং আমাদের সমমতাবলম্বী পারসিকদিগের দ্বারা তোমাদের সমমতাবলম্বী রুমীয়গণ যেরূপ ভাবে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, আমাদের দ্বারা তোমরাও সেরূপ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। আমাদের আক্রমণ থেকে তোমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না। অবিশ্বাসী কোরেশদিগের এ সকল উপহাস/বিদ্রূপের উত্তরে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতা'লা বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রুম জাতির এবং অত্যাচারী শক্তিশালী কোরেশদিগের উপর অত্যাচারিত ও শক্তিহীন মুসলমানদিগের আসন্ন মহা-বিজয়ের স্পষ্টতর সুসংবাদ ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীসহ এই সূরা অবতরণ করেন (তফসীরে হক্কানী)।

'রূম' একটি সাম্রাজ্য, দেশ অথবা জাতি বিশেষ। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লোকেরা নিজদিগকে রোমান্‌স বা রূমীয় নামে অভিহিত করে (তঃ মঃ আঃ)। প্রাচীন গ্রীক-জাতিকেও 'রোমান্‌স্' বা রূমীয় বলা হয়ে থাকে। মহানগরী কনষ্ট্যান্টিনোপলকেও রূম নামে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য আয়াতে রূম শব্দে কনষ্টানন্টিনোপলের খ্রীষ্টান সম্রাট এবং তার অধীনস্থ খ্রষ্টান জাতিকেই নির্দ্দেশ করা হয়েছে। অগ্নিপূজক পারসিকদের সহিত যুদ্ধে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী রূমীয়দিগের পরাজয় উপলক্ষে বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপহাস-বিদ্রুপের উত্তরে, বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রূম জাতির আসন্ন মহাবিজয়ের ভষ্যিদ্বাণী ও সুসংবাদসহ এ সূরা আরম্ভ হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে ইহারও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রূমীয়দিগের ন্যায় সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরাও অচিরেই শক্তিশালী শত্রুর উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে এবং রূমীয়দিগের ন্যায় অভ্যুত্থান লাভ করে তারাও পৃথিবীতে রূম সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করবে।

অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এ কয়েকটি আয়াতে পারসিকদিগের দ্বারা পরাজিত রূম জাতির পরাজয়ের প্রসংগ উল্লেখ করে আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, রূমীয়গণ পারসিকদিগের দ্বারা নিকটবর্তী প্রদেশে পরাজিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এ পরাজয়ের পরে তারা অচিরেই অর্থাৎ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজয়ী পারসিকদেরকে পরাস্ত করে জয়-গৌরবের অধিকারী হবে এবং রূমীয়গণ যেদিন পারসিকদের উপর পরাক্রান্ত হবে, সেদিন মুসলমানেরাও আল্লাহর অনুগ্রহে অবিশ্বাসী কাফেরদের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হয়ে আনন্দোৎসব করতে পারবে। উল্লেখিত তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে স্পষ্টতর ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে যে, অচিরেই অর্থাৎ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হবে। ঐতিহাকিগণ এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা উত্তম রূপেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য এ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা কোরান শরিফের অলৌকিকত্ব এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যতার এক উজ্জ্বলতম প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

'বিদ-ই-সিনিনা' - কতিপয় বর্ষ। আরবী বাকধারা অনুসারে তিন বৎসর হতে নয় বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত সময়কে 'বিদ-উন' বলে। সুতরাং উপরোক্ত বাক্যাংশের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আগামী তৃতীয় বর্ষের পর নবম বর্ষের মধ্যেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ন হয়ে রূম জাতি অগ্নিপূজক পারসিকদের এবং মুসলমানেরা অবিশ্বাসী পোত্তালিকদের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে। উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবার পর হজরত আবুবকর এক প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন যে, রূমীয়গণ আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই পারসিকদিগের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে। কিন্তু উবায়-বিন-খল্‌ফ নামক জনৈক অবিশ্বাসী উহা অগ্রাহ্য করে বলে যে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্তর উভয়ের মধ্যে দশটি উট শর্ত করে বাজী রাখা হয়। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ইহা শুনে বলেন যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সময় নির্দ্ধারণ ঠিক হয় নাই। 'বিদউন' অর্থ তিন হইতে দশ বৎসর। অতএব তুমি সময় ঠিক করে উটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে লও। তদনুসারে হজরত আবুবকর পুনরায় গিয়ে উবায়ের সহিত একশত উটের শত করেন এবং যথাসময়ে রূমীয়গণ জয়লাভ করলে তিনি বাজী জিতে একশত উট প্রাপ্ত হন। এতদ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে কিরূপ নিশ্চিত বিশ্বাসী ও নিঃসন্দেহ ছিলেন (তঃ কবির ও নায়সাপুরী)।

রূম-পারসিক সংঘর্ষ ঃ ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেছেন যে, ৬১৫ বা ৬১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু রূম-পারসিক সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল তার বহু পূর্ব থেকেই। ঘটনার বিবরণ এই যে, রূমীয় ফোকাস কর্তৃক মৌরিস নামক জনৈক পারসিক নিহত হবার পর উক্ত হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিবার জন্য পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে রুমীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর পরাক্রান্ত সৈন্যদল সিরিয়া ও এসিয়া মাইনর লুণ্ঠন করে ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালসিডোন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ৬১৩ ও ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সেনাপতি শাহবাজ জেরুলেম ও দামেস্ক অধিকার করে এবং সেই বিপুল বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ জেরুজালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র ক্রুশ কাষ্ঠ হরণ করে নিয়ে যায়। ইহার পরেই পারসিকগণ মিসর অধিকার করে এবং ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা পরাজিত রূম সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। রূম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস বা হরকেল এবং রূমী সৈন্যগণ উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে এরূপ ভীত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তারা নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। পারস্য সাম্রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করা তো অতি দূরের কথা, পারসিকদিগের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের অপহৃত রাজ্য উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তখন তাদের ছিল না। ঠিক এই সময়েই বিজয়ী পারসিকদিগের উপর পরাজিত রূম জাতির আসন্ন মহাবিজয়ের এবং অত্যাচারিত ও প্রাণের ভয়ে দেশান্তরিত শক্তিহীন মুষ্টিমেয় মুসলমান কর্তৃক অত্যাচারী, অবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী পরাক্রান্ত কোরেশ জাতির পতন ও পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদসহ উপরোক্ত প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ হয়। তাই উক্ত প্রত্যাদেশ নির্দ্ধারিত

www.pathagar.com

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট ভবিস্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা দর্শনে ইসলামের শত্রু মিত্র সকেলই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে (তঃ বাঃ কোঃ ও এনসাইক্লোঃ বৃটাঃ)।

ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ উক্ত প্রত্যাদেশ অবতারনের পরবর্তী অষ্টম বা নবম বর্ষে রূম সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারসিকদিগের কবল থেকে স্বীয় রাঁজ্য উদ্ধার কল্পে পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তার বিজয়ী সৈন্যদল ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরে মিডিয়া অধিকার করে গোডাজাকের পারসিকদের সুবিখ্যাত অনলকুন্ড বা অগ্নি- উপাসনালয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেন (এনসাইক্লো-বৃটাঃ)। আবার ঠিক ঐ বৎসরেই অবিশ্বাসী কোরেশদিগের অত্যাচারে জর্জরিত এবং প্রাণের ভয়ে স্বদেশত্যাগী - হজরত রাছুলুল্লাহ'র ৩১৩ জন মাত্র সহচর যাদের অধিকাংশই অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও নিরস্ত্র যুবক ছিলেন, তাঁদের সুবিখ্যাত বদর-যুদ্ধে কোরেশদিগের সহস্রাধিক সুদক্ষ ও সশস্ত্র সৈন্যে গঠিত আক্রমনকারী বীর বাহিনীকে অতি অপ্রত্যাশিতরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে দেন। শত্রুদিগের সমস্ত সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ ও নেতৃস্থানীয় পরিচালকই এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং উদীয়মান মোসলেম শক্তির এই প্রচন্ড আঘাতে তাদের শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন যে, যেদিন রূমীয় সৈন্যগণ গোডজাকের অগ্নি উপাসনায়ল ধ্বংস করে অগ্নিপূজক পারসিকদিগের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে, সেই দিনই মদীনার নব-অভ্যুত্থিত মোসলেম শক্তি সর্ব্বপ্রথম জেহাদের পতাকা উত্তোলন করে। সুবিখ্যাত বদর প্রান্তরে প্রতিমাপূজক কোরেশদিগের শক্তি ও গর্ব চিরতরে খর্ব করে দেন। অনন্তর হজরত রাছুলুল্লাহ যেরূপভাবে মহানগরী মক্কা অধিকার করে সমগ্র আরবের উপর ইসলামের অপ্রতিহত প্রভা বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসী অনুগামীগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপভাবে সমগ্র পারস্য ও রূম সাম্রাজ্য অধিকার করে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত আভাস বা পরবর্তী অংশের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন, জগতের ইতিহাসই তার শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী।

পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, যারা উপরোক্ত ভবিস্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতেছিল এবং যারা উহা অসম্ভব মনে করে উপহাস বিদ্রুপ করতেছিল, আলোচ্য এ দুইটি আয়াতে আল্লাহতা'লা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, রূম জাতি ও মুসলমানদের জয়লাভ এবং পারসিক ও কোরেশদের পরাজয় সম্বন্ধে আল্লাহতা'য়ালা যে অঙ্গীকার করেছেন এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগের অবগতির জন্য যে ভবিষ্যদ্বানী ব্যক্ত হয়েছে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হবে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালা কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেন না। এ সংগে আল্লাহতা'য়ালা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যারা আমার ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা অসম্ভব মনে করে সন্দেহ পোষণ অথবা উপহাস বিদ্রুপ করতেছে তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয় অথবা বর্তমান অবস্থা দেখেই ঐরূপ ধারণা করছে, কিন্তু পরকাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ও পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঐ সম্বন্ধে তাদের কোনই জ্ঞান নেই (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) (এই সূরাটিতে) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে ঃ "নিকটবর্তী ভূখন্ডে রোমানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয়ের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তারা

www.pathagar.com

আবার জয়ী হবে। আর সেই দিনই আল্লাহর দেয়া বিজয়ে ঈমানদার লোকেরা সন্তুষ্ট হবে। এই কথায় দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। একটি এ যে, রোমানরা বিজয়ী হবে। আর দ্বিতীয়টি এ যে, মুসলামানরাও এই সময়েই বিজয় লাভ করবে। অথচ কয়েক বৎসরের মধেই এ ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় যে সত্য বলে প্রমাণিত হবে, তা বহু দূর দূরান্তেও বাহ্যত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এইদিকে মুষ্টিমেয় মুসলমান মক্কা নগরে কেবল মার খেতেছিল, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। আর ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বৎসর পর্যন্ত তাদের জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। অপর দিকে রোমানদের পরাজয়ের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মিসর পারসিকদের দখলে চলে যায়। আর এ 'মজুসী' সৈন্যরা ত্রিপলীর নিকটে পৌঁছে পতাকা উত্তোলন করে। এশিয়া মাইনরে পারসিক সৈন্যরা রোমানদেরকে মেরে নিষ্পেষিত করতে করতে বসফোরাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর ৬১৭ খৃষ্টাব্দে তারা কনষ্টান্টিনোপল এর সামনে খালেকদুন (Chalecdon) (বর্তমান নাম কাজীকুই) দখল করে বসে। কাইজার খসরুর নিকট দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরয করল যে, সে যে কোন মূল্যে সন্ধি করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এর জবাবে সে বলল ঃ এখন আমি কাইজারকে সেই সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা দিব না, যতক্ষণ সে পায়ে যিন্‌জীর বাঁধা অবস্থায় আমার সম্মুখে আনীত না হবে এবং শুলবিদ্ধ খোদাকে ছেড়ে অগ্নি খোদার বন্দেগী গ্রহণ না করবে। শেষ পর্যন্ত কাইজার চরম পরাজয় বরণ করতেও রাজী হয়। সে কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজ (Carthage) চলে যাবার সিদ্ধান্ত করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন-এর কথানুসারে কুরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বৎসর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্য কোনদিন পারসিকদের উপর বিজয়ী হতে পারবে এমন ধারনা পর্যন্ত কেহ করতে পারতেছিল না। বিজয় তো দূরের কথা, এই রাজ্যটি টিকে থাকতে পারবে এমন আশাও কারো ছিলনা। (Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire vol. II, p. 788, Modern library, Newyork) - গিবন, ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এমপায়ার ভল - ২ - ৭৮৮পৃঃ, মডার্ণ লাইব্রেরী, নিউইয়র্ক)।

কুরআনের এ আয়াত সমূহ যখন নাজিল হয়, তখন মক্কার কাফেররা ইহা নিয়ে খুব ঠাট্টা বিদ্রুপ করল। উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সহিত এই শর্তে বাজী ধরল যে, তিন বৎসরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হলে আমি দশটি উট দিব। অন্যথায় তোমাকে দশটি উট দিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) এ শর্ত আরোপের কথা জানতে পেরে তিনি বললেন ঃ কুরআনে তো "বিদ'ই-সিনিনা" বলা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় "বিদাউন" শব্দটি দশ এর কম সংখ্যা বুঝায়, কাজেই দশ বৎসরের মধ্যে এ কথার সত্যতা প্রকাশিত হওয়ার উপর শর্ত কর। আর উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে একশত করে লও। হযরত আবুবকর (রাঃ) উবাই এর সহিত আবার কথা বললেন এবং নতুন করে শর্ত করা হল যে, দশ বৎসরের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে যার কথাই মিথ্যা প্রমাণিত হবে, সে একশতটি উট দিবে।

এদিকে ৬২২ খৃষ্টাব্দে নবী করীম (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। আর ওদিকে কাইজার হেরাক্লিয়াস চুপিসারে কনস্টান্টিনোপল হতে কৃষ্ণ সাগরের পথে

www.pathagar.com

'তরাবজন' এর দিকে রওয়ানা হয়। এখান হতে সে পিছন দিক হতে পারস্যের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই জবাবী হামলার প্রস্তুতি চালাবার জন্য কাইজার গীর্জার নিকট অর্থ সাহায্য চাইল। খৃষ্টান গীর্জায় সারজিস (sergius) নামক প্রধান বিশপ খৃষ্টান ধর্মকে মজুসী ধর্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গীর্জায় দান বাবদ সংগৃহীত অর্থ সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল। হেরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া হতে আক্রমন শুরু করল। পরের বৎসর ৬২৪ সনে সে আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুস্ত এর জন্মস্থান 'আরমিয়া' (Clorumia) ধ্বংস করে ও পারস্যের সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিকেন্দ্রটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। আল্লাহর কুদরাতের মহিমা দেখুন, ঠিক এ বৎসরই মুসলমানরা 'বদর' যুদ্ধে প্রথমবার মুশরিকদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। সূরা রূমে যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা এভাবেই দশ বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই এবং একই সংগে অতি বিস্ময়কর ভাবে সত্য প্রমাণিত হল।

এ সবের পর কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে কাহারো মনে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকল না। আরবের অসহায় মুশরিকরা উহার প্রতি ঈমান আনল। উবাই ইবনে খালফ এর উত্তরাধিকারীদেরকে পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে শর্তানুযায়ী উটগুলি দিয়ে দিতে হল।.তিনি সেইগুলি নিয়ে নবী করীম (ছাঃ) -এর নিকট হাযির হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, উটগুলিকে সদকা করে দাও। কেননা যখন শর্ত করা হয়েছিল তখন শরীয়ত বাজি জুয়াকে হারাম করে কোন হুকুম নাজিল হয় নাই। কিন্তু এখন তো তা হারামই হয়ে গিয়েছে। এ কারণে যুদ্ধমান কাফের প্রতিপক্ষের নিকট থেকে শর্তের বিনিময়ে পাওয়া মাল গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হল; কিন্তু উহাকে নিজে ভোগ-ব্যবহার করার পরিবর্তে উহা দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন - সংক্ষেপিত)।

সূরা রূমের উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহতায়ালা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণসহ তৎকালীন কাফের মুশরিকদেরকে অতি স্পষ্টভাবে আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারী অগ্নি উপাসকরা যারা রোম সাম্রাজ্যের অধিকারী আহলে কিতাব (ঐশী কিতাব প্রাপ্ত) রুমীয়দেরকে ক্রামাগতভাবে পরাজিত করে চলেছে, তারা অচিরেই অর্থাৎ বেশীদিন নয়, মাত্র দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যেই বিজিত রুমীয়দের দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে এবং সে সময় মুসলমানেরাও আনন্দিত হবে (অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকদের উপর বিজয় লাভের মাধ্যমে)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর সমূহ থেকে ইহা অত্যন্ত পরিস্কার যে, এই সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন প্রবল প্রভাবশালী পারসিকরা ক্রমাগতভাবে প্রায় প্রতিটি রণক্ষেত্রেই রোমানদেরকে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত করে চলেছিল। কালক্রমে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, তারা পরসিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো তো দূরের কথা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেই সক্ষম হবে কিনা তা ছিল ঘোরতর সন্দেহ। উল্লেখ্য যে, মক্কার মূর্তিপূজক কোরেশরা নীতিগতভাবে ছিল অগ্নি- উপাসক পারসিকরদের সমর্থক। মূর্তিপূজাই করুক আর অগ্নিপূজাই করুক সব শেরেকীরা/অংশীবাদীরা পরস্পর সমমনোভাবাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, আহলে কিতাব অর্থাৎ ঐশী/আসমানী কিতাব প্রাপ্ত খৃষ্টানেরা নীতিগতভাবে ছিল মুসলমানদের নিকটবর্তী।

www.pathagar.com

কারণ মুসলমানেরাও কিতাবপ্রাপ্ত এবং তাঁরা যীশুখৃষ্টকে নবী হিসাবে মানে। তাছাড়া ধর্মীয় অনেক ব্যাপারেই মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খৃষ্টানদের নিকটবর্তী। সে হিসাবে খৃষ্টানদের পরাজয়ে মুসলমানদের জন্য অসন্তুষ্টির কারণ ছিল। বিশেষতঃ এ আয়াত নাজিল হবার পরেই মূর্তিপূজকেরা যখন মুসলমানদেরকে এ বলে ঠাট্টা, তামাসা ও বিদ্রুপ করত যে, তোমাদের সমভাবাপন্ন খৃষ্টাননেরা যেভাবে পারসিকদের দ্বারা বিপর্যস্ত হচ্ছে, তোমরাও সেভাবে আমাদের দ্বরা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

এরূপ পরিস্থিতিতেই উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে মহান আল্লাহ অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, তাদের (কাফেরদের) উৎসাহিত হবার কোনই কারণ নেই। কেননা অচিরেই অর্থাৎ দশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সাময়িকভাবে বিজয়ী পারসিকরা, পরাজিত হবে রোমানদের হাতে এবং পরবর্তীকালে মুসলমানেরাও আনন্দিত হবে (কাফের/মুশরিকদের উপর বিজয়ের মাধ্যমে)।

এ আয়াত নাজিল হবার পর কাফের মুশরিকরা কোরআনের ঘোষণাকে অবান্তর বলে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলমানেরা আল্লাহ'র এই ঘোষণার সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশ্ব-বিখ্যাত সাহাবা এবং পরবর্তীকালে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই ঘোষণা করে দেন যে, তিন বৎসরের মধ্যেই পারসিকরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিক উবাই-বিন খাল্‌ফ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে হজরত আবুবকরের (রাঃ)-এর এ দাবী প্রত্যাখান করলে, উভয়ের মধ্যে ১০ টি উট শত করে একটি বাজী ধরা হল (বাজী ধরা তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই)। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ঘটনা শ্রবনে হজরত আবুবকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যেহেতু উক্ত ভবিষ্যতবাণী অনিবার্যভাবে বাস্তবায়িত হবে, সেহেতু বাজিতে উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০ তে এবং বৎসরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দশ এ পুনঃ নির্ধারন করতে। নির্দেশ মোতাবেক তা-ই করা হল। অনন্তর দশ বৎসর অতিবাহিত হতে না হতেই কিভাবে পারসিকরা রোমানদের হাতে এবং প্রায় একই সময়ে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কট্টর কাফের/মুশরিকরা বিদ্ধস্ত হয়েছিল তা উল্লেখিত তফসীর সমূহে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ জীবদ্দশায় এবং তাঁর উপস্থিতিতেই এবং তিনি স্বয়ং তাঁর প্রিয় বিশ্বস্ত সাহাবা হজরত আবু বকর (রাঃ)-কে বাজিতে উটের সংখ্যা এবং বৎসরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। বাজিতে জেতার পর বাজিকৃত উটগুলি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সম্মুখে হাজির করাও হয়েছিল। তিনি সেগুলিকে সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এভাবে কোরআনের উপরোক্ত ভবিষ্যতবাণীটি অতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়ে ঐতিহাসিক সত্য বলেই বিরাজমান রয়েছে এবং কাফের/মুশরিক মূর্তিজূপকেরা যারা ইহা অবিশ্বাস করতো তারাও নিজ জীবনে নিজ চোখেই এর বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে গেছে।

আল-কোরআনের উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক আগাম ঘোষনাটির প্রত্যক্ষ ও সরাসরি বাস্তবায়ণ বিশ্ববাসীর নিকট চিরন্তন বিস্ময়ের বিস্ময় হয়েই থাকল।

www.pathagar.com

রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রুপকারীরা ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা

নবুয়ত প্রাপ্তীর পর রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের ঘোষণা দিলেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে চারিদিক থেকে প্রচন্ড বিরোধীতার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিশন কে অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে অংকুরেই ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আল্লাহর বাণী যাতে তিনি লোকদের নিকট ঠিকমত পৌছাতে সক্ষম না হন, সে জন্য তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করত। রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে হাসি তামাশা, ঠাট্টা মশকারী, বিদ্রুপাত্মক ধ্বংসী, মুখ ভ্যাংচানী, কথা নকল করে পাল্টা ধ্বংনী প্রদান, সভায় বক্তৃতা দেবার সময় হৈ চৈ করা ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। এরূপ পরিস্থিতিতে রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুটা হতোদ্দম হয়ে পড়লে, তাঁকে আশ্বস্ত করে আল্লাহতা'য়ালা আগাম ঘোষণা করে দেন যে, কাফের/মুশরিকদের নবী রাছূলদের প্রতি এহেন ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ নতুন কিছু নয়। পূর্ব্বেও নবী রাছূলগণের প্রতি তারা এরূপ দুর্ব্যবহার করেই আল্লাহর চরম শাস্তি ভোগ করেছে। বর্তমানেও যারা আল্লাহ'র রাছূলের প্রতি পূর্ব্বরূপ ব্যবহার করছে তাদেরকেও সেই একই ভাবে অনতিবিলম্বে ধরা হবে এবং কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর ঃ-

১। **"হে রাছূল নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বেও রাছূলগণের সহিত উপহাস করা হয়েছিল, কিন্তু অবিশ্বাসকারীদেরকে প্রথমে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, তৎপর আমি তাদেরকে ধৃত করেছিলাম। অনন্তর তাদের উপর কেমন কঠিন শাস্তিই না হয়েছিল"! (সূরা বা'য়াদ-আয়াত-৩২)।**

(ক) অবিশ্বাসীরা হজরত রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত যেরূপ উপহাস, বিদ্রুপ ও বিদ্রোহ বেয়াদবী করে ছিল যার ফলে আল্লাহতায়ালা প্রথমে তাদেরকে অবকাশ দিতেন এবং পরে সতর্ক করে দিয়ে, পরিশেষে যেরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন, এ আয়াতে হজরত রাছূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে বিজয় ও সাফল্যের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) হে রাছূল আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়, আপনার পূর্ব্ববর্তী পয়গম্বরগণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। অপরাধী ও অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষনীকভাবে ধরা হয়নি। তারা পয়গম্বরদের সাথে ঠাট্টা, বিদ্রুপ করতে করতে যখন চরম সীমায় পৌছে যায়, তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, তা রুখে দাড়াবার শক্তি কারও থাকেনি (তফসীর মা'রেফুল কোরআন)।

২। **"অনন্তর তুমি যদ্বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর এবং অংশীবাদীগণ থেকে বিমুখ হও। নিশ্চয় আমি উপহাস কারিগণ থেকে তোমাকে**

www.pathagar.com

যথেষ্ট (শক্তিশালী) করেছি। যারা আল্লাহ'র সাথে অন্য উপাস্য স্থির করে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (তাদের জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে)" (সূরা হিজর-আয়াত-৯৪-৯৬)। তাফসীর ঃ

(ক) (উপরোক্ত আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'হে নবী, তুমি অংশীবাদিগণের উপহাস ও বিদ্রুপের প্রতি দৃকপাত না করে তোমার প্রতি ভারার্পিত ইসলাম ধর্ম প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করতে থাক, উপহাসকারীরা তোমার কিছুই করতে পারবে না, কারণ তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে রেখেছি। এই সকল অংশীবাদী উপহাসকারীরা শীঘ্রই মৃত্যুদন্ডে নিপতিত হয়ে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম বুঝতে পারবে (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) "ইন্না কাফাইনাকাল মুসতাহ্ জি-ইন" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি উপহাসকারীগণ থেকে তোমাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছি। এই আয়াতে (বাক্যে) যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি ঃ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াফ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলিদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ জনই অলৌকিক ভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর হস্তক্ষেপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন - পঞ্চম খন্ড- ৩৪৮ পৃঃ। ইহা ছাড়া আ'সবিন মানরাহ্, নযর বিন-হারিস, হারিস-বিন ক্বীস, মালিক বিন ঈত্বলালাহ, উবাই বিন খালফ প্রমুখ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরোধী ও বিদ্রুপকারীদেরও শোচনীয় ভাবে অপমৃত্যু ঘটে)।

৩। **"অনন্তর তারা যা পাপ অর্জন করেছিল উহার অপকৃষ্টতা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং (বর্তমানেও) উহাদের মধ্যে যারা নবীকে অত্যাচার করছে (এবং এর মাধ্যমে) তারা যা (পাপ) অর্জন করছে, তার অপকৃষ্টতা অচিরেই তাদের উপর নিপতিত হবে এবং তারা উহা প্রতিরোধ করতে পারবে না।" (সূরা যুমার-আয়াত-৫১)।** তফসীর ঃ-

(ক) অতীতে তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদেই ফেলেছিল (এবং তারা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল।) বর্তমান (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর) যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে যে, যা হবার তা পূর্ব্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফের মুশরিকদের) মধ্যেও যারা যালেম, (অত্যাচারী), অতি সত্বর তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকেও বিপদে ফেলবে। তারা (আল্লাহতায়ালকে) অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। সে মতে 'বদর যুদ্ধে' বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়ে (উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে) তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছিল। (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন - সংক্ষেপিত)।

(খ) মক্কার অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন যে, ইহাদের পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরাও এরূপ ভাবে নিজেদের ধন, জন ও বিদ্যা-বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হয়ে আমার প্রেরিত রাছুলগণকে অবশ্বিাস ও উপক্ষো করত, তাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার, তামাশা, বিদ্রুপ করত। কিন্তু তাদের সেই দুষ্কর্মের পরিণনাম তাদের জন্য সুফলপ্রদ হয় নাই এবং তারা যে অপকার্য করেছিল তার অবশ্যম্ভাবী পরিনাম স্বরূপ

www.pathagar.com

স্বর্গীয়/আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে তারা সকলেই সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং মক্কার অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা আমার রাছুলের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার করবে, তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকেও সেই দুষ্কার্য্যের জন্য অবশ্যই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে এবং সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা থেকে তারা কিছুই পরিত্রাণ পাবে না। এ পবিত্র আয়াতে মক্কার অবিশ্বাসীদেগের অধঃপতন ও পরাজয় সম্বন্ধে যে স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে, তা অচিরেই পূর্ণ হয়ে ঐশী বাণী কোরান শরিফের অলৌকিক সত্যতা প্রমাণিত হ.যছিল। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা- রায়া'দ, সূরা- হিজর ও সূরা- যুমার -এর উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন যে, অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকরা চিরকালই নবী রাছুলগণের বিরুদ্ধাচারণ, উপহাস, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদি করে এসেছে এবং এর ফলে তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কাজেই বর্তমানে রাছুল্লাহ (ছাঃ)-কেও তারা যে উপহাস, ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ করে চলেছে তাও নতুন কোন ঘটনা নয়। আল্লাহতায়ালার চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী অচিরেই তাদেরকেও ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিশেষে তারা চরম ভাবে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। এ শাস্তি থেকে তারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না।

উল্লেখ্য যে, যে অবস্থায় উপরোক্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নের পরিস্থিতি তখন মোটেই বিরাজমান ছিল না। মূর্তিপূজার বিরোধীতার ফলে কাফের/মুশরিকরা চারিদিক থেকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তাঁর প্রতি হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ/উৎপীড়ণ/নিপীড়ণ ইত্যাদি অবিরাম ভাবে করে চলেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহতা'য়ালা আগাম জানিয়ে দিলেন যে, তাদের এহেন অপকর্মের দরুন তাদেরকে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

বলা বাহুল্য, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত ঘোষনা প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কাফের মুশরিকরা প্রথমে বদরের জেহাদে চরম ভাবে বিদ্ধস্ত হয়। উহাতে তাদের অধিকাংশ নেতাই সূচনীয় ভাবে নিহত হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা "খয়বর", "আহযাব" ও সর্বশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে আত্মসমর্পন করে, ঘোষিত শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে বাধ্য হয়। যারা বাকী ছিল তারাও অবশেষে দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর প্রতি উপহাস ও বিদ্রুপকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তি দানের আগাম ঘোষণা অতি বিস্ময়কর ভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল, যা স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ নিজ জীবনে নিজ চোখেই দেখে গিয়েছেন। আর তারাও দেখে গেছে যারা আল্লাহর উক্ত বাণীকে অস্বীকার/অবিশ্বাস করত।

www.pathagar.com

ইসলাম ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোর বিরোধী কট্টর অবিশ্বাসী আবু লাহারের পতন সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা

আবু লাহাব ছিলেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কার কাফের কোরেশ মুশরিকদেরকে মূর্তিপুজা ত্যাগ করে একেশ্বরবাদ তথা এক আল্লাহর এবাদত করার এবং ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ, মঙ্গল লাভের আহ্বান জানালে আবু লাহাব যুক্তি সংগত কারণেই নিজ ঘনিষ্ঠজন তথা ভ্রাতুষ্পুত্র রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুয়তকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে সমর্থন, সাহায্য- সহযোগিতা করার কথা ছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে সে তাঁর চরম বিরোধিতা ও শত্রুতা করতে থাকে। শুধু বিরোধীতা আর শত্রুতাই নহে বরং অন্যান্য কাফের মুশরিকদের সাথে একাত্ব হয়ে তাঁর ধ্বংস সাধন কল্পে শুধু তাঁর পিছে লেগেই থাকতে ইতস্তত করতো না, বরং পথে-ঘাটে বিভিন্ন সভায়, বাজারে বা পবিত্র কাবায় বহিরাগতদের সাথেও তাঁর কুৎসা রটনা করতে কোন দ্বিধা করত না। ফলে বহিরাগতরা অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেত। চাচা হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে এহেন জঘন্য বিরোধীতা ছিল তখনকার আরবে প্রচলিত রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তের প্রতি এরূপ চরম বিরোধীতা ও শত্রতা পোষণের কারণেই আল্লাহ তার নাম নিয়ে তার অনিবার্য পতন/ধ্বংসের আগাম সংবাদ দিয়ে সূরা 'লাহাব' নাজিল করেন।

সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমূহ ঃ

"আবু-লাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হউক এবং সে বিনষ্ট হবে। তার ধন-সম্পদ এবং সে যা অর্জন করেছে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট নরকানলে প্রবেশ করবে।" – সূরা- লাহাব, আয়াত- ১-৫।

(ক) প্রাচীনকালে সমগ্র আরব ভূমির সর্বত্র ব্যাপক অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা, লুঠতরাজ মারামারি ও চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল। নিজের বংশ-পরিবার ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সে সমাজে কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের জান-মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শত শত বৎসর পর্যন্ত এই অবস্থাই চলছিল। এ কারণে আরব সমাজের নৈতিক মূল্যমানে 'ছেলায়ে রেহমী" অর্থাৎ "নিকটাত্মীয় লোকদের সাথে ভালো আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক" অত্যন্ত বেশী গুরুত্বলাভ করেছিল।' এ সম্পর্ক ছিন্ন করা কিংবা উহার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা না করা বা উহার হক আদায় না করা সেই সমাজে খুব বড় পাপ বলে মনে করা হত। নবী করীম (ছাঃ) যখন ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন, তখন কুরাইশদের অপরাপর বংশ-পরিবার এবং উহাদের সরদাররা তাঁর তীব্র বিরোধীতা শুরু করলেও বনু হাশেম ও বনুল মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের বংশধররা) নবী করীম (ছাঃ)-এর কেবল পক্ষাবলম্বনই করে নাই, বরং তারা প্রকাশ্যভাবে তাঁকে সমর্থন জানাতে ছিল। অথচ তাদের অনেকে তখনও তাঁর নবুয়তের প্রতি ঈমানও আনে নাই।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ ইহার মূলে ছিল আরবের সেই শতাব্দীকালের 'ছেলায়ে রেহমী' রক্ষার ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ প্রভাব। কুরাইশদের অপরাপর বংশ-পরিবারের লোকেরাও নবী করীম (ছাঃ) -এর প্রতি তাঁর রক্ত সম্পর্কের লোকদের এ সমর্থন জানানোকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল মনে করেছিল।

এ নৈতিক আদর্শকে জাহিলিয়াতের যামানায় আরবের লোকেরাও খুবই সম্মানীয় ও অবশ্য পালনীয় মনে করত। কিন্তু সে সমাজের একটি মাত্র লোক ইসলামের শত্রুতা করতে গিয়ে এই আদর্শ লংঘন করে বসল। এ লোকটি ছিল আব্দুল মুত্তলিবের পুত্র 'আবু লাহাব'। সে ছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর আপন চাচা। অর্থাৎ তাঁর পিতা ও এ লোকটি, একই পিতার পুত্র। আরবে তখন চাচাকে পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় মনে করা হত। বিশেষত ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃহীন হলে চাচা-ই তাকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসবে, তদানীন্তন আরব সমাজে চাচার প্রতি ইহাই ছিল একমাত্র আশা ভরসা। কিন্তু এ ব্যক্তি (আবু লাহাব) ইসলামের শত্রুতা ও কুফর-প্রীতির দরুন আরব সমাজের এ চিরন্তন রীতি লংঘন করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হল না।

আবু লাহাব কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর বিরোধিতার কতিপয় নমুনা ঃ

১। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সনদ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম (ছাঃ)-কে যখন ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হল, "এবং আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভয় দেখান ও সতর্ক করন" - বলে কুরআন মজীদে হেদায়েত নাযিল হল তখন এক সকাল বেলা নবী করীম (ছাঃ) 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে বলেন ঃ 'হায়, সকাল বেলার বিপদ'। তদানীন্তন আরবে যদি কেহ অতি প্রত্যুষে কোন শত্রুকে নিজের কবীলার (গোত্রের) উপর আক্রমণ চালাবার জন্য আসতে দেখতে পেত, তাহলে সে পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ চীৎকার দিতে থাকত। ইহা ছিল তখনকার সময়ের আরবের সাধারণ নিয়ম। নবী করীম (ছাঃ) -এর এই চীৎকার শুনে লোকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলঃ 'কে চীৎকার করতেছে'? বলা হল মুহাম্মদ (ছাঃ)। তখন কুরাইশদের সব বংশের লোকেরা দৌড়ে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। যে নিজে আসতে পারল সে নিজেই আসল, আর যার নিজের আসা সম্ভব হয় নাই, সে কাহাকেও পাঠিয়ে দিল বৃত্তান্ত জানবার জন্য। সবলোক যখন সমবেত হল তখন নবী করীম (ছাঃ) এক এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ 'হে বনু হাশেম, হে বনু আব্দুল মুত্তালিব, হে বনু ফহর, হে অমুক বংশ, হে তমুক বংশ। আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এ পাহাড়ের ঐ ধারে এক শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমন চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তা হলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'অবশ্যই, তোমার কাছ থেকে তো আমরা কখনও মিথ্যা কথা শুনতে পাই নাই'। তখন নবী করীম (ছাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি ঃ সম্মুখে এক কঠিনতম আযাব আসছে। এ কথা শুনার সংগে সংগে এবং অন্য কারও কিছু বলার পূর্বেই নবী করীম

www.pathagar.com

(ছাঃ) -এর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠল' ঃ " 'তাব্বান লাকা' 'তোমার সর্বনাম হউক।' এ কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ ?"

একটি বর্ণনায় ইহারও উল্লেখ আছে, নবী করীম (ছাঃ) -এর প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আবু লাহাব এক খন্ড পাথরও তুলে নিয়েছিল (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবেন জরীর)।

২। নবুয়াত লাভের পূর্বে নবী করীম (ছাঃ)-এর দুই কন্যা আবু লাহাবের উত্বা ও উতাইবা নামক দুই পুত্রের নিকট বিবাহ দেয়া হয়েছিল। নবুয়াতের পর নবী করীম (ছাঃ) যখন সকলকে ইসলাম গ্রহনের আহ্বান জানাতে শুরু করলেন, তখন আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে বলল ঃ 'তোমাদের সহিত আমার মেলামেশা হারাম যদি তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক না দাও'। ফলে উভয়েই তালাক দিয়ে দিল। উতাইবাকে (লক্ষ করে) নবী করীম (ছাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ " উহার উপর তোমার কুত্তা/ব্যাঘ্র গুলির মধ্যে থেকে একটি কুত্তা/ব্যাঘ্রকে লেলিয়ে দাও"। ইহার পর একদিন উতাইবা তার পিতার সাথে সিরিয়া সফরে যাত্রা করে। সফরকালে একটি স্থানে কাফেলা রাত্রি যাপন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করল। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলল, সাবধানে থাকবে। এখানে রাত্রিকালে হিংস্র জন্তু এসে থাকে। আবু লাহাব সংগের কুরাইশ লোকদেরকে বলল ঃ তোমরা আমার ছেলেটির জীবন রক্ষার ব্যবস্থা কর। মুহাম্মদের বদদোয়াকে আমি বড্ড ভয় করি। (কারণ সবাই জানে তাঁর দোয়া/বদদোয়া ব্যর্থ হয় না)। কাফেলার লোকেরা উতাইবার চুতস্পার্শ্বে উট শোয়াইয়ে দিল এবং সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে একটি বাঘ উষ্ট্রের বেষ্টনী ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করল ও উতাইবাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে চলে গেল। (আল ইস্তিয়াব ইবনে আবদুলবার্, আল ইসাবা ইবনে হাজার আস্কালানী, দালায়েলুন্নবুয়াত-আবুনয়ীম ইস্ফাহানী, রওযুল উনুফ-সুহাইলী)।

৩। নবী করীম (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে যেখানে গমন করতেন, এ লোকটি (আবু লাহাব) তাঁর পিছনে পিছনে চলে যেত এবং লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করত। হযরত রবীয়া ইবনে আব্বাদ-দেয়লী বলেন ঃ 'আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম'। আমি তখন পিতার সাথে 'যুল মাজাব' এর বাজারে গেলাম, সেখানে দেখলাম নবী করিম(ছাঃ) এ রূপ কথা বলছেন ঃ 'হে লোকেরা বল, 'আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই'। তাহলে তোমরা কল্যাণ পেতে পারবে'। দেখলাম তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি লোক বলতেছে ঃ 'এ লোকটি মিথ্যাবাদী। এ লোক পৈত্রিক ধর্ম থেকে ফিরে গিয়েছে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? লোকেরা বলল, এ তো তাঁর (নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচা 'আবু লাহাব') (মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী)।

মোট কথা, আবু লাহাব নবী করীম (ছাঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধতা এবং এ ধরণের অত্যন্ত নীচু ও হীন কার্য্যে সদা সর্বদা লিপ্ত হয়ে থাকত। ঠিক এ কারণেই এই সূরায় আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করে তার হীন কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

(এবং দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার অনিবার্য শোচনীয় পতন ও ধ্বংসের অগ্রিম সংবাদ দেয়া হয়েছে)।

(উল্লেখ্য যে,) আবু লাহাবের আসল নাম ছিল 'আবদুল উযয়া'। তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার রং ছিল দুধে আলতায় টক্‌টকে উজ্জল। 'লাহাব' অর্থ অগ্নিশিখা। আর 'আবু লাহাব' অর্থ 'অগ্নিশিখা সমন্বিত'। অর্থাৎ যার অগ্নিশিখা আছে। "তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়াতাব" এর অর্থ কোন কোন মুফাস্‌সির এরূপ করেছে ঃ 'চূর্ণ হয়ে যাক আবু লাহাবের হাত' আর 'ওয়াতাব' শব্দের অর্থ করেছেন ঃ 'এবং সে ধ্বংস হউক' কিংবা 'সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু মূলতঃ এ কথাগুলি সেই ব্যক্তির প্রতি কোন গালি নয়, কিংবা অতীতে ঘটে যাওয়া ব্যাপারেরও উল্লেখ ইহা নয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা কুরআনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এ ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, যদিও আরবী ভাষার নিয়মে ইহা অতীতে হয়ে গিয়েছে বুঝায় এমন শব্দে বলা হয়েছে। এরূপ বলার তাৎপর্য এ যে, এ ঘটনাটি যা ঘটবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সংঘটিত হবে, ইহার সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা এমনই নিশ্চিত, যেন ইহা অতীতে হয়ে গিয়েছে। অতীতে যা ঘটে গিয়েছে তার সংঘটিত হবার ব্যাপারে যেমন কোনই সন্দেহ থাকে না, ইহাও ঠিক তেমনি।

আর সত্যই এ সূরা নাযিল হবার পর কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হতে না হতেই তাই ঘটে গেল, যা সংঘটিত হবার ভবিষ্যদ্বানী কয়েক বৎসর পূর্বে অবর্তীণ এ সূরায় করা হয়েছিল। এখানে 'হাত চূর্ণ হবার' অর্থ নিশ্চয়ই শুধু দৈহিক হাত চূর্ণ হওয়া নয়, বরং ইহার অর্থ কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া বা যে উদ্দেশ্যের জন্য সে তার সমস্ত শক্তি ও উপায় উপকরণ লাগিয়ে চেষ্টা চালিয়ে ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। এখানে এ কথাটিই পুরাপুরিভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আবু লাহাব নবী করীম (ছাঃ)-এর দ্বীন ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে আঘাত হানবার এবং উহাকে ব্যর্থ ও অচল করে দেবার উদ্দেশ্যে তার পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু এই সূরাটির নাজিল হবার পর মাত্র সাত-আটটি বৎসর অতীত হতে না হতেই ঐতিহাসিক 'বদর' যুদ্ধে কুরাইশের অধিকাংশ সরদারই নিহত হয়ে গিয়েছিল। এ সরদাররা সকলেই ইসলামের সহিত শত্রুতা করার কাজে আবু লাহাবের সমর্থক ও সংগী-সাথী ছিল। বদর যুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের যারপরনাইভাবে পরাজিত হবার সংবাদ যখন মক্কায় পৌছল তখন আবু লাহাব মনে ভীষণ আঘাত পেল। সেই আঘাত এতই সাংঘাতিক ছিল যে, সে উহার পর সাতদিনের বেশী আর বেঁচে থাকতে পারল না। আবু লাহাবের এ মৃত্যুও ছিল অতিশয় মর্মস্পর্শী। সাংঘাতিক ধরণের উৎকট ফুসকুড়ি (কারো কারে মতে বসন্ত) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তার পরিবারবর্গ তাকে ত্যাগ করেছিল। কেননা এ রোগটি ছিল তাদের মতে অতিশয় সংক্রামক। সেই ঘরে অবস্থান করলে অন্যান্যদেরও সেই রোগ হয়ে যাবার ভয় ছিল। তার মৃত্যুর পরও তিন দিন পর্যন্ত কেহই তার নিকটে আসে নাই। তার লাশ পচে গলে যেতে লাগল। উহার দুঃসহ দূর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত লোকেরা যখন তার ছেলেদেরকে এই জন্য গালমন্দ করতে লাগল, তখন একটি বর্ণনানুযায়ী তারা কতিপয় হাবশী লোকদের দ্বারা তার লাশ দাফন করে দিল। আর অপর এক বর্ণনানুযায়ী তারা একটি গর্ত খনন করে কাষ্ঠ দ্বারা লাশটি ঠেলে উহাতে ফেলেদিল ও উপর থেকে মাটি পাথর ফেলে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল। আরও একটি দিক দিয়ে তার অধিক ও পরিপূর্ণ পরাজয় সংঘটিত হয়েছিল। যে দ্বীন ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ও উহার অগ্রগতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে সে পূর্ণ শক্তি দিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল, উত্তরকালে তার নিজের সন্তানরাই সেই দ্বীন কবুল করে নিয়েছিল। সর্ব প্রথম তার কন্যা দুর্‌রা হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে পৌছল ও ইসলাম গ্রহণ করল। মক্কা বিজয়কালে উতবা ও মুয়াত্তাব নামক তার পুত্রদ্বয় হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে পেশ করা হল এবং ঈমান এনে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করল।

কোন কোন তফসীরকারক "কাছাব" বলতে টাকা পয়সা উপার্জন অর্থও করেছেন। অর্থাৎ তার ধন সম্পদ দ্বারা যে মুনাফা সে লাভ করেছিল উহাও তার উপার্জন ছিল। আবার কতিপয় মুফাস্‌সীর ইহার অর্থ করেছেন 'সন্তান'। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন ঃ 'একজনের পুত্রও তার উপার্জন' (আবু দাউদ, ইবনে আবু হাতিম)। আবু লাহাবের পরিণতির সহিত এ দুইটি অর্থেরই পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা সে যখন ফুসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তখন তার বিপুল ধন-সম্পদও কোন কাজে আসল না, তেমনি তার সন্তানরাও তাকে অসহায় অবস্থায় মরে পঁচে যাবার জন্য ফেলে রেখেছিল ও তাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছিল। তার লাশ সম্মানের সহিত তুলে নিয়ে দাফন করার 'সৌভাগ্য'ও তাদের হয় নাই। এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই লোকরা তা বাস্তবায়িত হতে দেখতে পেল। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন-সংক্ষেপিত)।

আল-কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমুহের তরজমা ও তফসীর থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, সূরা লাহাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর আপন চাচা আবু লাহাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা ও ঘোর বিরোধীতার কারণে তার নাম উল্লেখ পূর্বক তার শোচনীয় পরিণতির যে অগ্রিম ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তা মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছিল যা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবা কেরাম, এমন কি উপস্থিত কাফের মুশরিকরাও নিজ জীবনেই উহা প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

ইসলাম ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোর বিরোধী কট্টর কাফের/মুশরিক আবু জেহেলের পতন সম্পর্কে কোরআনের আগাম ঘোষণা

মক্কার কাফের মুশরিক নেতাদের মধ্যে যারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোর বিরোধীতা করতো তাদের মধ্যে আবু জেহেল ছিল অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। সে মক্কার একজন প্রতিপত্তিশালী সরদার ছিল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করতঃ সে তাঁর প্রতিটি কাজেই বাধার সৃষ্টি করত। তাঁর ক্ষতি করার জন্য দিনরাত ষড়যন্ত্র করত। সে কোরআনের প্রতি অসত্যারোপ করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নামাজ পড়তে নিষেধ করতো এবং তার কথা না মানলে পরিণতি খুব খারাপ হবে বলেও হুমকি দিত। তাই আল্লাহতায়ালা সরাসরি আবু জেহেলের নাম না নিয়েও তাকে সতর্ক করে দিয়ে আগাম জানিয়ে দিলেন যে আমি তার দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত আছি এবং যথাসময়ে আমি তাকে ধরব এবং যথাযথ শাস্তি প্রদান করবো।

সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমুহ ঃ

১। **"অনন্তর সে সত্যানুসরণ করে নাই অথবা নামাজ পড়ে নাই, বরং সে অসত্যারোপ করেছিল ও ফিরে গিয়েছিল, তৎপর সে উদ্ধতভাবে স্বীয় পরিজনের দিকে চলে গিয়েছিল। তোমার জন্য পরিতাপের উপর পরিতাপ। পুনরায় তোমার জন্য পরিতাপ ও ততোধিক পরিতাপ। তবে কি মানুষ ধারণা করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে" (সূরা কিয়ামাহ-আয়াত ৩১-৩৬)।**

(উপরোক্ত আয়াত সমূহের) তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি পরকালকে মেনে নিতে এবং বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না, সে উপরের আয়াতে বলা সব কথাই শুনতে পেল। কিন্তু তা সত্বেও সে স্বীয় অস্বীকৃতি ও অমান্যতার নীতির উপর অবিচল ও অনড় হয়ে থাকল। আর এ আয়াত শুনবার পর সে দাম্ভিকতা ও অহমিকতা সহকারে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মুজাহিদ কাতাদাহ ও ইবনে জায়েদ বলেন, এ ব্যক্তিই ছিল আব জেহেল। আয়াতের শব্দ সমূহ থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এখানে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে সূরা আল-কিয়ামার উপরোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করার পর এ আচরণই করেছিল (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

১। **"তুমি কি তাকে অবলোকন করেছ যে নিষেধ করে, সেই সেবককে যখন সে নামাজ পড়ে। তুমি কি তাকে দেখেছ যে সু-পথের উপর আছে। অথবা সংযমশীলতা সমন্ধে আদেশ করে ? তুমি কি উহাকে দেখেছ যে, অসত্যারোপ করে ও বিমুখ হয়ে যায়? তবে কি সে জানে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে প্রত্যক্ষ করছে না? কিন্তু না, যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে নিশ্চয় আমি তার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে আকর্ষণ করব। যে ললাটের কেশগুচ্ছ অসত্য ও অপরাধযুক্ত। অতঃপর সে তার পরিষদবর্গকে আহ্বান করুক। আমি অচিরেই আমার বীররক্ষীদেরকে আহ্বান করব।" (সূরা- আলাক, আয়াত- ৯-১৬)। তফসীর সমুহ বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থসহ ঃ**

www.pathagar.com

(ক) এই কয়েকটি আয়াতে হজরত রাছুলুল্লাহ এবং ধর্মদ্রোহী আবু জেহেলের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ধর্মপ্রাণ ও সত্যানুরাগী ছিলেন এবং তিনি নামাজ পড়তেন ও লোকদিগকে সংযমী হতে আদেশ করতেন। পক্ষান্তরে, আবু জেহেল অবিশ্বাসী ছিল, সে আল্লাহর রাছুল ও কোরআনের প্রতি অসত্যারোপ করত, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নামাজ পড়তে নিষেধ করত এবং ঐ নিষেধ না শুনলে অত্যাচার করবে বলে ভয় দেখাত এবং হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অপমান করবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করত। তাই আল্লাহতায়ালা আবু জেহেলকে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন যে, আমি তার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত আছি এবং তার সমস্ত দুষ্কার্যই অবলোকন করছি। আমি যথাসময়ে তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু জেহেল হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নামাজ পড়তে নিষেধ করত এবং নামাজ পড়বার সময়ে তাঁকে নানা প্রকারে কষ্ট দিত। একদিন হজরত (ছাঃ) মাকামে ইবরাহিমে নামাজ পড়বার সময় আবু জেহেল উদ্ধতভাবে এসে বলে যে, আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়তে নিষেধ করি নাই? ইহাতে হজরত তাকে তিরস্কার করে ইহ-পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু পাপাত্মা আবু জেহেল তার উত্তরে বলে যে, তুমি আমকে কিসের ভয় দেখাচ্ছ? আমার মহাশক্তিশালী 'দার-উন-নাদুয়া বা পরামর্শ পরিষদ আছে এবং তাতে আমার সাহায্যকারী বহু সদস্য রয়েছে। তাদের সাহায্যে নিশ্চয় আমি তোমাকে বিধ্বস্ত করে দিব।' (সহি বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী)।

আল্লাহতা'লা আবু জেহেলের ঐ সকল ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরে আলোচ্য আয়াত সমূহ অবতরণ করে বলে দিলেন যে, যদি আবু জেহেল এ অবাধ্যাচরণ ও দৃষ্টতা থেকে নিরস্ত না হয়, তবে নিশ্চয় আমি এ অপরাধের জন্য তার অভিশপ্ত ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে নিয়ে নরকানলে নিক্ষেপ করব। তার যদি ইচ্ছা হয়, তবে সে তার পরামশ পরিষদ ও পরিষদ বর্গকে আহ্বান করুক। কিন্তু তারা কেহই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার রাছুলের সাহায্যের জন্য আমি আমার রক্ষীবৃন্দকে আহ্বান করব এবং তারা ধর্মদ্রোহী আবু জেহেলকে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করে ফেলবে।

'জাবানিয়া' - অর্থ বীর সৈনিক, পরাক্রান্ত দেহরক্ষী অথবা নরকের প্রহরী ফেরেশ্‌তা। ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে আকর্ষণ করার অর্থ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা। সুতরাং আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম মর্ম এই যে, আবু জেহেলের এই অসদ্ব্যবহার ও দৃষ্টতার জন্য ইসলামের বীর সৈনিকগণ অচিরেই তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এবং দ্বিতীয় মর্ম এই যে, নরকের সংরক্ষক ও প্রহরী ফেরেশতাগণ তার মাথার চুল ধরে টেনে নিয়ে তাকে নরকে নিক্ষেপ করবে। বদরের যুদ্ধে আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম মর্মের ভবিষ্যদ্বাণী অতি বিস্ময়করভাবে পূণ হয়েছিল। "দ্বার-উন-নাদুয়ার" (পরামর্শ পরিষদের) যে ১৪ জন কোরেশ দলপতি

www.pathagar.com

হজরত রাছুলুল্লাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের ১০ অথবা ১৪ জনই এই যুদ্ধে অতি শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছিল। হযরত এবনে মাসউদ বদর যুদ্ধে ধর্মদ্রোহী আবু জেহেলের শিরচ্ছেদ করে তাকে রুজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্বক হযরতের নিকেট টেনে এনে ছিলেন। (তঃ কবির) (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) যখন নবী করীম (ছাঃ) হারাম শরীফের অভ্যন্তরে পুরাপুরি ইসলামী পদ্ধতিতে সালাত (নামাজ) আদায় করতে শুরু করেছিলেন, তখন আবু জেহেল তাঁকে ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল। স্পষ্ট মনে হয়, নবুয়াত লাভ করার পরই এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার পূর্বেই নবী করীম (ছাঃ) হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে সালাত শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এ জিনিষ দেখেই কুরাইশরা সর্ব প্রথম অনুভব করতে পারে যে, নবী করীম (ছাঃ) কোন নূতন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা তো রাছুলের এই কাজকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে ছিল। কিন্তু এতে আবু জেহেলের জাহেলী আত্ম সম্মানে যেন প্রচণ্ড ঘা লাগল এবং সে তাঁকে এ বলে ধমকাতে লাগল যে, 'হারামের মধ্যে এ পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারবেনা'। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এ পর্যায়ের কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আবু জেহেলের এই ধরনের জাহেলী কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আবু জেহেল কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করল, "মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে?" লোকেরা বলল ঃ "হ্যাঁ"। সে বলল ঃ "লাত ও উজ্জার শপথ আমি যদি তাকে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখতে পাই, তাহলে তার গর্দানের উপর পা রাখব এবং তার মুখ মাটির সাথে ঘষে দিব।" একবার আবু জেহেল তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখতে পেল। আবু জেহেল তাঁর গর্দানের উপর পা রাখবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। কিন্তু সহসাই লোকেরা দেখতে পেল যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোন জিনিস থেকে যেন নিজের মুখ রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললঃ 'তাঁর (হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)) -এর ও আমার মাঝে অগ্নি গহ্বর এবং একটি ভয়াবহ জিনিস ছিল যার কিছু পক্ষ ছিল'। রাছুলে করীম (ছাঃ) বললেন ঃ ও যদি আমার নিকটে আসত, তাহলে ফিরেশতাগণ তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত'। (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জরীর, আবু হাতিম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নয়ীম ইসফাহানী, বায়হাকী)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আবু জেহেল বলল ঃ "আমি যদি মুহাম্মদ কে কা'বার নিকটে সালাত আদায় করতে দেখতে পাই, তাহলে তাঁর গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরব।" এ সংবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর শ্রুতিগোচর হয়। তখন তিনি বলেন ঃ "ও যদি এই রকম কিছু করে, তাহলে ফিরিশতারা প্রকাশ্যভাবে ওকে ধরবে"। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জরীর, আবদুর

www.pathagar.com

রাজ্জাক, আবাদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, মারদইয়া)। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন - সংক্ষেপিত)।

উপরোল্লিখিত সূরা কিয়ামাহ ও সূরা আলাকের আয়াত সমূহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নুবয়ত প্রাপ্তির পর প্রাথমিক অবস্থায় নাজিলকৃত সূরা সমূহের অন্তর্গত। উল্লেখিত তফসীর থেকে ইহা স্পষ্ট যে, উপরোক্ত আয়াত সমূহে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও আয়াতগুলি কট্টর কাফের, মুশরিক, দাম্ভিক, দূরাচার, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-এর তীব্র বিরোধী আবু জেহেল -এর প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কেই আগাম ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংগে আবু জেহেলের চরম দৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিফল স্বরূপ তার শোচনীয় পরিণতির যে অগ্রিম ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তা কিভাবে অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছিল তা বর্ণিত তফসীর সমূহ থেকে সুস্পষ্ট।

খুব দেড়ীতে নহে, বরং ইসলাম ও কুফর, হক ও বাতিলের, সত্য ও অসত্যের প্রথম মোকাবেলায়ই অর্থাৎ ঐতিহাসিক 'বদরের' জেহাদে মক্কার কাফের মুশরিক নেতাদের মধ্যে যারা সর্বদা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধ্বংস কামনা করত, এমন কি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল তাদের অধিকাংশই (বা সকলেই) নিহত হয়। হজরত ইবনে মাসউদ আবু জেহেলের শিরচ্ছেদ করে রজ্জু দ্বারা বেঁধে হেছ্রিয়ে হেছ্রিয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন।

এভাবেই আল্লাহর উপরোক্ত আগাম ঘোষণা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা সমসাময়িক কাফের মুশরিক ও সাহাবাগন, নিজ জীবনে নিজ চোখেই দেখে গেছেন।

www.pathagar.com

রাছুল্লাহ (ছাঃ) নয়, বরং তাঁর বিদ্রুপকারী শত্রুরাই নাম-নিশানাহীন, 'লেজকাটা', নির্বংশ বলে ঘোষিত

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুত্র সন্তানের ইন্তিকাল হবার বা জীবিত না থাকার কারণে মক্কার কাফের, মুশরিক, কোরেশরা তাঁকে 'আবতার'– লেজকাটা 'আটকুঁড়ে' নির্বংশ বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা 'কাউসার' নাজিল করে স্পষ্ট ভাষায় আগাম জানিয়ে দিলেন যে, 'আবতার' আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) নয়, বরং তাঁর শত্রুরাই 'আবতার' লেজকাটা নির্বংশ। পরবর্তীতে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে তাঁর বিদ্রুপকারী শত্রুরাই ছিল আবতার, লেজকাটা, নির্বংশ যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তাফসীর (বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ সহ) ঃ

"ইন্না শানিয়া লাকা হুয়াল আবতার" অর্থাৎ "যে আপনার শত্রু, সেই-ই তো ('লেজকাটা') 'আবতার' (নির্বংশ)"' (সূরা কাউসার আয়াত-১)।

সূরা নাজিলের পটভূমি ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান মারা যায় তাকে "আবতার" নির্বংশ বলা হয়। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর পুত্র হজরত কাশেম (আঃ) অথবা ইব্রাহিম (আঃ) যখন শৈশবেই মারা গেলেন তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে দোষারূপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে অবিশ্বাসী কাফের 'আস ইবনে ওয়ায়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' তার সামনে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আলোচনা হলে সে বলত, "আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়, কারণ সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করার মত কেহই থাকবে না"। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা কাউসার নাজিল হয় (ইবনে কাসীর, মাযহারী- তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

(ক) "শানিয়া" এর অর্থ শত্রুতা পোষণকারী, দোষারোপকারী। যে সকল কাফের/মুশরিক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্বংশ বলে দোষারূপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল', কোন কোন রেওয়ায়েত মতে 'ওকবা' এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে 'কাব ইবনে আশরাফ'কে বোঝানো হয়েছে (সূরাটির প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে), আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'কাউসার' অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে (বলে স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে, প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ। (তফসীরে মা'রেফুল কুরআন)।

www.pathagar.com

(খ) (পূর্বাপর ঘটনা) ঃ (সূরা 'দোহা' ও সূরা "আলাম নাশরাহ'তে আমরা দেখেছি) নবুয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (ছাঃ) অত্যন্ত কঠিন বিপদ ও জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। গোটা জাতিই তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে উৎখাত করার জন্য সবাই ছিল বদ্ধপরিকর। সব দিকেই বাধা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের পাহাড় দূরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে দিকেই তিনি তাকাতেন সে দিকেই প্রবল বিরোধিতা তাঁকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী সাথী দূরে দূরেও কোন সাফল্যের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন না। এরূপ পরিস্থিতিতে নবী করীম (ছাঃ)-কে সান্তনা দেবার জন্য ও তাঁর মধ্যে সাহস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা পর পর কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। যেমন, সূরা 'আলাম নাশরাহ লাকায়' বলা হয়েছে ঃ সত্য কথা এই যে, **"সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা আছে। নিশ্চয়ই সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততাও।"** অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কঠিনতা ও বিপদ-আপদ দেখে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইও না। এ দুঃখ ও বিপদের সময় শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং সফলতার যুগ অবশ্যই আসবে। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে সূরা 'কাউসার' নাযিল হয়েছে।

এ সূরা নাজিল করে আল্লাহ তায়ালা একদিকে যেমন নবী করীম (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সেই সংগে শত্রু পক্ষের চরম ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাবার আগাম সুসংবাদও দিয়েছেন। কুরাইশ কাফেররা বলত, 'মুহাম্মদ সমগ্র জাতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর এখন নিতান্ত বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় নিরুপায় অবস্থা'। ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) যখন নবীরূপে প্রেরিত হলেন এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন কুরাইশ বংশের লোকেরা বলতে লাগল ঃ অর্থাৎ 'মুহাম্মদ স্বজাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে', যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে কিছু কাল পর উহা শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়, তাঁরও ঠিক সেই অবস্থা-ই হয়েছে'। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার এক সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহ্মীর সামনে কখনও নবী করীম (ছাঃ)-এর উল্লেখ হলে সে বলত ঃ 'ওর কথা আর বলিও না। ওতো আবতার (শিকড়কাঁটা) ব্যক্তি। তাঁর কোন সন্তানই নেই। মরে গেলে পর তাঁর নাম লওয়ারও কেহ থাকবে না'। শিমর ইবনে আতীয়া বলেন, 'উকবা ইবনে আব মুয়াইতও নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তাই বলত' (ইবনে জরীর)।

ইবনে সায়াদ ও ইবনে আসাকির এর বর্ণনা হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করিম (ছাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন কাসেম (রাঃ)। তাঁর ছোট ছিলেন হযরত যয়নাব (রাঃ), আর তাঁর ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)। ইহাদের পরে পরপর তিনজন কন্যা উম্মে কূলসুম, ফাতিমা ও রুকাইয়া (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেমের ইন্তেকাল হয়। তাঁর পর হযরত আবদুল্লাহ ইহকাল ত্যাগ করেন। এ সময় আস ইবনে অয়েল বলল ঃ তাঁর (নবী করিম (ছাঃ) -এর) বংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি 'আবতার' (অর্থাৎ তাঁর

www.pathagar.com

শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বলা হয়েছে, আস বলেছিল ঃ 'মুহাম্মদ আবতার', তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন পুত্র সন্তান তাঁর কেহ নেই। সে যখন মরে যাবে, তখন তাঁর নাম চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে যাবে এবং তাঁর কারণে তোমরা যে অসুবিধায় পড়েছ, তা থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পারবে।'

"হুয়াল আবতার" সে-ই 'আবতার' বলা, অর্থাৎ হে নবী, আপনার শত্রু আপনাকে 'আবতার' শিকড়কাটা বা নির্বংশ বলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আব্তার তো সে, যে আপনার শত্রু। উপায় উপকরণ বঞ্চিত ব্যক্তিকেও 'আবতার' বলা হয়। যে ব্যক্তির জন্য কোনরূপ কল্যাণ ও মংগলের আশা অবশিষ্ট নাই এবং যার সফলতা লাভের সব আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, তাকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজের বংশ পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও সাহায্যকারী হিতাকাংখী থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, তাকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন ঔরসজাত সন্তান হয় নেই, কিংবা হলেও সব মারা গিয়েছে তাকে বলে 'সে নির্বংশ হয়েছে', তাকেও আবতার বলা হয়। কেননা তার অবর্তমানে তার নাম লওয়ার মত (পুত্র সন্তান) কেহই কোথায়ও থাকে নাই। মৃত্যুর পর তার নাম চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। প্রায় ঐ সব অর্থেই কাফের কুরাইশরা নবী করীম (ছাঃ)-কেও আবতার বলত। ইহার জবাবে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ "হে নবী. আবতার তুমি নও, তোমার এই শত্রুরাই হল সত্যিকারের অর্থে আবতার। মূলতঃ ইহা কোন প্রতি-আক্রমণমূলক কথা ছিল না। আসলে ইহা কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে একটি আগাম ঘোষণা মাত্র।

আর এই ঘোষনাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যে সময় যে অবস্থায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-কে আবতারই মনে করত। কুরাইশের বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত সরদাররাও যে কোন সময় আবতার হতে পারে, তা তখনকার লোকদের ধারণাতীত ব্যাপার ছিল। কেননা এ সরদাররা কেবল মক্কা শহরেই নহে, সমগ্র আরব দেশের মধ্যে পরাক্রমশালী ও সর্বদিক দিয়ে সাফল্যমন্ডিত ছিল। তারা কেবল ধন সম্পদ ও সন্তানের নিয়ামতেই ধন্য ছিল না, সারা দেশের দিকে দিকে তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী বর্তমান ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও হজ্জ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিরংকুশভাবে তাদেরই মুষ্টিবদ্ধ ছিল। এই কারণে আরবের সব গোত্র ও কবীলার সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। ৫ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত আহ্যাব যুদ্ধে কুরাইশরা অসংখ্য আরব ও ইয়াহুদী গোত্র নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ)-কে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় শহরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। ইহারই মাত্র তিনটি বৎসর পর ৮ম হিজরী সনে নবী করীম (ছাঃ) যখন মক্কায় অভিযান করলেন, তখন কুরাইশদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী বলতে কেহই ছিল না। ফলে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। অতঃপর মাত্র একটি বৎসরের মধ্যে সমগ্র আরব ভূখন্ডের উপর নবী করীম (ছাঃ)-এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন দিক থেকে গোত্রের পর গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করে

www.pathagar.com

নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আনুগত্যের 'বায়আত' গ্রহণ করেছিল। তাঁর শত্রুরা তখন সম্পূর্ণরূপে সাহায্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের নাম চিহ্ন পর্যন্ত চিরতরে মুছে গেল। তাদের সন্তানরা অবশ্য দুনিয়ায় অবশিষ্ট থাকলেও তারা আবু জেহেল, আবু লাহাব, আস ইবনে অয়েল, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত প্রমুখ কাফের সরদার ও ইসলামের দুশমন ব্যক্তিদের বংশধর রূপে মোটেই পরিচিত নয়, ইহাদের পূর্ব পুরুষ ঐ সব ব্যক্তি ছিল এমন কথাও তাদের কেহ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

রাছুলে করীম (ছাঃ)-এর শত্রুদের এই পরিণতি কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবতা মাত্র। পক্ষান্তরে নবী করীম (ছাঃ)-এর বংশধরদের প্রতি আজ সারা দুনিয়ায়ই দোয়া দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়। কোটি কোটি মুসলমান নবী করীম (ছাঃ)-এর বংশধর হবার দরুন আজ বিশ্বব্যাপী সম্মানিত, গৌরবান্বিত। কেবল তাঁর সহিতই নয়, এমন কি, তাঁর বংশ ও তাঁর সংগী সাথীদের (সাহাবীদের) বংশের সহিত সম্পর্ক থাকাকে বর্তমান সময়েও বিশেষ সম্মানজনক সম্পর্ক এবং (গৌরবের বস্তু) মনে করা হয়। কেহ সাইয়েদ, কেহ আলভী, কেহ আব্বাসী, কেহ হাশেমী, কেহ সিদ্দিকী, কেহ ফারুকী, কেহ উসমানী, কেহ জুবাইরী আর কেহ আনসারী বলে পরিচয় দিয়ে নিজের বংশের উচ্চতা দেখতে গৌরব বোধ করে। কিন্তু দুনিয়ার কোন একজন মানুষও নিজেকে আবু জেহেলী কিংবা লাহাবী বলতে প্রস্তুত নয়। বস্তুত ইতিহাস প্রমাণ করে দিল যে, নবী করীম (ছাঃ) 'আবতার' নন, প্রকৃত পক্ষে তাঁর শত্রুরাই আবতার ছিল এবং এখনও তাই আছে। সূরা আল-কাউসার এ ঘোষিত আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর ইহা যে অপূর্ব ও যথাযথ বাস্তবায়নতা তা কে অস্বীকার করতে পারে? (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

সূরা কাউসারের উপরোক্ত আয়াত ও তফসীর সমূহ থেকে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর পুত্র সন্তান মারা গেলে বা জীবিত না থাকার কারণে অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকরা তাঁকে অবজ্ঞাভরে 'আবতার', 'লেজকাটা', নির্বংশ,আটকুঁড়ে ইত্যাদি বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। অর্থাৎ তারা ধারণা করত যে, পুত্র সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁর নাম নিশানা থাকবে না এবং তাঁর ধর্মও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কাফের/ মুশরিকদের এরূপ বিদ্রোপের কারণে স্বভাবতঃই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মনঃক্ষুন্ন হবার কথা। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্তনা দিয়ে অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, আবতার, লেজকাটা, নির্বংশ আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) নহে, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী/বিদ্রুপকারী শত্রুরাই আবতার, লেজকাটা, নির্বংশ। ধর্মদ্রোহী কাফের মুশরিকরা যখন তাঁকে এসব বলে উপহাস ও বিদ্রোপ করত তখন তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশ্বব্যাপী সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনুধাবন করতে সক্ষম ছিল না। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ঔরষজাত পুত্র সন্তান না থাকার রহস্য একমাত্র আল্লাহতা'য়ালাই ভালভাবে জানেন। তবে কন্যা

www.pathagar.com

সন্তানের দিক দিয়ে তাঁর বংশধারা অব্যাহত পূর্বেও ছিল এখনও রয়েছে।

নবী রাছুলগণ তাঁদের উম্মতদের রুহানী বা আধ্যাত্মিক পিতা এবং তাঁদের উম্মতগণও তাঁদের আধ্যাত্মিক সন্তান। সে হিসাবে কোটি কোটি মানব সন্তান তাঁর (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর) উম্মত/সন্তান হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান রয়েছে এবং চিরকালই এরূপ থাকবে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য নবীগনের উম্মতের সংখ্যার চেয়ে অধিক হবে এবং তাঁদের 'মর্তবা' অর্থাৎ সম্মানজনক অবস্থান অতীতের অন্যান্য নবীগণের সমতুল্য। উল্লেখ্য যে, খৃষ্ট ধর্মের প্রবর্ত্তক ঈশা (আঃ) (যীশুখৃষ্ট) স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মত হবার আকাংখা পোষণ করলে আল্লাহ তাঁর আকাংখা মঞ্জুর করেন এবং শেষ বিচারের (কিয়ামতের) পূর্বেই তাঁর আকাংখা বাস্তাবায়িত হবে বলে স্বীকৃত।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব জুড়ে তার কোটি কোটি একান্ত অনুগত, ভক্ত সন্তান দিবানিশি বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে আজানে, একামতে, দরুদে, দোয়ায়/প্রার্থনায় তাঁর পবিত্র নাম, স্মৃতি স্মরণ করে যাচ্ছেন এবং চিরকালই এভাবে তাঁর নাম বিশ্বব্যাপী সু-উচ্চকিত/মহিমান্বিত করে যাবেন এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

উপরোক্ত আয়াতের তফসীর সমূহে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শুধু তখনকার সময়ের শত্রু ও বিদ্রুপকারীদেরই নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত/অনাগত সমস্ত মানবকেই অনুধানব করার জন্য চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নহে বরং তার বিদ্রোপকারী শত্রুরাই আবতার, লেজকাঁটা নিঃবংশ। তাঁর শত্রুদের বংশধরদের কেহ কেহ জীবিত থাকলেও মুখ খুলে কেহ বলতে পারে না যে, আমি আব লাহাব/ আবু জেহেলের বংশধর।

এভাবে আল্লাহর উপরোক্ত আগাম ঘোষণা অতিব বিস্ময়করভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে যা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিরাজমান।

www.pathagar.com

আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ) বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হবে এবং বিরুদ্ধাচারণকারীরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কার কাফের/ মুশরিক/ মূর্তিপূজকদেরকে মিথ্যা দেবদেবী তথা মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য আহ্বান জানান এবং সে আহ্বানে সাড়া না দিলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কাফের/ মুশরিক/মূর্তিপুজকেরা এতে কোন সাড়া না দিয়ে, উল্টো রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করে দেয়। কালক্রমে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র মক্কা তথা সমগ্র আরবের লোকেরাই তাঁর চরম বিরোধীতা করতে থাকে। পরিশেষে অবস্থা এমন করুন হয়ে দাড়ালো যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় নগণ্য সংখ্যক সাহাবাগণের পক্ষে জীবন নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ল। এমনি এক সময়ে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করে দেন যে, রাছুল (ছাঃ)-এর বিরোধীরা হল নাস্তিক ও কাফির/অবিশ্বাসী। আর এ নাস্তিকেরাই হচ্ছে লাঞ্ছিতের দল এবং অচিরেই এ লাঞ্ছিতের দল পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর এই ঘোষণার বাস্তবায়ন তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, আল্লাহ'র ঘোষিত লাঞ্ছিতের দলেরা অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই চরমভাবে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং উপায়ন্তর না দেখে অবশেষে দলে দলে ইসলামে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমুহ ঃ

১। **"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তদীয় রাছুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তারাই লাঞ্ছিতের দল। আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রাছুল বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত"। (সূরা মুজাদিলা আয়াত-২০-২১)।** তফসীর ঃ

(আলোচ্য আয়াতে) সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আমি এতদ্বারা লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত করে রেখেছি যে, আমি ও আমার রাছুল অবশ্যই বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হব। বিশ্বাসীরা অচিরেই অবিশ্বাসীদের উপর বিজয় ও গৌরবের অধিকারী হয়ে যাবে। এ অলৌকিক ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা ও সফলতার সাক্ষী জগতের ইতিহাস (তফসীর কোরান শরিফ)।

অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের প্রবল প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধাচারণের প্রতিপক্ষ আল্লাহ ও তাঁর রাছুলই নিঃসন্দেহে বিজয়ী হবে। ইহাই মহান আল্লাহর চিরন্তন নীতি। মক্কা তথা তখনকার আরবের কাফেরদের প্রতিরোধের মুখেও একই নীতি অবলম্বিত হবে। আল্লাহর পক্ষে তাঁর রাছুল (ছাঃ) ও মুসলমানেরা অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ী হবে, আর কাফের/মুশরিকরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। এ ঘোষণার প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন স্বরূপ দেখা গিয়েছিল যে, মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মক্কা/আরবের কাফের/মুশরিকরা চুড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাকিরা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

www.pathagar.com

২। **"অতঃপর তোমরা হীন বল হয়ে না এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে, আল্লাহ তোমাদের সংগে রয়েছেন। তিনি কখনই তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না"। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত-৩৫)**। তফসীর ঃ

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা অবিশ্বাসীদের উপর বিশ্বাসী মুসলমানদের বিজয় লাভের স্পষ্টতর ভবিষ্যতবাণী করে বলছেন যে, 'হে সত্য বিশ্বাসী মুসলমানগণ, ধর্ম যুদ্ধে (জেহাদে) সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালাই তোমাদের সংগী ও সহায় রয়েছেন, সুতরাং (নিঃসন্দেহে) অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধে তোমরাই বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হবে। এমতাবস্থায় তোমরা কখনই হীনতা স্বীকার করে অবিশ্বাসীদের প্রতি সন্ধির আহ্বান করো না। অবশ্য তারা পরাজিত অথবা নিরস্ত্র হয়ে সন্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, তোমরা তা করতে পার। অন্যথায় ধর্মযুদ্ধে শহীদ অথবা বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। অবশেষে সত্যিই যদি তোমরা শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ কর, তবে নিশ্চয় জানবে যে করুণাময় আল্লাহতায়ালা তোমাদের এ উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ কখনই ব্যর্থ করে দিবেন না। তিনি ইহলোক ও পরলোকে তোমাদেরকে অবশ্যই উহার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন' (তফসীর কোরান শরিফ)।

৩। **"আমার প্রেরিত বান্দাহদের নিকট আমরা পূর্বেই ওয়াদা করেছি যে, নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করা হবে, আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। অতএব হে নবী, কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও, আর দেখতে থাক। শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখতে পাবে" (সূরা ছাফ্ফাত- আয়াত-১৭১-১৭৯)**। তফসীর ঃ

(ক) আলোচ্য (আয়াতের) বিষয় ও মূল বক্তব্য ঃ সে সময় (তৌহিদ তথা একশ্বরবাদ প্রচারের অতি প্রাথমিক অবস্থায়) নবী করীম (ছাঃ) -এর তওহিদ ও পরকাল বিশ্বাসের দাওয়াতকে নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করা হত। আর হযরত (ছাঃ)-এর নবী হবার দাবীকে মেনে নিতে খুব শক্তভাবে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ সব বিষয়ে মক্কার কাফেরদেরকে অতীব জোরদার ভাষা ও ভংগিতে তাম্বীয় করা হয়েছে এ সূরায়। আর শেষভাগে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাঁকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করতেছ এ নবী অতি শীঘ্রই তোমাদের উপর বিজয়ী হবেন। আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে তোমরা নিজেদের ঘরের আঙ্গিনায় উপস্থিত দেখতে পাবে। এ ঘোষনা দেয়া হয়েছিল যখন, তখন নবী করীম (ছাঃ) -এর সাফল্য লাভের কোন দূরতম চিহ্ন বা লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। মুসলমানগণ, এ সূরার উপরোক্ত আয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সেনাবাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে, তারা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। তাদের চারভাগের তিনভাগ লোকই যখন দেশত্যাগ করে (হিজরত করে) চলে গিয়েছিল তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সংগে খুব বেশীর পক্ষে মাত্র ৪০-৫০ জন সাহাবী রয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁরা অতিশয় অসহায় অবস্থায় সব রকমের নির্যাতন সহ্য করতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-

www.pathagar.com

সাথীদেরই যে জয় হবে এ কথা ধারণা করার কোন ভিত্তিই ছিল না। বরং এ অবস্থা যারা লক্ষ করতেছিল তারা মনে করত যে, এ আন্দোলনটা মক্কার পর্বত গুহায়ই দাফন হয়ে থাকবে চিরকাল। কিন্তু পনর ষোল বৎসরের বেশীকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই মক্কা বিজয়কালে ঠিক সে সব ঘটণাই সংঘটিত হয়, যে বিষয়ে ইতিপূর্বে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহর সৈন্য বাহিনী বলতে বুঝায় সেই ঈমানদার লোকদেরকে, যারা আল্লাহর রাছুলের আনুগত্য ও অনুসরণ করছে এবং যারা তাঁর সংগে থাকবে। যেসব গায়েবী শক্তির দ্বারা আল্লাহতায়ালা হকপন্থীদেরকে সাহায্য দান করেন তারাও এর মধ্যে শামিল।

এ সাহায্য ও প্রাধান্য দানের অর্থ অনিবার্যভাবে ইহাই নয় যে, প্রত্যেক যুগে আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও তাঁর অনুসারী লোকেরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করবে। এ প্রাধান্য লাভ কয়েক প্রকারে সম্ভব। তন্মধ্যে একটি হল রাজনৈতিক প্রাধান্য। কিন্তু যেখানে আল্লাহর নবীগণ এ পর্যায়ের প্রাধ্যান্য ও আধিপত্য লাভ করেননি সেখানেও তাঁদের নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেসব জাতি তাঁদের (নবী/রাছুলদের) কথা মানে নেই এবং তাঁদের দেয়া হেদায়েতের বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বরবাদই হয়েছে। মূর্খতা ও গুমরাহীর যে দর্শনই লোকেরা রচনা করেছে এবং জীবনের যে বিকৃত রীতিনীতি জোর পূর্বক চাপিয়েছে তা সবই একটা সময়কাল পর্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেসব মহাসত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে আল্লাহ্‌র নবীগণ চূড়ান্ত ও একমাত্র সত্যরূপে পেশ করে গিয়েছেন, তা পূর্বেও যেমন অটল ছিল, আজও তা অটল সত্য। তাকে কেহ নিশ্চিহ্ন করতে পারে নাই এবং পারবেও না কোন দিন।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'খুব বেশী দিন অতিবাহিত না হতেই নিজেদের পরাজয় ও তোমাদের বিজয়কে তারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে'। এ কথাটি যেভাবে বলা হয়েছিল, সেভাবেই তা পূর্ণ হয়েছে। এ সূরা নাযিল হবার ১৪/১৫ বৎসর অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কার কাফেররা নিজেদেরই চোখে রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে বিজয়ীর বেশে তাদের শহরে তাদেরই আঙ্গীনায় প্রবেশ করতে দেখতে পেয়েছিল। উহার কয়েক বৎসর পর সেই লোকেরা ইহাও দেখল যে, ইসলাম কেবল আরবদেশেই নয়, রোম ও ইরানের বিরাট সাম্রাজ্যকেও জয় করে নিয়েছে। (তফসীর তাফহীমুল কোরআন)।

(খ) অনন্তর আল্লাহতায়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্তনা দান করে বলতেছেন, 'হে রাসুল আমার প্রেরিত পুরুষগন সমন্ধে আমার বাক্য পূর্বে কখনই বিফল হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অতএব তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর এবং

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীগণের শেষ পরিনতি লক্ষ্য করতে থাক। আমার আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে যাঁরা তোমার অনুসরণ করবে, আমার অনুগ্রহ ও সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে সেই সত্য-বিশ্বাসী সৈন্যদল অবিশ্বাসীদিগের উপর অবশ্যই পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে' (যা তুমি নিজে এবং তারা নিজেরাও নিজ চোখেই দেখতে পাবে।) (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা মুজাদিলা, সূরা মুহম্মদ ও সূরা সাফ্‌ফাত এর উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদেরকে অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের বিরোধিতা করবে তারা অবশ্যই পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের অনুসারীগণ বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হবে। কারণ আল্লাহ স্বয়ং তাদের পক্ষে রয়েছেন। ইহাই আল্লাহর চিরন্তন নীতি।

বর্ণিত তফসির সমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, যখন এই অগ্রিম ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তখন কাফের মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল, শক্তি সামর্থ ছিল খুবই নগন্য এবং সর্বত্রই তাঁরা, বিশেষ করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কী জীবনে, রাছুলুল্লাহ ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। মোট কথা, শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। অবশেষে রাছুল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

এমতাবস্থায় কাফের মুশরিক, মুনাফেক, ঈহুদীরা অর্থাৎ সমস্ত বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে তাঁদের হাতে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হবে, তা কারও কল্পনায়ও আসতে ছিলনা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রথমে 'বদর' বিজয়, পরে মক্কা বিজয়, পরিশেষে অন্যান্য বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন ঘটে। যা ঐতিহাসিক সত্য রূপে বিরাজমান।

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওমরা পালনের সত্য স্বপ্ন প্রদর্শন ও অনতিবিলম্বে 'খয়বর' বিজয়ের আগাম সংবাদ দান

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক হিজরতের প্রায় ৬ বৎসর পর মদীনায় এরূপ এক স্বপ্ন দেখেন যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে হারামে (পবিত্র কাবায়) ওমরা পালন করছেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বপ্নের কথা প্রকাশ করেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন স্বরূপ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বলে ঘোষণা করেন। অবিলম্বে প্রায় দেড় হাজার সাহাবী রাছুলুল্লাহ'র (ছাঃ)-এর সাথে সফর সংগী হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে পবিত্র মক্কার দিকে যাত্রা করেন। কাফেলা মক্কার সন্নিকট 'হোদায়বিয়া' বর্তমান নাম 'সুমায়সিয়া' নামক স্থানে পৌছলে মক্কার কাফের/মুশরিকরা তাঁদেরকে মক্কা প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে। পরে তাদের সাথে অনেক কথা কাটাকাটি ও বাদানুবাদের পর একটি সন্ধি হয়, যা ইতিহাসে 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তানুসারে সে বৎসর ওমরা পালন না করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফেলা ফেরৎ আসে এবং পর বৎসর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) 'কাযা' ওমরা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমূহ ঃ-

"নিঃসন্দেহ, আল্লাহতা'আলা স্বীয় রাছুলকে সত্যস্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবানরূপ, তোমরা ইনশাআল্লাহ মসজিদে হরমে অবশ্যই শান্তি ও নিরাপদে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথা মুড়াতে থাকবে, কেহ চুল কাটতে থাকবে, তোমাদের কোন প্রকার আশংকা থকেবে না। কিন্তু আল্লাহতা'আলা সে সমস্ত কথা অবগত আছেন যা তোমরা জান না। অনন্তর উহার পূর্বে এক নিকটবর্তী বিজয়দান করেছেন।" (সূরা ফতহ্- আয়াত-২৭) তফসীর সমূহ ঃ

(ক) নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা তাঁর রাছুলকে সত্যস্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুরূপ। ইনশাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তখন তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ চুল কর্তন করবে। (সেমতে পরবর্তী বছর তা-ই হয়েছে। এ বছর এরূপ না হবার কারণ এই যে,) আল্লাহ সে সব বিষয় (ও রহস্য) জানেন যা তোমরা জান না। (তন্মধ্যে একটি রহস্য এই যে, অর্থাৎ এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার) আগেই(তোমাদিগকে 'খয়বরের') একটি আসন্ন বিজয় দিয়েছেন যাতে তদ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম অর্জিত হয়ে যায় এবং তারা নিশ্চিন্তে ওমরা পালনা করতে পারে। বাস্তবে তাই হয়েছে (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন- সারসংক্ষেপ)।

(খ) হযরত রসুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি সদলবলে হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করছেন। তদনুসারে তিনি হজ্ব সম্পন্ন করবার জন্য সদলবলে মক্কা যাত্রা করেন, কিন্তু হোদায়িবিয়ার সন্ধির পর তিনি যখন হজ্জ সম্পন্ন না করেই মদীনা ফিরছিলেন, তখন হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তে অসন্তুষ্ট হযরত ওমর (রাঃ) হযরত রসুলোল্লার (সাঃ) নিকট অভিমান করে বললেন- হে আল্লা'র রসুল, তবে কি আল্লাহতা'আলা আপনার

www.pathagar.com

স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবেন না? উহার উত্তরে হযরত রসুলোল্লাহ এ আয়াতেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন (সহি বোখারী)।

পবিত্র কোরান শরিফে সুনিশ্চিত বিষয় সমূহ সাধারণতঃ ভুত (অতীত) কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। তাই আল্লাহতা'লা বিশ্বাসী মুসলমানগণের সমস্ত মিথ্যা ও সন্দেহ নিবারণ করে হযরত রসুলোল্লাহর সত্য-স্বপ্নের সুনিশ্চিত সফলতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলে দিলেন যে, নিশ্চয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয়তম রসুলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন "অর্থাৎ তাঁর স্বপ্ন অবশ্যই সফল হবে। যদি আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করেন, তবে এবার না হলেও আগামী বর্ষে তোমরা নির্ভয়ে ও নিরাপদে 'পবিত্রতম মসজিদ' কাবগৃহে উপস্থিত হয়ে মস্তক মুন্ডন/কেশ কর্তন পূর্বক হজ্ব ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করতে পারবে। তোমরা এবার কি জন্য হজ্ব সম্পন্ন করতে পারলেনা তার রহস্য একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লাহতা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি তোমাদেরকে শীঘ্রই একটি বিজয় দ্বারা (খয়বার বিজয়) সম্পদশালী ও শক্তি সম্পন্ন করে তুলবেন। তৎপর তোমাদের দ্বারা হজ্ব ওমরা সম্পন্ন করাবেন। বলা বাহুল্য এ অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। মুসলমানরা অচিরেই খয়বর অধিকার করে নেয় এবং পর বর্ষে হযরত রসুলোল্লাহর সহিত যথারীতি হজ্ব, ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করেন এবং উহারই পর বর্ষে হযরত রসুলোল্লাহ পবিত্র মক্কা অধিকার করে উহার যাবতীয় ধর্ম কর্ম সম্পাদনের পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এরূপে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা তাঁর প্রিয়তম রসুলের সত্যস্বপ্ন এবং 'হোদায়বিয়া সন্ধির' পর আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সাফল্য মন্ডিত করেন" (তফসীরে কোরান শরিফ)।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ এক স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে নির্বিঘ্নে ওমরা সম্পন্ন করছেন। তিনি সাহাবাগনের নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করলেন এবং ঐ বৎসরই জ্বিলকদ মাসে ওমরা পালন উপলক্ষে মক্কা রওয়ানা হবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নবীগণের স্বপ্ন ওহি বা অহি সমতুল্য যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু ঐ স্বপ্নের মধ্যে মক্কায় ওমরা পালনের জন্য কোন দিন, তারিখ/সনের স্পষ্ট ইংগিত না থাকায় স্বপ্ন প্রকাশের সাথে সাথেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ওমরা পালনের ঘোষণা প্রদান করে দিলে, সাহাবাগণও এ ধারণাই করলেন যে, ঐ বৎসরই স্বপ্নে প্রদর্শিত ওমরা পালন বাস্তবায়িত হবে (অর্থাৎ তাঁরা মক্কায় গিয়ে নির্বিঘ্নে ওমরা পালন করতে সক্ষম হবেন)। ঐ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ওমরা পালনের জন্য সাহাবাগণের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। দেখতে দেখতে চৌদ্দশত সাহাবী এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এভাবে চৌদ্দশত সাহাবা সমভিব্যাহারে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরী ৬ষ্ঠ সনের জ্বিলকদ মাসে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। ওমরা উপলক্ষে কুরবানী করার জন্য ৭০টি জানোয়ার এবং নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য তখনকার প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রত্যেকে মাত্র একটি করে কোষাবদ্ধ তলোয়ার সংগে নিলেন।

www.pathagar.com

মক্কার পবিত্র কাবাগৃহ তখন পৌত্তলিক কোরেশদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রনে। যে পরিস্থিতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন মক্কায় তখনও সেই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'য়ালা নিজেই সত্যায়িত করেছেন যে তিনি নিজেই স্বপ্নটি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখিয়েছেন (সুরা ফাত্হ্ আয়াত - ২৭)। কাজেই ইহা আসলে স্বপ্ন মাত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল আল্লাহরই এক ইংগিত এবং অহী যা পালন করা নবীর (ছাঃ)-এর জন্য একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু তখনকার আয়ত্তাধীন বাহ্যিক কার্যকরণ ও উপায় -উপকরণের দিক বিবেচনা করলে এ ইংগিতকে বাস্তবায়ণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হয় নাই। কুরাইশ, কাফের/মুশরিকরা হিজরতের পর ছয়টি বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদেরকে আল্লাহ'র ঘর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মুসলমানকেই তারা হজ্জ বা ওমরার জন্য হারাম শরীফের নিকটে যেতে দেয় নাই। এক্ষনে তারা স্বয়ং রাছুলে করীম (ছাঃ)-কে সাহাবীদের সহ মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি দেবে তা কি করে আশা করা যায়। এমতাবস্থায় ওমরার নিয়ত করেও ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধ ঘোষনারই নামান্তর ছিল। আর সশস্ত্র না হয়ে নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুদের মাঝে যাওয়া তো নিজের এবং সংগী সাথীদের জীবন প্রাণের জন্য কঠিন বিপদ ডেকে আনা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি চিন্তা করা যায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রদর্শিত ওমরা পালন করার স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না। পয়গম্বরের কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। সরাসরি অহি বা স্বপ্নরূপে অহির মারফত আল্লাহ নবী রাসূলগণকে যে নির্দেশই দেবেন, তা কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ ব্যতীতই যথাযথ ভাবে কার্যে পরিণত করাই তাঁর ঐকান্তিক কর্তব্য যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ওমরা পালনের কথা ঘোষণা দিলে, পবিত্র কাবা শত্রু পরিবেষ্ঠিত অবস্থার কথা চিন্তা করে অনেকে ওমরার কাফেলায় শরীক হতে প্রস্তুত হল না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ছিল তারা যাত্রার পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ইহা আল্লাহরই ইংগিত এবং তাঁর রাছুলই ইহা কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, ইহাই ছিল তাদের সান্ত্বনা। ফলে চৌদ্দমত সাহাবা রাছুল করীম (ছাঃ)-এর নেত্রীত্বে এই কঠিন বিপদ সংকূল সফরে বহির্গত হলেন (তফসিরে তাফহীমুল কোরআন - সংক্ষেপিত)।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফেলা মক্কার নিকটবর্তী 'জুল হোলায়ফা' নামক স্থানে উপনীত হলে হযরত (ছাঃ) গোপন সূত্রে জানতে পারলেন যে, কোরেশরা তাদের অন্যান্য সমগ্রোত্রসহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফেলাকে মক্কা প্রবেশে বাঁধা দিতে বদ্ধপরিকর এবং প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। এরূপ সংবাদ পেয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) গতিপথ পরিবর্তন করে মক্কার অনতিদূরে 'হোদায়বিয়া' (বর্তমান নাম সুমায়সিয়া) নামক স্থানে উপনীত হন। এখানে কোরেশ ও অন্যান্য গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবাদের দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদ কথা কাটাকাটি হয়। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাঁরা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কোন সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে আসে নাই। তারা শুধ 'ওমরা' পালনেরও উদ্দেশ্যেই নিরস্ত্রাবস্থায় কোরবানীর জন্তুসহ এসেছেন। কিন্তু কোন কথাই

www.pathagar.com

তারা শুনতে বা মানতে রাজী হলনা। বহুক্ষণ এভাবে বাক্যালাপের পরও যখন কোন সুরাহায় পৌছানো গেলনা তখন পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-কে পাঠানো হল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ফিরতে দেড়ী দেখে গুজব রটে গেল যে, ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। এরূপ সংবাদে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও উপস্থিত সাহাবগণের মধ্যে দারুন উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা দেখা দিল। অবশেষে পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। সাহাবাগণ প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ধর্মদ্রোহী অবিশ্বাসী কাফের-কোরেশদের মুকাবেলা করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। একটি বৃক্ষ তলে সমবেত হয়ে উপস্থিত সমস্ত সাহাবাগণই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতের উপর হাত রেখে 'বয়াত' হলেন (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন) অর্থাৎ আমৃত্যু সংকল্পে অটুট থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার বজ্র-কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন। এ 'বয়াত' বা শপথই হচ্ছে ঐতিহাসিক 'বয়াতে রেজওয়ান' যার উল্লেখ খোদ কোরআনেও রয়েছে (সুরা ফাবতহ্ আয়াত-১৮)। এরপর উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আরো ব্যাপক আলোচনার পর একটি 'সন্ধি' স্বাক্ষরিত হল। এ সন্ধিই ঐতিহাসিক 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত।

তাৎক্ষনিকভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা একটি অসম চুক্তি যা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই মনে হল। অনেক সাহাবাই এরূপ অসম চুক্তির/সন্ধির কারণে মনক্ষুন হলেন, বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) সর্বাধিক মনক্ষুন্ন হলেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে কাফেলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা, অপমান ও লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে ছিলেন। তখন মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দুরত্বে অবস্থিত 'দাজনান' নামক স্থানে (কারো কারো মতে 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে) এ সূরাটি নাযিল হলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষনা করে দেন যে, "আজ আমার নিকট এমন একটি জিনিষ এসেছে যা আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও অধিক মূল্যবান।" এ সূরায় এ সন্ধিকেই 'সুস্পষ্ট মহাবিজয়' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (সুরা ফাতহ আয়াত-১)। পরবর্তী ইতিহাস অত্যন্ত পরিস্কারভাবে প্রমান করেছে যে, পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কর্তৃক সমস্ত আরব ভুখন্ডসহ প্রায় অর্ধ পৃথিবী বিজয়ের সূচনা হয়েছিল এ হোদায়বিয়ার সন্ধির সূত্র থেকেই।

সন্ধির এরূপ একটি শর্ত ছিল যে, সে বৎসর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সংগীগণ ওমরা পালন করতে পারবেন না। তবে পরবর্তী বৎসর ওমরা পালন করতে কোন বাধা নেই। সন্ধির শর্ত মোতাবেক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সাহাবাদেরকে নিয়ে পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ৭ম হিজরীতে উল্লেখিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'মূলতবী ওমরা' পালন করছিলেন। এ ওমরাই ইতিহাসে 'ওমরাতুল কাযা' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

হুদায়বিয়ার সন্ধির অনতিবিলম্বে আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক মুসলমান ও ইসলামের জঘন্য শত্রু বিশ্বাস ঘাতক ইহুদীদের ঘাটি "খয়বর" বিজিত হয়, যার মাধ্যমে মুসলমানগণ প্রচুর গণিমতের মাল (জেহাদ লব্ধ মালামাল) হস্তগত করেন এবং মুসলমানদের শক্তি আরও দৃঢ় ও সংহত হয়।

এভাবেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে দেখা ওমরা পালন পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা ঐতিহাসিক সত্য রূপে বিরাজমান।

www.pathagar.com

মুরতাদ, কাফের মুশরিকদেরকে অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহীতার কারণে শাস্তি দানের আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে (মূর্তি পূজকদেরকে) দুনিয়াতে ও আখেরাতে শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আল্লাহর মনোনীত শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহন করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু কাফের মুশরিকরা সে আবেদনে সাড়া না দিয়ে তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। শুধু প্রত্যাখ্যানই নহে বরং ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)সহ নব দীক্ষিত মুসলমানদের উপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন শুরু করে দিল। কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতা, প্রচন্ড বিরোধীতা, সর্বাত্মক প্রতিরোধ, নিপীড়ন, নির্যাতনের কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দানের ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি দেন এবং শাস্তিদানের সেই ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই, এমনকি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ইন্তিকালের পরেও বাস্তবায়নের অংগীকার করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"তবে কি তুমি বধিরকে শ্রবণ করাতে অথবা অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করতে চাও এবং যে প্রকাশ্যে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে? কিন্তু যদি আমি তোমাকে নিয়েও যাই (অর্থাৎ তোমার ইন্তিকাল হয়ে যায়) তথাপি আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। অথবা আমি তাদেরকে (শাস্তিদানের) যে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলাম তা আমি তোমাকে প্রদর্শন করাব। অতএব নিশ্চয় আমি তাদের উপর শক্তিমান" (সূরা যুখরুফ আয়াত- ৪০-৪২)। তফসীর ঃ

(ক) অনন্তর আল্লাহতা'লা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দান করে বলছেন যে, 'হে রাছুল, যারা কর্ণ থাকতেও বধির এবং চক্ষু থাকতেও অন্ধ, তুমি সেই হতভাগ্য বিপথগামীদেরকে কখনই সুপথে আনতে বা সদুপদেশ শ্রবণ করাতে পারবে না। অতএব, এ অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য আমি তাদেরকে এ পৃথিবীতেই যেসব শাস্তি ও লাঞ্ছনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা তোমার পার্থিব জীবনেই আমি তোমাকে প্রদর্শন করাব অথবা আমার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার পূর্বেই যদি আমি তোমাকে এ পৃথিবী থেকে নিয়ে যাই, তথাপি আমি এ অবধ্যতার জন্য অবিশ্বাসীদের উপর অবশ্যই পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমার অঙ্গীকৃত শাস্তি থেকে তারা কখনই পরিত্রান পাবে না। বলা বাহুল্য, অবিশ্বাসীদের পতন ও পরাজয় এবং বিশ্বাসীবৃন্দের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার এ সকল প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশ হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবনেই পূর্ণ হয়েছিল। অবশিষ্টাংশ পূর্ণ হয়েছিল হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর তিরোধানের অব্যবহিত পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে। পবিত্র কোরানের এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সাক্ষ্য জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।'(তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) মক্কার কাফেররা মনে করত যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) -এর ব্যক্তি সত্তা-ই তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। মাঝখান থেকে এই কাঁটা দূর হয়ে গেলেই সবকিছু ঠিক ঠাক হয়ে যাবে। এ বাতিল ধারনার বশবর্তী হয়ে তারা দিনরাত মজলিস করে পরামর্শ করতে ছিল, কোন না কোন প্রকারে তাঁকে খতম করতে হবে।

www.pathagar.com

এ প্রেক্ষিতেই তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন ঃ তোমার থাকা না থাকায় প্রকৃত ব্যাপারে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। তুমি বেচে থাকলে তোমার চোখের সামনেই তাদের ভাগ্য বিপর্যস্ত হবে। আর যদি তোমাকে তুলেও নেয়া হয়, (অর্থাৎ তোমার ইন্তিকালও হয়ে যায়) তাহলেও তোমার অবর্তমানেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এদের ভাগ্য তাদের আমলের দরুনই বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে, ইহা থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারে না। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

২। **"তুমি বল 'হে আমার প্রতিপালক তারা যে বিষয়ে অংগীকৃত হয়েছে, যদি তুমি তা আমাকে প্রদর্শন কর, তবে হে আমার প্রতিপালক, তজ্জন্য আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করোনা।' এবং তারা যদ্বিষয়ে অঙ্গীকৃত হয়েছে, নিশ্চয় আমি তোমাকে উহা প্রদর্শন করতে সক্ষম।"** (সূরা মু'মিনুন আয়াত- ৯৩-৯৫)। তফসীর ঃ-

আল্লাহতা'লা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর জীবিত কালেই তদীয় বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রুকুল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টেরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এ তিনটি আয়াতে হজরত রাছূলুল্লাহ'র প্রার্থনা এবং সেই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধেই ইংগিত করা হয়েছে। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলছেন 'হে আমার প্রতিপালক প্রভু, অবিশ্বাসীদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যদি আমার জীবনেই তোমার এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়, তবে তজ্জন্য তুমি স্বীয় অনুগ্রহে বিশ্বাসীদিগকে অথবা আমাকে কোন রূপ দায়ী করিও না। তার উত্তরে আল্লাহতা'য়ালা বলে দিলেন যে, আমার অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং তোমার জীবনেই আমি অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে তোমাকে সমগ্র আরবের উপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করে দিব এবং আমি ইহা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

সূরা যুখরুফ ও সূরা মু'মিনুনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাদেরকে অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে, যারা আল্লাহর মনোনীত সত্য ধর্ম ইসলাম কে অবিশ্বাস করতঃ উহার বিরোধীতা ও প্রতিরোধ করছে তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তিদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকদেরকে অনেকবারই শাস্তি দানের ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই করুন। তারা স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)সহ কাফের/মুশরিকদের দ্বারা চরম ভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শক্তিশালী কাফের/মুশরিকদের শাস্তি দানের প্রতিশ্রুতি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছিল না বরং ইহা কাফের/মুশরিকদের নিকট অবসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, আল্লাহতায়ালার প্রত্যক্ষ মদদে এবং অতি অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাসিত ভাবে 'বদরে', 'খয়বরে', 'খন্দকে' তারা মুসলমানদের হাতে চরম ভাবে পরাজিত বিদ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। পরিশেষে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর কাফের/মুশরিকদের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয় নাই। অবশেষে দলে দলে এসে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়।

এভাবে আল্লাহতা'য়ালার কাফের/মুশরিকদেরকে শাস্তি দানের উপরোক্ত আগাম ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই বহুলাংশে এবং তাঁর তিরোধানের পরেও ক্রমে ক্রমে বাস্তবায়ীত হয়েছিল যা সাহাবগণসহ অন্যান্যরা নিজ জীবনে নিজ চোখেই দেখে গেছেন।

www.pathagar.com

ধর্মদ্রোহী কাফের/মুশরিকরা নয়, বরং আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ) ও ধর্মভীরু মুসলমানগণই পবিত্র মক্কা নগরীর বৈধ অধিকারী বলে ঘোষিত

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে, আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ অজ্ঞতার অন্ধকার সময়ে পবিত্র কাবাঘর ছিল কাফের / মুশরিক পরিবেষ্টিতও মূর্তি পূজকদের আড্ডাখানা। পবিত্র কাবা ঘর ছিল মূর্তিতে পরিপূর্ণ। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি একেশ্বরবাদ তথা মূর্তিপূজার বিপরীতে তৌহিদের ঘোষণা দিয়ে সকলকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানান। কিন্তু কাফের মুশরিকরা তা ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করে উহার বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিরোধীতা করতে থাকে। শুধু তা-ই নহে বরং তাঁর উপর অমানুষিক উৎপীড়ণ নির্যাতনও করতে থাকে। তাদের অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রতিরোধের মুখে বাধ্য হয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) মক্কা ছেড়ে চলে যাবার পর পবিত্র মক্কা ও কাবা ঘর তাদের একচ্ছত্র অধিকারে চলে আসে। যেখানে আল্লাহর ঘর আল্লাহ্'র রাছুল ও তাঁর অনুসারীদের অধিকারেই থাকার কথা সেখানে উল্টো উহা চলে যায় ধর্মদ্রোহী কাফের মুশরিক/কোরেশদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। ফলে বিনা বাঁধায় তারা পৌত্তলিক কর্মকান্ড দ্বারা উক্ত ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করে দেয় যার দরুন আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) ও সাহাবাদের ভয়ানক মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করলেন যে, কাফের মুশরিকগণ কর্তৃক পবিত্র মক্কা ও কাবাঘর নিয়ন্ত্রণ নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র। যারা আল্লাহর রাছুল ও তাঁর অনুসারীদেরকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত করেছে আল্লাহ তাদেরকে যথাসময়ে বিতাড়িত ও বিদ্ধস্ত করে দিয়ে, রাছুল (ছাঃ) ও সাহাবীদের হস্তে আল্লাহ'র ঘর অর্পণ করবেন। আল্লাহ্'র রাছুল (ছাঃ) ও মুসলমানগণ শত্রুদের সর্বপ্রকার বাঁধা বিঘ্ন মুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এ শহরে অবস্থান ও বিচরণ করতে পারবেন। বস্তুতঃ অদূর ভবিষ্যতে কাফের মুশরিকদেরকে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত করে দিয়ে পবিত্র মক্কা বিজয়ের ইহা একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা পরবর্তীতে বিস্ময়করভাবে কার্যে পরিণত হয়েছিল এবং কাফের মুশরিকদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে পবিত্র মক্কা ও কাবা ঘরের কর্তৃত্ব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হস্তে অর্পিত হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর (বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ও শানে নজুলসহ) ঃ

১। "আমি এ নগরের শপথ করে বলছি এবং তুমিই এ নগরীর বৈধ অধিকারী হবে" (সূরা বালাদ, আয়াত-১ ও ২)। শানে নজুলসহ তফসীর ঃ

শানে নজুল ঃ 'এরম' শহরের অধিবাসী সমুদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শুনে মক্কার অবিশ্বাসী কোরেশরা হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেছিল- তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে বল যে, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ' ও 'সমুদ' জাতির

www.pathagar.com

ন্যায় শাস্তি অবতরণ করেন, যেন আমরাও এ শহরের সহিত ধ্বংস হয়ে যাই। অবিশ্বাসীদের এরূপ দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরেই এ সূরা অবতীর্ন হয়েছিল। ইহা মক্কায় অবতারিত প্রাথমিক প্রত্যাদেশ সমুহের অন্যতম এবং অনেকের মতে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বৎসরই এ সূরা অবতীর্ন হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার প্রধান বিশেষত্ব।

"বালাদ" অর্থ শহর বা নগর, এ স্থানে উহার মর্মার্থ পবিত্র মক্কা নগরী। 'হেল্লুন' 'হাল্লুন' শব্দ থেকে গৃহীত, উহার অর্থ খুলে দেয়া, বন্ধন মুক্ত করা অথবা বৈধ করা। 'হেল্লুন' এর মর্মার্থ এ স্থলে সর্ব প্রকারের বৈধ অধিকারী হওয়া, সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন বর্জিত অবস্থায় মুক্তভাবে অবস্থান করা অথবা ঐরূপ ভাবে অবতরন ও বিচরণ করা।

অবিশ্বাসী কোরেশরা যখন বলেছিল যে, 'এরম শহরের সহিত' আদ ও সমুদ জাতির ন্যায় তোমাদের আল্লাহ আমাদেরকেও এ মক্কা শহরের সহিত ধ্বংস করে ফেলুন, তাহলেই তোমার কথার সত্যতা প্রমানিত হবে এবং আমরাও তখন বুঝতে পারবো যে, নিশ্চয়ই তুমি সত্য নবী। এর উত্তরে আল্লাহতায়ালা পবিত্র মক্কা নগরীর শপথ করে বলেছেন যে, হে আমার প্রিয় নবী যেহেতু তুমি এ নগরে জন্ম গ্রহন, অবতরন ও বিচরণ করছ এবং আমার অন্যতম প্রিয় নবী ইব্রাহিম (আঃ) এ নগরীকে আশির্বাদ করে গিয়েছেনে, এবং যেহেতু এই নগরে অবস্থিত পুন্যধাম কাবাকেই আমি মুসলিম জগতের 'কেবলা' বা কেন্দ্র ভূমিরূপে মনোনীত করেছি, সেহেতু অবিশ্বাসীদের দুরভিসন্ধি অনুসারে আমি এই শহরকে ধ্বংস করব না। বরং তুমি নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, অবিশ্বাসী কোরেশরা এ পবিত্র নগরীর বিধি নিষেধ করে তোমার প্রতি যতই অন্যায় অত্যাচার করুক না কেন অদূর ভবিষ্যতে আমি তোমাকে এ শহরের বৈধ অধিকারী করে দেব এবং তুমি শত্রুদিগের সর্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও বাঁধা বিঘ্নমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এ নগরে অবস্থান ও বিচরণ করতে পারবে। এতদঅনুযায়ী (দ্বিতীয় আয়াতে) হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

২। **"এবং আল্লাহ তাদেরকে কেন শাস্তি প্রদান করবেন না- যখন তারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে প্রতিরোধ করছে এবং তারা উহার সংরক্ষকও নহে, এবং ধর্ম ভীরুগণই উহার একমাত্র সংরক্ষক, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এ সম্পর্কে) অবগত নহে" (সূরা আন্‌ফাল - আয়াত-৩৪)**। তফসীর ঃ-

আল্লাহ তা'য়ালা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অবিশ্বাসী কাফের - কোরেশরা দুইটি কারণে শাস্তি ভোগ করবে। প্রথমতঃ তারা সত্য বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবাগৃহে আসতে বাঁধা সৃষ্টি করছে এবং দ্বিতীয়তঃ- তারা কাবাগৃহের আধিপত্য লাভ করে নিজেদের অযোগ্যতা, ভ্রান্ত কুসংস্কার, অংশিবাদিতা ও পৌত্তলিকতা দ্বারা উক্ত গৃহের সম্মান ও পবিত্রতা বিনষ্ট করছে। এ দু'টি কারণে তাদেরকে বিদ্ধস্ত ও ধ্বংস করে দিয়ে ধর্ম ভীরু মুসলমানদেরকে ঐ পবিত্র গৃহের আধিপত্য প্রদান করা হবে।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতটি অবিশ্বাসী কোরেশদের শাস্তি এবং মুসলমানদেরকে পূণ্যধাম পবিত্র কাবাগৃহের অধিকার প্রাপ্তীর একটি সমুজ্জল ভবিষ্যদ্বাণী। এ অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী - পবিত্র কোরআন ও ইসলামের সত্যতা অতি জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করছে। এ আয়াত অবতরনের অব্যবহতি পরেই অবিশ্বাসী কোরেশরা বদর যুদ্ধে সূচনীয়রূপে পরাস্ত এবং তাদের দলপতিগণ নিহত হয়ে চরম শাস্তি ভোগ করেছিল। অনন্তর ইহার কয়েক বৎসর পরই হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পূণ্য ভূমি মক্কা অধিকার পূর্বক পবিত্র কা'বা গৃহের আধিপত্য গ্রহণ করেছিলেন। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মূর্ত্তিপুজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের ঘোষণার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মক্কার কাফের মোশরেকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিরোধীতা ও শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল। কালক্রমে তাদের শত্রুতা ও বিরোধীতা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে মক্কায় তিষ্টে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের মারাত্মক বাঁধা ও প্রতিরোধের মুখে বাধ্য হয়েই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। নবদীক্ষিত মুসলমানগণ ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং মদীনায় চলে গেলে, কাফের মুসরেকরা মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যায়। এভাবে যেখানে নবী রাসুলগণ এবং মোমিন মুসলমানগণই পবিত্র মক্কার কাবাগৃহের অধিকারী হবার কথা, সেখানে অবৈধ ভাবে উহা কাফের মুশরিকদিগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মক্কা ত্যাগের ঘটণাটি ছিল রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। উহা পরিত্যাগ কালে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "আল্লাহর কছম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হতো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না" (তফসীরে মাযহারী - তফসীরে, মা'রেফুল কোরআন)।

উপরোক্ত তফসীর সমূহ থেকে ইহা অতি স্পষ্ট যে, মক্কার কাফের/মুশরিক মূর্তিপূজকগণ কর্তৃক পবিত্র কাবা ঘরের নিয়ন্ত্রণ ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ। আল্লাহতা'য়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, তাদের এই অবৈধ দখলদারিত্ব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং অচিরেই তাদের এ অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে উহার প্রকৃত এবং বৈধ অধিকারী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হস্তেই সমর্পণ করে দেয়া হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সময় আল্লাহতা'য়ালা উপরোক্ত ঘোষনাটি দেন- সে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জনবল ও ধনবল ছিল নিতান্তই নগন্য। তাদের এ নগন্য ও অপ্রতুল শক্তি দিয়ে বিরাট শক্তিধর কাফের/মুশরেকদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা ছিল সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ব্যাপার। মক্কা থেকে বিতারিত হয়ে এসে প্রায় তিন শত মাইল দূরে মদীনা থেকে প্রবল প্রতাপশালী কাফের/মুশরীকদেরকে হটিয়ে দিয়ে কিভাবে তাঁরা কাবা শরীফের বৈধ অধিকার প্রাপ্ত হবেন, তা ছিল এক অভাবনীয় ও অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা কখনই ব্যর্থ হবার নহে। ফলে বাস্তবে দেখা গেল যে, মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এ অসম্ভবকেও সম্ভব করে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

এভাবেই পবিত্র কাবার প্রকৃত বৈধ অধিকারী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হস্তে সমর্পণ করে দেয়ার আল্লাহর উল্লেখিত আগাম ঘোষণাটি অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

www.pathagar.com

মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে মক্কায় অবস্থানকারী কাফের/মুশরিকদের সাথে পুনঃমিলন তথা- মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

মক্কায় কাফের মুশরিকদের বিরোধীতা ও প্রতিরোধের মুখে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নির্দেশে মুসলমানগন জন্মভুমির মায়া বিসর্জন দিয়ে ও নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনগণের সংশ্রব ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহতায়ালার নির্দেশেই মুসলমানেরা মক্কায় অবস্থানকারী কাফের/মুশরিকরা ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন হওয়া সত্বেও তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। কঠোর বিশ্বাস ও ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও মানব প্রকৃতির স্বাভাবগত কারণেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। আল্লাহতায়ালাও তাঁদের এ মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, তোমাদের মধ্যে এবং মক্কার কাফের কোরেশদের সাথে অচিরেই সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেবেন। অর্থাৎ অচিরেই মুসলমানদে দ্বারা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তাদের মক্কায় অবস্থাকারী আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবে। ইহা একটি সুস্পষ্ট আগাম ঘোষনা। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এবং যারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করে (চলেছে) তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন, এবং আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং আল্লাহই ক্ষমাশীল ও করুনাময়। আল্লাহ এতদ্বিষয়ে তোমাদিগকে নিষেধ করেন না যে, যারা ধর্ম বিষয়ে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে না এবং যারা তোমাদের গৃহ সমুহ থেকে তোমাদেরকে বহিস্কৃত করে নাই, তোমরা তাদের সহিত সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন" (সূরা মুম-তাহানা, আয়াত ঃ ৭-৮)। তফসীর ঃ

(ক) পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ অবতীর্ন হবার পর বিশ্বাসী মুসলমানেরা অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। এমন কি, যে সকল অবিশ্বাসী/কাফের মুসলমানদিগের সহিত কোনরূপ শত্রুতা করে নেই, মুসলমানেরা তাদের সহিতও সদ্ব্যবহার করত না। মুসলমানদিগের এ মনোবৃত্তি এরূপ চরমে উপনীত হয়েছিল যে, হজরত আবু বকর (রাঃ) -এর কন্যা আসমার মাতা যখন মক্কা হতে মদীনায় তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি হজরত রাছুলুল্লাহর নিকট না শুনে তাকে স্বীয় গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান অথবা তার প্রদত্ত কোন উপহার গ্রহণ করেন নাই। অনন্তর আসমা হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, মক্কা হতে আমার মাতা আমার নিকট এসেছে, কিন্তু সে মুসলমান হয় নেই, এই অবস্থায় আমি তার সহিত সদ্ব্যবহার করব কিনা? হজরত বললেন, 'হ্যাঁ, সদ্ব্যবহার কর'। এ উপলক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় (সহি বোখারী)।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াত সমূহের মর্ম এই যে, অবিশ্বাসী মাত্রই তোমাদের শত্রু নহে। যে সকল অবিশ্বাসী তোমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার অথবা শত্রুতা করে নাই, অথবা যারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে নাই কিংবা যারা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করছেনা, তোমরা তাদের সহিত অসদ্ব্যবহার ও শত্রুতা করিওনা। বিশ্বাসী মুসলমানদিগের পক্ষে অবিশ্বাসী কাফেরদিগের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা অসিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ হলেও তাদের সহিত সর্বদাই সুবিচার ও সদ্ব্যবহার করবে। কারণ আজ যারা অবিশ্বাসী আছে, হয়ত কাল তারা বিশ্বাসী হয়ে সত্য-ধর্ম গ্রহণ করবে এবং আজ যে তোমাদের চরম শত্রু, হয়ত কাল সে তোমাদের পরম মিত্র হবে। সম্ভবতঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা অচিরেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত করবেন। সূতরাং তোমরা কারও সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ করবে না যার জন্য হয়ত পরিণামে তোমাদেরকে লজ্জিত অথবা অনুতপ্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়াতে আসন্ন মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং উহার অল্পদিন পরেই হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মহানগরী মক্কা অধিকৃত হয় এবং এর ফলে ইসলামের চিরশত্রু কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায় সত্য ধর্ম গ্রহণ পূর্বক ইসলামের উন্নতি ও প্রচারের জন্য আত্ম নিয়োগ করেন।

(খ) (পূর্বোল্লিখিত) আয়াত সমূহে মুসলমানগণকে তাদের কাফের আত্মীয় স্বজনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তদনুযায়ী প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা অত্যন্ত সহনশীলতার সহিত তা আমল কার্যকর করতেছিলেন। কিন্তু নিজেদের বাপ, মা, ভাই, বোন ও নিকটতর আত্মীয়দের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা যে কত বড় কঠিন ও দুঃসহ কাজ এবং যার ফলে ঈমানদার লোকদের মনের উপর দিয়ে কি প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা আল্লাহতায়ালা ভাল করেই জানতেন। এজন্য আল্লাহতায়ালা তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকারান্তরে বলে দিলেন যে, সেদিন বেশীদূরে নহে, যখন তোমাদের এ সব আত্মীয়স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজিকার শত্রুতা আগামী কাল ভালবাসায় (বন্ধুত্বে) রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এ কথাটি যখন বলা হচ্ছিল তখন এরূপ পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হবে তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু এ আয়াত কয়টি নাযিল হবার পর কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কা বিজিত হয়ে গেল। মক্কার কুরাইশেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহন করতে লাগল। ফলে মুসলমানদেরকে যে জিনিসের জন্য আশা দেয়া হয়েছিল তা কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল তা তারা নিজেদের চক্ষেই দেখতে পেয়েছিল। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে এরূপ ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে মক্কায় অবস্থানকারী ধর্মদ্রোহী কাফের/মুশরিক যারা মুসলমানদের

www.pathagar.com

শত্রু, তাদের সাথে শত্রুতা ও বৈরিতার অবসান হয়ে অচিরেই মিত্রতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে। প্রকান্তরে এতে মুসলমানদের মক্কা বিজয়েরই ইংগিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মক্কার অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর অনুগামী সাহাবাগণ বাধ্য হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হিজরতের পরও মক্কার কাফের মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে শত্রুতা ও বৈরিতা না কমে বরং বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। এমন কি সুযোগ পেলেই তারা (মক্কার কাফের/মুশরিকরা) ইসলাম ও উহার অনুসারী মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ছিল বদ্ধপরিকর। এরূপ অবস্থায় প্রবল শক্তির অধিকারী অবিশ্বাসী কোরেশদের সাথে নগন্য শক্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সহিত কিভাবে পুনঃমিলন ও বন্ধুত হবে তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ'র ঘোষনা বা বাক্য অকাট্য এবং প্রতিরোধ্য।

কার্য্যতঃ দেখা গেল অনতিবিলম্বে প্রায় বিনা বাধায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নেত্রীত্বে মুসলমানেরা মক্কা বিজয় করেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকলের সাথেই শত্রুতা ও বৈরীতার অবসান হয়ে পুনঃমিলন ও বন্ধুত স্থাপিত হয়। এভাবে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির পথ বেছে নেয়।

মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে মক্কায় অবস্থানকারী কাফের/মুশরিকদের বিরোধ অবসানের উল্লেখিত আগাম ঘোষণাটি অতি বিস্ময়কর ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা তখনকার সমসাময়িক প্রত্যেকেই নিজ জীবনে নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করেছিল, যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমানদার সৎ-কর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত/প্রতিনিধিত্ব ও আধিপত্য প্রদানের অগ্রিম ঘোষণা

বিশ্বমাঝে মনুষ্য প্রেরণের প্রথম থেকেই মহান আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার সুবিধার জন্য নবী/রাছুলগণের মাধ্যমে সহজ সরল পথ দেখিয়ে আসছেন। যারা তাঁর সেই প্রদর্শিত সৎপথে থেকে জীবন পরিচালনা করেন বা জীবন অতিবাহিত করেন তারাই সৎপথের পথিক বা সৎপথ প্রাপ্ত এবং তাঁরাই আল্লাহর মনোনীত দল বা 'হিজবুল্লাহ'। পক্ষান্তরে যারা তাঁর দেখানো পথ থেকে সড়ে গিয়ে ভিন্ন পথ ধরেছে অর্থাৎ অভিশপ্ত শয়তানের তাবেদারী করেছে তারাই শয়তানের দল বা 'হিজবুস্ শয়তান'।

আল্লাহ্ বলেন, **"আহ্লী কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের (অবিশ্বাসী) ও মূশরিক (মূর্তিপূজক) তারা চিরকাল আগুনে অবস্থান করবে, (আর) তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম দল। (পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক আমল বা সৎ কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম দল"**। (সূরা বাইয়্যেনাহ্ আয়াত ৬-৭)। আল্লাহ আরো বলেন, **"যারা আমার আয়াত তথা কোরআনকে অস্বীকার করে তারাই হল বামপন্থী, (পরকালে) তারা আগুনে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকবে।"** (সূরা-বালাদ-আয়াত-১৯-২০)। আল্লাহ্ বলেন, **"সৎ পথ অসৎ পথ থেকে পরিস্কার ভিন্ন। অতঃপর যারা 'তাগুত'কে অস্বীকার করেছে এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তারা এমন একটি হাতল ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গার নয়"** (সূরা বাকারা আয়াত-২৫৬-২৫৭)। ইহা ছাড়া আল্লাহ্তায়ালা আল কোরআনে বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, **"যারা ঈমানদার সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার"** (সুরা ত্বীন আয়াত-৬) শুধু তাই নহে আল্লাহ আরো ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল তথা সৎ কাজ করেছে তাদেরকে অন্যান্য সুবিধাদিসহ জমিনে তথা -দুনিয়াতে সেইভাবে খেলাফত (রাজত্ব)/প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেভাবে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব/রাজত্ব দান করেছিলেন পূর্ববর্তী ঈমানদার, সৎকর্মশীলদেরকে। আল্লাহর ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি কোন অলিক কল্পনা নয় বরং অনিবার্যভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনি ভাবে জমিনে খলীফা বানাবেন যেমনিভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদেরকে বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দিবেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য

www.pathagar.com

পছন্দ (মনোনীত) করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। (এই শর্তে যে) তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাহাকেও শরীক করবে না।" (সূরা নূর আয়াত-৫৫)। তফসীর ঃ

(ক) (এখানে আল্লাহতায়ালা) খিলাফত দানের যে ওয়াদা করেছেন, তা কেবল আদমশুমারীতে যারা মুসলমান, তাদের জন্য নয়, বরং তাহা সেসব মুসলমানদের জন্য যারা সত্যিকার ঈমানদার, আমল ও চরিত্রের দিক দিয়ে নেক। যারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে অনুসরণ করে চলে এবং যারা সব রকমের শিরক থেকে পবিত্র হয়ে এখলাছের সহিত নিয়মিত ভাবে আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামী করে। এসব গুণ যাদের নেই, যারা কেবল মুখে ঈমানের দাবী করে তারা আল্লাহর নিকট থেকে এরূপ ওয়াদা পাবার যোগ্য বা অধিকারী নয়, তাদের জন্য এ ওয়াদা করাও হয় নেই; কাজেই তারা ইহার অংশীদার হতে পারে না।

কুরআনে খিলাফত ও খিলাফত লাভকে তিনটি ভিন্ন রকমের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সব জায়গায়ই পূর্বাপর দৃষ্টে ইহা নির্ধারণ করা সহজ হয় যে, কোথায় এ শব্দের কি অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। উহার একটি অর্থ হল, 'আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ইখ্তিয়ারের ধারক ও বাহক হওয়া'। এ অর্থের দিক দিয়া পৃথিবীতে সকল মানুষই খলীফা। দ্বিতীয় অর্থ হল, 'আল্লাহর সর্ব্বোচ্চ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়তী বিধান (কেবল প্রাকৃতিক আইন নয়) অনুযায়ী রাষ্ট্র-পরিচালনার ইখ্তিয়ার প্রয়োগ করা।' এই অর্থের দৃষ্টিতে কেবল মুমিন ও নেক বান্দারাই আল্লাহর খলীফা হতে পারে। কেননা তারাই খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। ইহাদের বিপরীত, কাফের ও ফাসেক লোকেরা খলীফা নয়। বরং তারা বিদ্রোহী। কেননা তারা রাজ্য-সাম্রাজ্যের মালিকের দেয়া ক্ষমতা -ইখতিয়ারকে তার রাজ্যে নাফরমানীমূলক পন্থা ও পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে। তৃতীয় অর্থ এই ঃ 'এক যুগের বিজয়ী জাতির পর দ্বিতীয় এক জাতির উহাদের স্থলে অভিষিক্ত হওয়া।' খিলাফতের প্রথম দুই প্রকারের অর্থ হল প্রতিনিধিত্ব আর শেষ অর্থটি হল স্থলাভিষিক্ত হওয়া। খিলাফতের এ দুইটি অর্থই আরবী অভিধানে সর্বজনবিদিত ও সুপ্রচলিত। এখন এখানে যে লোকই আল্লাহর খিলাফত দানের কথা পাঠ করবে, সে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারে না, বরং স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, এখানে খিলাফত শব্দ দ্বারা এমন এক হুকুমত বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝায়, যাতে আল্লাহর শরীয়তি বিধান অনুযায়ী তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করা হবে। এ কারণে কাফের তো দূরের কথা, ঈমানের মৌখিক দাবীদার মুনাফিকদেরও আল্লাহর এ ওয়াদায় শরীক ও অংশীদার বানাতে অস্বীকার করা হয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, ইহা পাবার অধিকারী কেবল ঈমানদার ও নেক আমলের গুণে গুণান্বিত লোকেরা। এ জন্যই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফল স্বরূপ বলা হয়েছে এ যে, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর এ কারণেই এই পুরস্কার লাভের জন্য শর্ত করা হয়েছে এ যে, তোমরা অবশ্য খালেছভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার উপর

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাতে শিরক এর একবিন্দু সংমিশ্রণও হবে না। এ ওয়াদাকে এহেন পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলাদা করে নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজপথে নিয়ে উপস্থিত করা এবং আমেরিকা/রাশিয়া পর্যন্ত যারই কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বের ডংকা বাজতেছে, তাদের নামেই ইহাকে চালিয়ে দেয়া মূর্খতা ও চূড়ান্ত ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। এ ওয়াদা ছিল পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য পরোক্ষভাবে, আর প্রত্যক্ষভাবে ছিল সে সব লোকের জন্য যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর জামানায় বর্তমান ছিলেন। ওয়াদা যখন করা হয়েছিল তখন বাস্তবিকই মুসলমানদের উপর মহাসংকটজনক অবস্থা বিরাজমান ছিল আর দ্বীন ইসলাম তখন পর্যন্ত হেজাযের ভূমিতে মজবুতরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নেই। ইহার কিছুদিন পর এ সংকট ও ভয়-ভীতির অবস্থা দূর হয়ে গিয়ে কেবল যে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থাই কায়েম হয়েছিল তাই নয়; বরং ইসলাম আরব থেকে বাহির হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছিল। তখন উহার শিকড় কেবল জন্ম ভূমিতেই নয়, বরং পৃথিবীর বৃহত্তর এলাকায় মজবুত হয়ে বসে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই ওয়াদা হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর সময় যে পূর্ণ করেছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ ইহাই। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

(খ) **আল্লাহতায়ালার অব্যর্থ অঙ্গীকার**- অনেক খ্যাতনামা মোহাদ্দেস, তফসীরকার ও ঐতিহাসিক সহি সনদসহ বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগের অত্যাচার, নির্যাতন ও উপদ্রবে অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে যখন হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) প্রিয় জন্মভুমি মক্কা পরিত্যাগ করে মদীনায় গমণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সত্যধর্ম প্রচারের ফলে সমগ্র পৌত্তলিক আরববাসী হজরত রাছুলুল্লাহ ও তাঁর অনুগামী মুসলমানগনের ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছিল, দেশব্যাপী পৌত্তলিকতার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গীয় ইসলামের, পূণ্য প্রদীপ যখন অতি ক্ষীণ দীপ্তিতে মিটিমিটি জ্বলতেছিল, যখন চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় মদীনায় অবস্থিত অল্প সংখ্যক মুসলমান প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হবার আশংকায় অহর্নিশি উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং রজনীতে শয়নকালে পরদিন প্রভাতে নিরাপদে গাত্রোত্থান করতে পারবেন কিনা ভেবে যখন অনেক মুসলমান আতংকে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতে বাধ্য হতেন, মুসলমানদিগের সেই নিরাশাপূর্ণ ঘোর সংকটকালে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালা তাদেরকে অতি স্পষ্টতর ভাষায় আশা, আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করে ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও কর্তব্যপরায়ন, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সমস্ত ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা দূর করে দিয়ে তাদেরকে এ বিশাল বিশ্বের রাজত্ব ও আধিপত্য দান করবেন এবং বিপুল ধনৈশ্বর্য ও অফুরন্ত সুখ সম্পদ প্রদান করে জগতে তাঁদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এ সংগে আল্লাহতায়ালা মুসলমানদিগকে আরও সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসী ইসরাইল বংশীয়দিগকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নবীবর হযরত মুসা

www.pathagar.com

(আঃ)-এর দ্বারা অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহী ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে যেভাবে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করেছিলেন, এসরাইল বংশের জগদ্বিখ্যাত দাউদ ও সোলায়মান প্রমুখ নবী ও সম্রাটগণ যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেও তিনি অবিশ্বাসী আরব ও অত্যাচারী কোরেশদিগের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্ত করে তাদেরকেও সেরূপ স্বাধীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মকে তিনি বিশ্বের যাবতীয় ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবেন। কিন্তু আল্লাহতা'য়ালার এই অনুগ্রহ লাভের বিশেষ শর্ত এই যে, বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে যারা অংশীবাদিতা ও কুফর কলুষ মুক্ত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-এর পূণ অনুসরণকারী, সত্যপরায়ন, সুবিচার ও সৎকর্মশীল হবে, তাদেরকেই আল্লাহতা'য়ালা স্বীয় অঙ্গীকার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করবেন। পক্ষান্তরে মুখে মুসলমান বলে দাবী করলেও তারপর যারা অবিশ্বাসী হবে অথবা অবিশ্বাসীদের ন্যায় উপরোক্ত সত্যের ব্যতিক্রম করবে, সে সকল দুস্কার্যকারী সম্প্রদায় বিশ্বাসী মুসলমান বলে পরিচিত হলেও ইহ-পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ও লাঞ্চনা ভোগ করতে বাধ্য হবে।

ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিক সফলতা স্বর্গীয় ইসলাম ও ঐশীবাণী কোরান শরিফের সত্যতা অতি অভ্রান্তভাবে ঘোষণা করতেছে। নবীবর হজরত মুসা (আঃ) ইসরাইল বংশীয়দিগকে ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ইসরাইলদিগকে প্রকৃতিগত অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বনবী হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় শেষ জীবনের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে সমগ্র আরবীয় অবিশ্বাসী কাফেরদিগের উপর পরাক্রান্ত ও জয়যুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য এক বিশাল ধর্ম সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। অনন্তর হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অব্যবহিত পরেই খোলাফায়ে রাশেদীনের সত্যালোক উদ্ভাসিত সুবর্ণযুগে অজেয় রোমক ও পারসিক জাতির বিশাল সাম্রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য কিরূপভাবে মুসলমান জাতির গৌরবদীপ্ত চরণতলে লুটে পড়েছিল এবং পরবর্তী বনি উমাইয়া, বনি আব্বাস, বনি ফাতেমীন ও অন্যান্য বংশীয় জগদ্বিখ্যাত মোসলেম খলিফা ও সম্রাটগণের সময়ে বিশ্বের বুকে ইসলামের গৌরব ও মোসলেম সাম্রাজ্য কিরূপ অপূর্ব্বভাবে বিস্তৃত হয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের সংগে সংগে মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং সভ্যতা ও সাহিত্যে কিরূপভাবে সমগ্র ধরণী আছন্ন করে নিয়েছিল, জগতের ইতিহাসই তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তারপর মুসলমানগণ যেদিন রাজ্য ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব এবং ভোগ বিলাসের মোহে উদ্ভ্রান্ত ও আত্মহারা হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের আদেশ উপদেশ এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে, মোসলেমোচিত সৎকার্য্য, সুনীতি, সদাচার, সুবিচার ও সত্যপরায়নতা পরিত্যাগ করে অত্যাচারী, স্বার্থপর,

www.pathagar.com

দুস্কর্মশীল ও অনাচারী হয়ে উঠেছে, আল্লাহতালার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুসারে- তাঁর অনুগ্রহের অভাবে সে দিন থেকেই তাদের অধঃপতন ও দুর্গতি আরম্ভ হয়েছে, তাদের বিশ্ব-বিজয়ী বীরত্ব গর্ব্ব ধুলায় লুণ্ঠিত এবং জগৎ জোড়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য অবলীলাক্রমে হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছে। তাদের শিক্ষা সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলা শুধু প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিরূপে পর্য্যবসিত হয়ে অভ্রান্ত ঐশীবানীর সত্যতা ও সফলতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা নূরের উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা এই মর্মে ওয়াদা করেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যারা ঈমানদার, মোমেন এবং নেক আমল করে অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাছুল (ছাঃ) -এর উপর বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ ও রাছুল (ছাঃ)-এর আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং সৎকাজ করে, তাদেরকে দুনিয়ার মাঝে খলিফা বানাবেন, যেমনিভাবে খলিফা বানিয়েছিলেন পূর্ববর্তী ঈমানদার ও নেক আমলকারীগণকে। তদোপরি তাদের জন্য আল্লাহর মনোনীত ধর্ম 'দ্বীন ইসলামকে' দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। আল্লাহর উপরোক্ত ওয়াদা তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা আল্লাহর নির্ধারিত ধর্ম ইসলামকে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করে এবং সমস্ত প্রকার শেরেকী থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে এবং পূর্ণ খালেস নিয়তে আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফত লাভের উপরোক্ত ঘোষণা শর্ত সাপেক্ষ এবং এর যে কোন ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ওয়াদা প্রযোজ্য ও কার্যকর নয়।

আল্লাহ্‌র উপরোক্ত ওয়াদা যখন দেয়া হয়েছিল তখন নবদিক্ষীত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই করুন। চারিদিকে শত্রুবেষ্ঠিত হয়ে তারা নিছক আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায়, যদিও তারা শ্রেষ্ঠতম ঈমানদার ও নেক আমলধারী ছিলেন, তথাপি কিভাবে তাঁরা আল্লাহর জমিনে খেলাফত লাভ করবেন তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা কোনক্রমেই খেলাফযোগ্য নহে। বর্ণিত তফসীর সমূহ থেকে ইহা অতি স্পষ্ট যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই মক্কা বিজয় সহ আরবের প্রায় সমস্ত অবিশ্বাসীদের উপরে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানেরা ইউরোপের পূর্বপ্রান্ত থেকে এশিয়ার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের একচ্ছত্র খেলাফত বা আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

এভাবে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণা প্রত্যক্ষভাবে বাস্তাবায়িত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানেরা যখন ক্রমান্বয়ে আল্লাহর শর্ত অর্থাৎ প্রকৃত ঈমান ও নেক আমল থেকে দূরে সরে গিয়ে নামধারী মুসলমান রূপান্তরিত হয়ে পড়ল, তখনই তারা আল্লাহর উপরোক্ত ওয়াদার আওতাবহির্ভূত হয়ে যায় এবং বিশ্বজুড়ে তাদের উপর ন্যাস্ত খেলাফত রক্ষা করা দিবা স্বপ্নে পরিণত হয়। যেহেতু আল্লাহর ওয়াদা/ঘোষণা চিরন্তন ও শাশ্বত, সেহেতু এখনও আল্লাহ প্রদত্ত সেসব শর্ত সমূহ অকাট্যভাবে পূরণ সাপেক্ষে মুসলমানদের জন্য বিশ্ব খেলাফত অর্জনের পথ খোলা রয়েছে এবং চিরকালই থাকবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী নামধারী মুসলমানেরা এসব খবর রাখেন কি ?

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে কাফের/মুশরিকদের সর্বপ্রকার চালবাজী ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে উল্টো তাদের উপরই পতিত হবে বলে অগ্রিম ঘোষণা

নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই আল্লাহর নির্দেশে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কাফের, মুশরিক/মূর্তিপূজকদেরকে একেশ্বরবাদ, তৌহিদ তথা ইসলামের দিকে আহ্বান জানালে তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার পরিবর্তে প্রচন্ড বিরোধীতা ও শত্রুতা শুরু করে দেয়। তারা তাঁর নবুয়তকে অকার্যকর করার উদ্দেশ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে দিন রাত্র ষড়যন্ত্র, চালবাজী, কুট-কৌশল, কু-মন্ত্রণা ইত্যাদি করতে থাকে। শুধু তাই নহে ইসলামকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকে।

এরূপ পরিস্থিতিতেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ আগাম জানিয়ে দিলেন যে, কাফের/মুশরিকরা আল্লাহর রাছুল (ছাঃ)-কে অপদস্ত করার জন্য যতই ষড়যন্ত্র, কূট-কৌশল, বদ শলা পরামর্শ বা চালই চালুক না কেন তাদের চালবাজী, ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা, শুধু ব্যর্থই হবে না বরং উল্টো বুমেরাং হয়ে নিজেদের উপরই বর্তাবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

"ইহারা কি কোন চাল চাল্‌তে চাহে ? (ইহাই যদি হয়ে থাকে) তাহলে কুফরকারী লোকদের উপর(ই) তাদের চাল উল্টোভাবে পড়বে" (সূরা তূর আয়াত-৪২)।

মক্কার কাফেগণ রাছুল করীম (ছাঃ)-কে বিভিন্নভাবে আঘাত দেবার ও তাঁকে ধ্বংস করার মতলবে এক সংগে বসে পরস্পর যে সব কু-শলা পরামর্শ ও যোগসাজস করত এবং গোপন ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিত, 'চাল-চালানো' বলতে এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

কোরআনের বিশেষ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ইহা একটি অতীব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কী জীবনের প্রাথমিক কালে মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুসলমান ছাড়া বাহ্যত কোন শক্তিই রাছুলে করীম (ছাঃ)-এর সংগে ছিল না, (বরং) গোটা জাতিই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধামান। সেখানে ইসলাম ও কুফরির মধ্যে যে মোকাবিলা ছিল, তা ছিল একান্তই অসম, ইহা স্পষ্টভাবে প্রত্যেকের চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়ছিল। কয়েক বৎসর পরেই যে এখানে কুফরির ভিত্তি সম্পূর্ণ উল্টো গিয়ে (তারা নিজেরাই যে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে) এমন কথা কারও দূরতম ধারনায়ও তখন আসতে পারত না। বরং স্থূল দৃষ্টির লোকেরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে, কুরাইশ ও সমগ্র আরবের বিরুদ্ধতা শেষ পর্যন্ত (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর (মানুষের প্রতি ইসলাম গ্রহণের) এ দাওয়াত ও আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে অপমান করে ছাড়বে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও কোরআনের এ আয়াতে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের ভংগীতে কাফেরদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ইসলামী

www.pathagar.com

দাওয়াতকে হীন ও নীচ প্রমাণ করার মতলবে যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তদবীর ও ষড়যন্ত্রই করতে চাহ, তা করে দেখ, তা সবই (বিফল ও ব্যর্থ হয়ে গিয়ে) উল্টো তোমাদের বিপক্ষেই যাবে। তোমরা একে ধ্বংস বা পরাজিত করতে কখনই সক্ষম হবে না (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশে কট্টর কাফের/মুশরিকদেরকে পৌত্তলিকতা তথা মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর এবাদত, বন্দেগী আরাধনা/উপসনা করার জন্য আহবান জানালেন তখনই চারিদিক থেকে অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকরা প্রচন্ড বিরোধিতা ও প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাড়াল যে, পৌত্তলিক পরিবেষ্টিত অবস্থায় টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়ল। এমনি এক ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রাছুল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোষণা করে দেন কাফের মুশিরিকরা যত চেষ্টা তদবীর কু-পরামর্শ, ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তাদের সমুদয় ধ্বংসাত্মক অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র অবশ্যই ব্যথ করে দেয়া হবে অর্থাৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধে তারা গোপনে বা প্রকাশ্যে যত কূট শলা-পরামর্শ , হীন কায়দা কৌশল বা চক্রান্তই করুক না কেন তা শুধু ব্যর্থই হবে না বরং উল্টো বুমেরাং হয়ে তাদের উপরই পতিত হবে।

উল্লেখ্য যে, যে অবস্থায় এবং যে পরিস্থিতিতে তাদের সমুদয় কূট-কৌশল ব্যর্থ করে দেয়ার উপরোক্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, সে অবস্থায় এবং সে পরিস্থিতিতে উহা বাস্তবায়নের কোন সুযোগই ছিল না বা ইহা কার্যকর করার কোন লক্ষনও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। বরং চতুর্দিক থেকে নিপিড়িত ও আক্রান্ত হয়ে মুষ্টিমেয় মুসলমানেরাই উৎখাত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেয়া আল্লাহর ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি কখনই বর্থ হবার নহে। ফলে অল্পকালের ব্যবধানেই কিভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরুদ্ধ শক্তি বিদ্ধস্ত ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী ইতিহাসই উহার জলন্ত সাক্ষি।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়সহ পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কর্তৃক স্বল্পতম সময়ে অর্ধ-দুনিয়া করতলগত করার মাধ্যমে কাফের মুশরিকদের উল্লেখিত কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র, বদ-শলা পরামর্শ ব্যর্থ হয়ে গিয়ে উল্টো তাদের উপরই কিভাবে বর্তিয়েছিল তা স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তদীয় সাহাবাগন এমন কি অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকরাও নিজ জীবনে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে গেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ, রাছুল (ছাঃ) ও কোরআন বিরোধী কাফের/মুশরিকরা মুসলমানদের নিকট পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা

নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহর নির্দেশে পৌত্তলিকতা তথা মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্ তথা- তৌহিদের দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা রাছুলের (ছাঃ) -এর কথায় কান না দিয়ে তাঁর চরম বিরোধীতা ও প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ ঘোষণা করে দেন যে, যারা আল্লাহ, রাছুল (ছাঃ), কোরআনকে অস্বীকার করছে অচিরেই তারা এর ফল ভোগ করবে। তাদের সন্তান সন্ততি, ধন-সম্পাদ কোনই কাজে আসবে না। অবিলম্বে তারা পরাভূত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

১। **"নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন সম্পদ ও তাদের সন্তান সন্ততি আল্লাহর নিকট কোনই ফলপ্রদ হবে না এবং উহারাই নরকাগ্নির ইন্ধন। ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্বতবর্তীদিগের ন্যায় তারাও আমার নিদর্শনাবলীর (আয়াত সমূহের) প্রতি অসত্যারোপ করছে, এই হেতু আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। যারা অবিশ্বাস করছে , (হে নবী) তুমি তাদেরকে বল যে, অচিরেই তোমরা পরাভুত হবে এবং তোমরা নরকের দিকে একত্রিত হবে এবং যা অতি নিকৃষ্টতম স্থান" (সূরা ইমরান আযাত-১০-১২)।**

(ক) নিশ্চিতই যারা কুফরী করে, আল্লাহর সামনে তাদের অর্থ সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিন্দু পরিমানেও কাজে আসবে না। এরূপ লোকেরাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। (তাদের ব্যাপারটি এরূপ) যেরূপ ছিল ফেরাউন গোষ্ঠি এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের। (সে ব্যাপারটি ছিল এই যে,) তারা আমার নির্দেশনাবলীকে (অর্থাৎ সংবাদ ও বিধি বিধানকে) মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহতা'য়ালা তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেন। (আল্লাহতায়ালার পাকড়াও বড় কঠোর কারণ, তাঁর অবস্থা এই যে, তিনি কঠোর শাস্তি দাতা। যারা আমার নিদর্শনাবলীকে (আয়াত গুলিকে) মিথ্যা বলছে, তাদেরও তেমনি শাস্তি হবে)। আপনি কাফেরদের (আরও) বলে দিন (তোমরা মনে করবে না যে, শুধু পরকালেই এই পাকড়াও হবে। বরং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই হবে। সে মতে ইহকালে) অতিসত্বর তোমাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) পরাজিত করা হবে এবং (পরকালে) জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর জাহান্নাম হচ্ছে খুবই মন্দ ঠিকানা।

'ক্বোল লিল্লাজিনা কাফারু সাতুগলাবুন' -এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরেরা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফেরকে তো পরাভূত হতে দেখি না, এর কারণ কি ? উত্তর এই যে, এ আয়াতে সারা জগতের কাফেরদেরকে বুঝানো হয় নি, বরং তখনকার অবিশ্বাসী, মুশরিক ও ইহুদী জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরেকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদেররকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের (বিতাড়নের মাধ্যমে) পরাজিত করা হয়েছিল।" (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

www.pathagar.com

(খ) এই আয়াত সমূহে ইসলামের বিরুদ্ধাচারী এবং হজরত রাছুলুল্লাহর পরম শত্রু কোরেশ (কাফের/মুশরিক) ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। ফেরাউন ও তার সমস্প্রদায় হজরত মুসার প্রতি অসত্যারোপ করে অফুরন্ত ধন-জন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেরূপ সদল বলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, সে ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন যে, যারা আমার রাছুলের প্রতি অসত্যারোপ অথবা আমার বাক্যকে অবিশ্বাস করবে, তারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে নরকগামী হবে। 'তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবে না'। ইহার মর্ম এই যে, তারা যে ধন জনের গর্বে অন্ধ হয়ে সত্য ধর্ম অবিশ্বাস এবং সত্য নবীর প্রতিকূলতা করছে, সেই ধন-জন আল্লাহর কোপ ও শাস্তি হতে তাদেরকে ইহকালেও রক্ষা করতে পারবে না এবং পরকালেও মুক্তি দিতে সামর্থ্য হবে না।

এই আয়াতদ্বয় পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং ইসলামের সফলতার এক উজ্জল ভবিষ্যদ্বাণী। যখন উক্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় তখন কোরেশদিগের অধীনে বিপুল ধন-জন ছিল, কিন্তু হজরত রছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে স্বীয় অনুগামীগণসহ মদীনা গমন পূর্বক সত্যপ্রচারে আত্ম নিয়োগ করায়, সে আক্রোশে তারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য আরও অধীর ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানের ধনবল ও জনবল এত অল্প ছিল যে, কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া তো দূরের কথা তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তিও মুসলমানদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমায় অদুর ভবিষ্যতে কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত ধন-বল ও জনবল মুসলমানদের চরণতলে লুণ্ঠিত হয়ে ইসলামের সত্যতা এবং কোরানের বাণীর সফলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে।

পূববর্তী আয়াত সমূহে ফেরাউন সমপ্রদায়ের ধ্বংস-প্রাপ্তির উদাহরণযোগে হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারিদিগের শোচনীয় পরাজয়ের যে আভাস প্রদান করা হয়েছে, এ আয়াত তার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টতর ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহতা'য়ালা বলতেছেন, 'হে মোহাম্মদ (ছাঃ) ! তুমি সেই অবিশ্বাসীদেরকে বল যে, তোমরা (নিশ্চয়ই) পরাভূত হবে এবং নরকের দিকে একত্রিত হবে এবং উহা নিকৃষ্ঠতম স্থান'। হজরত রছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শত্রুদিগের দূর্গতি ও পরলৌকিক শাস্তির প্রত্যাদেশ সমূহের মধ্যে এ আয়াত সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও স্পষ্টতর।

পূর্বোক্ত আয়াতের ভবিষ্যদ্বানীর সফলতা স্বরূপ হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বদর যুদ্ধে অলৌকিকভাবে জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, হজরতের মদীনা গমনের পর ইসলামের উন্নতি ও পরিপুষ্টির দ্রুতগতি অবলোকন করে ইসলাম বৈরী আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, ওতবা প্রমুখ মক্কার কোরেশ দলপতিগণ মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য সমরোয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। হজরত (ছাঃ) তদ্শ্রবণে কোরেশদিগের গতিরোধ করবার জন্য মাত্র ৩১৩ জন বিশ্বাসী অনুগামী সহ মক্কা ও মদীনার অন্তবর্তী 'বদর' প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। উপরেক্ত ৩১৩ জন বিশ্বাসীর মধ্যে মাত্র ২ জন অশ্বরোহী, ৮০ জন অসিধারী ও কতিপয় বর্মাবৃত পুরুষ ছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই প্রস্তরাদি নিয়ে আত্মরক্ষার আয়োজন করেছিলেন। এতদভিন্ন হজরতের সংগে আর কোনই রণসম্ভার বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। পক্ষান্তরে কোরেশদিগের প্রায় সহস্রাধিক যোদ্ধা

www.pathagar.com

রীতিমত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রণদক্ষ বীর সেনাপতিগণের পরিচালনায় মুসলমানদিগকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর অপার করুণায় মুসলিমগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কোরেশদল শোচনীয়রূপে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আবু জেহেল ও কতিপয় কোরেশ দলপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। তাদের ৭০ জন লোক বন্দী হয় এবং অবিশষ্টরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর হযরত মদীনায় আগমন করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদীদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। ইহুদীরা দর্পভরে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে উত্তর দেয় যে, হজরত (ছাঃ) সমর বিদ্যায় অজ্ঞ ও অপরিপক্ষ কোরেশদগিকে পরাজিত করে আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করতে সাহসী হয়েছেন; কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হলেই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃত যুদ্ধ কাকে বলে। ইহুদীদিগের ঐ অহংকার ও অবাধ্যতার উত্তরে এ আয়াত অবর্তীণ হয়, যথা- "বল, তারা..... পরাভুত হবে এবং নরকের দিকে একত্রিত হবে"। এ ভবিষ্যদ্বানীরও অলৌকিক সফলতা স্বরূপ অল্প দিন পরেই মুসলমানগনের বীরপদ ভরে (ষড়ন্ত্রকারী) ইহুদীদিগের প্রধানতম কেন্দ্র "খয়বরের" সুদৃঢ় দূর্গমালা ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করা হয় এবং উত্তরকালে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির বিশাল রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য ইসলামের বিজয় দীপ্ত গৌরবভরা চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। পবিত্র কোরআন যে সর্বজ্ঞ আল্লাহর অভ্রান্তবাণী এ আয়াত তার এক উজ্জল প্রমাণ। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা ইহমরানের উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সুস্পষ্টভাবে আগাম জানিয়ে দিলেন যে, যারা ঐশীবাণী আল-কোরআন ও সত্য ধর্ম ইসলামকে অবিশ্বাস করতঃ উহার বিরোধীতা করছে তারা অচিরেই শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। অতীতে ফেরাউন ও তার অনুগামীদের মধ্যেও যারা নবী মুসা (আঃ)-কে অবিশ্বাস ও তাঁর ধর্মের বিরোধীতা করেছিল তারাও একইভাবে সদলবলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানেও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিরোধী কাফের/মুশরিকদের ধনবল ও জনবল কিছুই তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর কঠোর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ঘোষণা দেয়ার সময় কাফের মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের ধনবল ও জনবল ছিল খুবই নগন্য। এই নগন্য শক্তি দিয়ে চুতর্দিকে কাফের/মুশরিকদের বিরাট শক্তিকে কিভাবে প্রতিরোধ পর্যুদস্ত ও পরাভূত করা হবে তা কারো কল্পনায় আসতে ছিল না। যেখানে প্রবল প্রতিপত্তিশালী ও শক্তিধর কাফের/মুশরিকদের মোকাবেলায় মুষ্টিমেয় মুসলমানরা নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে কিভাবে তাদের জনবল ধনবল কোনই কাজে না এসে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে তা ভাবলে অবিশ্বাসীদের নিকট হাস্যকরই মনে হতো। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতি অবশ্যই অনিবার্য্যভাবে বাস্তবায়িত হতে বাধ্য। ফলে অনতিকালের মধ্যেই দেখা গেল যে, আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদে অতি অবিশ্বাস্যভাবে তারা প্রথমে 'বদরে' পরে 'খয়বরে', 'খন্দকে' ('আহযাবে') শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের শক্তিকে চুড়ান্ত ভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায়ই উপরোক্ত ভবিষ্যত বাণী অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিরাজমান।

www.pathagar.com

দ্বীন ইসলামকে বিশ্বের সকল ধর্মের উপর বিজয়ী, পরাক্রান্ত করার আগাম ঘোষণা/প্রতিশ্রুতি।

বিশ্ব মাঝে প্রথম মানব আদম (আঃ) কে প্রেরণের সময়েই আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছিলেন যে, দুনিয়াতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে চলার পথের পাথেয় স্বরূপ তাঁর পক্ষ থেকে সময় সময় 'হেদায়েত' তথা- পথ নির্দেশ পাঠানো হবে (সূরা বাকারা আয়াত-৩৮) যা পূর্ব্বেও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহর নির্বাচিত নবী রাছুলগনের মাধ্যমেই এসব হেদায়েত প্রেরিত হয়ে থাকে। মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাছুল এরূপ পথ নির্দেশ নিয়ে ধরাতলে এসেছিলেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান 'আল-কোরআন' অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ জীবন বিধানের (আল-কোরআনের) মাধ্যমেই মানব জাতিকে জানানো হয়েছে যে, স্রষ্টা আল্লাহর নিকট "ইসলামই" হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন/ধর্ম (সূরা- ইমরান আয়াত-১৯)। শুধু তাই নহে, এই একমাত্র জীবন বিধান বা দ্বীন/ধর্মকে বিশ্বের প্রচলিত সকল ধর্ম বা ধর্মীয় মতবাদ/মতাদর্শের উপর বিজয়ী বা পরাক্রান্ত করে দিবেন। উল্লেখ্য যে, এখানে সকল ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার অর্থ ইহা নহে যে, বিশ্বের প্রচলিত সকল ধর্মকে উৎখাত করে বা বিনষ্ট করে দেয়া হবে অথবা বিশ্বের অন্যান্য সকল ধর্মের লোকেরাই তাদের নিজেদের ধর্ম প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করে একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে, বরং ইহার তাৎপর্য এই যে, তারা (অন্যান্য ধর্মের লোকেরা) সরাসরি ইসলাম গ্রহণ না করেও ইসলামের স্বাশত চিরন্তন নীতি সমূহ গ্রহণ করবে বা করতে বাধ্য হবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর সমূহ ঃ

"তারা ইচ্ছা করে যে, তাদের ফুঁৎকার দ্বারাই আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত করে দিবে। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেন এবং যদিও অবিশ্বাসীরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। তিনিই স্বীয় রাছুলকে সুপথ ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর সু-প্রকাশিত (বিজয়ী/সুপ্রতিষ্ঠিত) করে দেন এবং যদিও (এতে) অংশীবাদীরা অসন্তুষ্ট হয়" (সূরা ছফফ- আয়াত-৮-৯)।

(ক) অবিশ্বাসীরা আশা করছে যে, তারা মুখের কথায় (অর্থাৎ ফুঁৎকারে) আল্লাহর জ্যোতিকে (দ্বীন-ইসলামকে) নির্বাপিত করে দিয়ে এই সত্য ধর্ম বিলুপ্ত করে দিবে। কিন্তু তা (একেবারেই) অসম্ভব। তারা অনিচ্ছুক এবং অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহতায়ালা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ন করে সত্য ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন অর্থাৎ তিনি এই পবিত্র ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত ও সুপ্রকাশিত করে দেবেন। এই পবিত্রতম আয়াতের দুই প্রকার মর্মার্থ হতে পারে। প্রথমতঃ হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) - এর শত্রুগণ যতই বিরোধীতা করার চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে দিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। বলা বাহুল্য, এই মর্মানুযায়ী উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জীবনেই পরিপূর্ণ হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং তাঁর তিরোধানের পূর্বেই অধিকাংশ আরববাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াত সমূহের আরও ব্যাপক অর্থও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে অর্থাৎ বিধর্মীরা ইসলাম প্রচারে যতই বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি করুক না কেন, তারা কখনই এই সত্যের গতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না। ইসলাম ধর্ম একদিন অবশ্যই জগতের সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে। কেহ কেহ বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় মর্মও পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কারণ আজ জগতের সকল জাতি এবং সকল ধর্মাবলীই ইসলামের একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব হিতৈষণা, সার্বজনীন শিক্ষা, জ্ঞানাহরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নীতি, শিক্ষা ও সদুপদেশগুলি পরিগ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে কেহ বলেন যে, অনাগত ভবিষ্যতেও উক্ত ভবিষ্যদ্বানী সমূহের পরিপূর্ণতা পূর্নরূপে বিকশিত হতে থাকবে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) স্মর্তব্য যে, এই আয়াত তৃতীয় হিজরী সনে 'ওহুদ' যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছিল। এ সময় ইসলাম শুধুমাত্র মদীনা শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না। আর সমস্ত আরব এই দ্বীনকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়ার চেষ্টায় উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সে কারণে তাঁদের দুর্বলতাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। আশেপাশের গোত্র সমূহও তাঁদের প্রতি রোষান্ধ হয়ে উঠেছিল। এরূপ অবস্থায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর এ নূর কারও নিভানোর চেষ্টায় নির্বাপিত হবে না। ইহা বরং পূর্ণ মাত্রায় উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং সমগ্র জগতে ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার লাভ করবে। মূলতঃ ইহা এক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। উত্তরকালে ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। সে কঠিন মুহূর্তে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ ছাড়া কি আর কারও জানা ছিল ? মানুষের দৃষ্টি তো তখন শুধু ইহাই দেখতে পাচ্ছিল যে, ইহা এক নিভু নিভু প্রদীপ মাত্র। আর ইহাকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য চতুর্দিকে প্রলংয়কর ঝড় উঠেছিল।

"মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হউক না কেন"-এর অর্থ যেসব লোক আল্লাহর বন্দেগীর সংগে অন্যান্যদের বন্দেগীও একত্রিত করে এবং আল্লাহর দ্বীনের সহিত অন্যান্য দ্বীনকেও সংমিশ্রিত করে, গোটা জীবন ব্যবস্থা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যারা রাজী নহে, যারা 'যখন যে মাবুদের ইচ্ছা, তখন (তার) বন্দেগী' করবার সুযোগ পেতে বদ্ধপরিকর, যে যে দর্শন ও মতবাদের উপর ইচ্ছা হবে, নিজেদের আকীদা, চরিত্র ও তাহ্যীব তামাদ্দুন সেগুলোর উপর ভিত্তি স্থাপন করবে -এই সমস্ত লোকই (ফিকাহর ভাষায় না হলেও) কার্যতঃ মুশরিক/মূর্তিপূজক এবং তাদের ইচ্ছা ও মর্জির সম্পূর্ণ বিপরীতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) এই লোকদের সহিত কোনরূপ সন্ধি সমঝোতা করবার জন্য প্রেরিত হন নাই। তাঁকে পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, যে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন তিনি আল্লাহর নিকট হতে পেয়েছেন তাকেই সমগ্র দ্বীনের, জীবন ব্যবস্থার, প্রত্যকটি বিভাগের উপর বিজয়ী করে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ইহাই তাঁর কাজ এবং এ কাজ তাঁর অবশ্যই করতে হবে। কাফের ও মুশরিকরা যদি মেনে নেয় তবুও, যদি না মেনে নেয় তবুও এবং ইহার বিরুদ্ধতা ও প্রতিরোধের জন্য যদি সমর শক্তি নিয়োজিত

www.pathagar.com

করে তবুও। রাছুলের এই মিশন অবশ্যই পূর্ণ হবে, পূর্ণ হতেই থাকবে চিরকাল। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

২। **"এই লোকেরা চাহে যে, আল্লাহর আলোকে (নূরকে) তারা নিজেদের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হউক না কেন। তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাছুলকে হেদায়েতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন উহাকে দ্বীন জাতীয় সব কিছুর উপরই বিজয়ী করে দেন, মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হউক না কেন"**। (সূরা তওবা আয়াত -৩২-৩৩)। তফসীর ঃ

(ক) মূল কোরআনে 'আ-দ্বীন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'দ্বীন' শব্দটি পূর্বেও যেমন বলা হয়েছে, - বলতে বুঝায় এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, জীবন যাপনের পদ্ধতি, যার প্রতিষ্ঠানকে সনদ এবং আনুগত্য অনুসরণের যোগ্য মেনে নিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে এই আয়াতে রাছুল (ছাঃ) -এর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে-হেদায়েতের বিধান ও সত্যদ্বীনকে তিনি আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি দ্বীন এর মর্যাদা সম্পন্ন অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা ও পন্থার উপরে জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। অন্য কথায় রাছুল (ছাঃ) কখনো এই উদ্দেশ্যে আসেন নাই যে, তাঁর নিয়ে আসা দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা অন্যান্য দ্বীনের অধীন এবং উহার দ্বারা পরাজিত, বিজিত হয়ে থাকবে, আর তিনি এই বিজয়ী দ্বীনের দেয়া সুযোগ সুবিধাগুলি উহার অধীনে থেকে ভোগ করাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। না, ইহা সত্য নহে। বরং সত্য কথা এই যে, রাছুল আসমান জমীনের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়েই দুনিয়ায় আসেন এবং সেই বাদশাহের দেয়া সত্যভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকেই তিনি সর্বজয়ী দ্বীনরূপে দেখতে চাহেন। ইহার মুকাবিলায় অপর কোন জীবন ব্যবস্থা চালু থাকলেও তাকে খোদার দ্বীন কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। 'জিযিয়া' আদায় করে যিম্মীদের বসবাস করা এই ধরনেরই একটি জীবন ব্যবস্থা/ বিধান। (তফসীরে তাহীমুল কোরআন)।

(খ) অবিশ্বাসী কাফের, মূর্তিপূজক এবং ধর্মদ্রোহী ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা যেরূপ ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে, তা বর্ণনা করবার পর আল্লাহতায়ালা ইঙ্গিত করেছেন যে, মানব জাতিকে ঐ সকল অধর্মের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সত্যধর্ম ও সুপথ প্রদর্শন করবার জন্যই আমি স্বীয় অনুগ্রহে ধর্মজগতের জ্যোতিস্বরূপ আমার প্রিয়তম রাছুল (ছাঃ)-কে ধরাধামে প্রেরণ করেছি। কিন্তু বিধর্মীদের প্রকৃতি এতই হীন ও তাদের অন্তর এতই মোহাচ্ছন্ন যে, উহারা নিজেদের অবিশ্বাস, কলুসিত পাপমুখের তুচ্ছ বাক্য দ্বারা আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করে দিতে চায়। নানারূপ কাল্পনিক অবিশ্বাস্য বাক্য এবং অযথা নিন্দা ও দূর্নাম প্রচার পূর্বক আমার রাছুল (ছাঃ) এর প্রভাব বিনষ্ট এবং সত্যধর্মের বিস্তার প্রতিরোধ করতে ইচ্ছা করে। তাই আল্লাহতায়ালা বলে দিচ্ছেন যে, যদিও ইহা অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে অতীব অপ্রীতিকর, তথাপি আমি সত্যের শুভ্রজ্জল জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করব এবং আমার

www.pathagar.com

প্রেরিত প্রিয়জন রাছুল (ছাঃ) যে সুপথ ও সত্যধর্মসহ ধরা বক্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই সত্যধর্ম বা স্বর্গীয় ইসলামকে আমি সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দিব। অবিশ্বাসীদিগের বিরাগ ও প্রতিকূলতা আমার এই অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছা কখনই প্রতিরোধ করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, হজরত রাছুলুল্লাহ্‌র জীবনেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার শুভ উষা পরিদৃশ্যমান হয়েছিল এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই সমগ্র পরিচিতি পৃথিবী বিশ্ববিজয়ী মুসলমানগণের চরণতলে লুণ্ঠিত হয়ে পবিত্র কোরআন বাণীর সফলতা/সত্যতা স্বরূপ সর্বধর্মের উপর স্বর্গীয় ইসলামের জয় পতাকা প্রোথিত হয়েছিল। (তঃ হক্কানী)।

বর্তমান যুগে খ্রীষ্টান রাজশক্তির আধিক্য এবং জগদ্বাসীর উপর (পাশ্চাত্য) ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করে কোন কোন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বলে যে, ইসলাম কখনই খ্রীষ্টধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না, বরং খ্রীষ্টধর্মই সর্ব ধর্ম জয়ী হয়ে জগতে একাধিপত্য বিস্তার করবে। কিন্তু এদের মনে রাখা উচিত যে, রাজ্য বা রাজ্যধিপতির সংখ্যাধিক্য এবং রাজনীতিক জয়-পরাজয়ের সহিত ধর্ম জগতের জয় পরাজয়ের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। কোন ধর্মের মূলনীত জগতের অধিকাংশ অধিবাসী কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়াকেই সেই ধর্মের চরম বিজয় মনে করতে হবে। সে হিসাবে ইসলাম এখনও বিশ্ববিজয়ী। ইসলামের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ ও যুক্তিবাদ প্রভৃতি ভ্রমবিশ্বাস ও কুসংস্কার জগদ্বাসীর মন হতে চিরদিনের জন্য মুছে গিয়েছে ; পৌত্তলিকতার (মূর্তিপূজার) অসারতা এখন প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানবই নতশিরে স্বীকার করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের একত্ববাদ (এক আল্লাহর প্রতি) আত্মসর্পন এবং কোরআনের বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও কর্মফল প্রভৃতি মূলনীতি এবং সার্বজনীন শিক্ষা, সত্যতা, বিশ্বাস, আজ সভ্য-জগত কর্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে। ফলতঃ পবিত্র ইসলাম কর্তৃক সর্বধর্ম বিজিত হবার ইহা অপেক্ষা প্রকাশ্য ও স্পষ্টতর নিদর্শন আর কি হতে পারে ? তঃমঃআঃ। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

৩। **"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাছূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন উহাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।" (সূরা ফাত্‌হ্‌ আয়াত-২৮)** তফসীর ঃ-

অনন্তর আল্লাহতা'লা স্পষ্টতর ভাষায় বলে দিচ্ছেন যে, আমিই বিশ্ববাসীর জন্য সরল সুপথ ও অনাবিল সত্যধর্ম সহ আমার মনোনীত ঐ পবিত্র ইসলাম ধর্মকে সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য আমার প্রিয়তম রাছুলকে প্রেরণ করেছি এবং এ সমন্ধে আমার বাক্য এবং আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, ধর্ম হিসোবে পবিত্র ইসলাম জগতের সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে এবং ক্রমে ক্রমে পৃথিবী অধিকাংশ অধিবাসীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে অথবা উহার মুলনীতি, শিক্ষা আদর্শ মেনে নিবে। উপরোক্ত আয়াতের মর্ম ইহা নহে যে, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবে এবং অন্যান্য ধর্ম সমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে সকল সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশও ঐ আয়াতের উদ্দেশ্য নহে, ধর্মনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই উহার (প্রধান) ও প্রকৃত লক্ষ্য। সুতরাং ধর্ম জগতে ঐ স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তা বোধ হয় আর না বললেও চলে। আরব দেশে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনেই সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়েছিল। হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' এবং বিভিন্ন বংশীয় খলিফা ও সুলতানগণ সমগ্র সভ্য জগতে ইসলামের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করে বিশ্ববাসীকে চমকিত ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। অধুনা জগতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, পৃথিবীর অধিকাংশ অবিশ্বাসীই যে, প্রকান্তরে ইসলামের মূলমন্ত্র 'তওহিদ' বা 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নীতিগুলিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং ভবিষ্যতে জগতের অধিকাংশ অধিবাসী যে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করবে, তার শুভ লক্ষণ চারিদিকেই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা- ছফ, তওবা ও ফাতহ্ এর উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহতা'য়ালা একাধিকবার অত্যন্ত জোরালো এবং সুস্পষ্ট ভাষায় অগ্রিম ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনিই তাঁর রাছুল (ছঃ)-কে বিশ্বমাঝে 'হেদায়েত' তথা সুপথ (সৎপথ) ও সত্যধর্ম 'দ্বীন ইসলাম' সহকারে পাঠিয়েছেন এবং কাফের মুশরিকদের সর্বপ্রকার বিরোধীতা এবং প্রতিরোধের মুখেই তিনি ইহাকে (দ্বীন ইসলামকে) অন্যান্য সকল ধর্ম (বা ধর্মীয় মতাদর্শের) উপর বিজয়ী ও আধিপত্য দান করবেন।

উল্লেখ্য যে, যখন দ্বীন ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের বা ধর্মীয় মতাদর্শের উপর বিজয়ী করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তখন উহা বাস্তবায়নের পরিস্থিতি মোটেই অনুকুল ছিল না। তখনকার মুসলমানদের অবস্থা বিরোধী কাফের/মুশরিকদের তুলনায় ছিল খুবই করুন ও শোচনীয়। তাদের না ছিল পর্যাপ্ত ধনবল, জনবল বা শক্তি সামর্থ। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য চতুর্দিকে প্রবল প্রতাপশালী কাফের/মুশরিকরা ছিল ভয়ংকরভাবে তৎপর। ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের মুশরিকদের এ হেন ধ্বংসাত্বক তৎপরতার মুখেই আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করে দিলেন যে, তারা ইসলামের আলোকে বা জ্যোতিকে ফুঁৎকারে নির্বাপিত করে দেয়ার যতই প্রচেষ্টা চালাক না কেন তাদের সকল ধ্বংসাত্বক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েই তিনি ইসলামের জ্যোতিকে বিশ্বময় সমুজ্জ্বল, সমুন্নত ও পূর্ণ বিকশিত করে দেবেন। ইসলামের বিরুদ্ধাবাদীরা ইসলামের এ বিজয়কে কিছুতেই রোধ করতে পারবে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা যখন এ ঘোষণাটি দেন তখন সর্বদিক দিয়েই মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই করুন। বরং তারা বিরুদ্ধবাদীদের মারাত্মক অপতৎপরতার বিরুদ্ধে নিতান্ত বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। অথচ আল্লাহতায়ালা ইসলামের জ্যোতিকে সমুজ্জ্বল করার ঘোষণাটি দিয়েছিলেন উক্তরূপ পরিস্থিতিতেই এবং বিরুদ্ধবাদী কাফের/মুসরিকদের নাকের ডগার উপরেই।

www.pathagar.com

উহার বাস্তবায়ন তখনকার বিরাজমান অবস্থাতে অতি হাস্যকর বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ'র ঘোষণা অকাট্য অপরিবর্তনীয় ও অনিবার্যভাবে বাস্তাবায়িতব্য। দেখার ব্যাপার ছিল শুধু উহা কিভাবে কার্যকর হয়।

পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিল যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ'র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যেসব বাধা বিপত্তি, অসহনীয় অত্যাচার, নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ছিল নিতান্তই সাময়িক।

বেশী বিলম্বে নয়, বরং মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই কাফের/মুশরিকদের সমস্ত অপতৎপরতা ব্যর্থ করে দিয়েই আল্লাহ'র রাছুল (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যে কাফের/মুশরিকরা আল্লাহ'র দ্বীনকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়ার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শক্তি প্রয়োগ এবং সমরক্ষেত্রে মোকাবেলাসহ কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয় নাই, সেই কাফের/মুশরিকদেরকেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখা গেল। এভাবে আল্লাহ'র উপরোক্ত ঘোষণার অনেকটা বাস্তবায়ন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই হয়েছিল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাহাবাগন তো বটেই, এমনি কি যারা আল্লাহ'র উপরোক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন সম্পর্কে সন্দিহান ছিল বা মোটেই বিশ্বাসী ছিল না তারাও নিজ জীবনে নিজ চোখেই উহার প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে গেছে। ইহা ছাড়া, পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তৎপরবর্তীকালে মুসলিম সুলতান ও রাজা বাদশাহদের আমলে বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল বিরোধীতার মুখেই স্বল্পতম সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাধান্য বিশ্ব জুড়ে অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের (তরজমা) ও তফসীর থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ'র মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম এর আলো/জ্যোতিকে অন্যান্য সকল ধর্ম বা ধর্মীয় মতাদর্শ/মতবাদের উপর বিজয়ী বা সমুজ্জল করার অর্থ ইহা নহে যে, বিশ্বজুড়ে বিরাজমান ও প্রচালিত সমস্ত ধর্মই বিলীন হয়ে গিয়ে সকল ধর্মের লোকেরাই একযোগে ইসলামে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে বা ইসলামের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। আসলে ইহার অথ এই যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ সরাসরি ইসলামে প্রবেশ না করেও এবং তারা নিজ নিজ ধর্মে বাহ্যিকভাবে বহাল থেকেও ইসলামের মহান আদর্শ ও নীতিগুলি যেমন একেশ্বরবাদ, বিশ্বসাম্য, বিশ্ব-মানবতা, বিশ্বমৈত্রী, ইসলামের সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়নতা, সত্যবাদিতা, সার্বজনীন শিক্ষা, সদ্ব্যবহার, সদুপদেশ, সুবিচার, পরোপকার, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ ইত্যাদি সকল মহান আদর্শ সমূহই গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং হয়েছেও তাই। তারা ইসলামের চিরন্তন, চিরসুন্দর, স্বাশ্বত, বিজ্ঞানসম্মত, শ্রষ্টা প্রদর্শিত উত্তম আদর্শ ও নীতিসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে নাই। বরং বিরুদ্ধবাদীদের তৃত্ত্ববাদ 'প্যাগানিজম' বা পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা, চন্দ্র/সূর্য্য পূজা, বৃক্ষলতা পূজা, গাভী পূজা ইত্যাদি সর্ব প্রকার অংশীবাধিত্ব যে অসার তা তারাই দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তুলছে।

www.pathagar.com

ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্বব্যাপী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে যারা চিন্তাশীল, নিরপেক্ষ, উদারমনোভাবাপন্ন এবং সত্যকে সত্য বলে উপলব্ধি ও স্বীকার করতে সক্ষম তারা, নিজেদের সমগোত্রের আলোচনা/সমালোচনা উপেক্ষা করেই সত্য ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ করছে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল যুগ যুগ ধরেই নহে বরং বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে, জ্ঞান বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতির দিনেও প্রাচ্য প্রতিচ্যের অন্যান্য ধর্মের অনুসারী জ্ঞানী গুণীজন শত বিরোধীতা ও প্রতিরোধের মুখে ভালভাবে বুঝে শুনেই ব্যাপকভাবে শ্বাস্বত শান্তির ধর্ম ইসলামকে আলিংগন করছে। উল্লেখ্য যে, ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমানে মানুষ ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর অন্যান্য ধর্মের অসারনতা উপলব্ধি করেই উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী গুণি লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা যায় একমাত্র আমেরিকায় প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। (সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের একটি রিপোর্ট প্রনিধানযোগ্য। বিল ক্লিনটন বিগত ৯/১/২০০০ ইং সনে মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত এক রিপোর্টে বলেন, "আমাদের নীতি ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা পরিচালিত। যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সবচেয়ে বেশী প্রসার লাভ করছে। ইসলাম ধর্ম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান একটি ধর্ম বিশ্বাস"। ভাষ্যকাররা ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রতি প্রশাসনের গুরুত্ব প্রদানের আভাস বলেই বিবেচনা করছেন।" (দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ ১২/১/২০০০ ইং)। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী গুণি অমুসলিমগণ কিভাবে ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের নামসহ বিস্তারিত বিবরণ "কেন মুসলমান হলাম - বিশ্ব সেরা ২০০ মনিষীর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর কাহিনী" (১ম ও ২য় খন্ড) মাওঃ আবুল বাশার জিহাদী কর্তৃক প্রণীত ও ইশায়াত ইসলাম কুতুবখানা কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থে রয়েছে। আগ্রহী পাঠক বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন।

ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে কতিপয় খ্যাতনামা অমুসলিম মনিষীগণের কতিপয় উক্তি ঃ

১। "এটাই যদি ইসলাম হয়, তা'হলে আমরা সবাই কি ইসলামী জীবন যাপন করছি না"? -দার্শনিক গ্যেটে।

২। উক্ত প্রশ্নের জবাবে টমাস কার্লাইল বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে যারা নৈতিক জীবনের অনুসারী ও অধিকারী তারা সবাই ইসলামের অনুরূপ জীবন যাপনই করছি"।

৩। "ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সকল যুগে সকল মানুষের ধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে"। - জর্জ বার্ণাড শ

এভাবেই আল্লাহ'র উপরোক্ত আগাম ঘোষণাটি অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হতেই থাকবে চিরকাল এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

ইসলাম ও রাছুলুল্লাহ (ছঃ)-এর ঘোর বিরোধী মদিনার ঈহুদীরা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে বলে আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছঃ) কর্তৃক মদীনায় হিজরত করার পরপরই মদীনাবাসীগণ ইসলামের দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হতে থাকে এবং মদীনায় ইসলাম সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু মদীনায় বসবাসকারী মক্কার কাফের, মুশরিক ও কোরেশদের দোসর ঈহুদীরা ইসলামের অগ্রগতি মোটেই সহ্য করতে পারতেছিল না। ফলে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কাফের/মুশরিকদের সহায়তায় নানাবিধ ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহতা'য়ালা ঘোষণা করে দেন যে, সাময়িকভাবে ঈহুদীরা মুসলমানদেরকে কিছু যন্ত্রনা প্রদান ছাড়া ব্যাপক কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না এবং অচিরেই তারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"(সাময়িকভাবে) দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা (ঈহুদীরা) তোমদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা এবং যদি তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে তবে তারা তোমাদের সম্মুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তাদেরকে কোন কোন পক্ষ থেকেই সাহায্য করা হবেনা" (সূরা ইমরান আয়াত-১১১)।

(ক) মদীনার ঈহুদীগণ যখন ইসলামের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু-অবিশ্বাসী (কাফের/মুশরিক) কোরেশদের সহিত সম্মিলিত হয়ে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহতায়ালা হযরত রাছুলুল্লাহ (ছঃ)-কে বলে দিলেন যে, তারা এরূপ ঘৃণ্য ও হীন ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে তদ্বারা তোমাদেরকে সামান্য কষ্ট দেয়া ব্যতীত আর কোনই অনিষ্ট করতে পারবেনা। আর ঈহুদীরা যদি তোমাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়,তবে নিশ্চয়ই তারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে এবং যাদের প্ররোচনায় তারা এরূপ অসম সাহসিকতা কার্যে লিপ্ত হবে তারা কেহই তাদেরকে প্রয়োজনের সময় সাহার্য করবে না।

এ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা স্বরূপ ঈহুদীদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে মদীনা থেকে বিতাড়িত ও বহিস্কৃত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, কোরেশ বা অন্য কোন জাতিই তাদেরকে (প্রতিশ্রুতি মোতাবেক) সাহায্য করতে অগ্রসর হয়নি। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) তারা অর্থাৎ (আহলে কিতাব তথা ঈহুদী-নাসারাগণ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌখিক ভালমন্দ বলে (গালিগালাজ করে তোমাদের) অন্তরে সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত কখনও (বড় ধরনের) কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। যদি তারা (এর বেশী ক্ষতি করার দুঃসাহস দেখায় এবং) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে বা সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তবে পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যাবে। অতঃপর (আরও বিপদ এই যে) কোন দিক থেকেই তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। কোরআনে ঘোষিত এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আয়াতের লক্ষ্য (মোতাবেক) ছাহাবায়ে কেরামের সাথে কোন ক্ষেত্রেই মোকাবেলায় বিরুদ্ধবাদী ঈহুদীরা জয়লাভ করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, ঈহুদী গোত্রগুলি ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। পরিণামে তারা মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। (সম্মুখ সংগ্রামে) কতক নিহত হয়েছিল, কতক নির্বাসিত হয়েছিল এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য্য করা হয়েছিল (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতের তরজমা ও তফসির সমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, মক্কার কাফের, মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করতে যখন বাধ্য হন তখন মদীনায় মক্কার কাফের/মুশরকেদের মতই মুসলমানদের আর এক শত্রু ঈহুদীরা বসবাস করত। মদীনায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের উপস্থিতি তাদের জন্য ছিল অত্যন্ত অসহনীয়। ফলে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তারা নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিসহ তাঁদের সর্ব প্রকার অনিষ্ট সাধনে তারা মুসলমানদের শত্রু মক্কার কাফের/মুশরেকদের সাথে একাত্ব হয়ে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও নব দীক্ষিত মুসলমানগণ কিছুটা বিব্রত বোধ করতে থাকলে, আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদেরকে সুস্পষ্টভাবে অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, মদীনার আহলে কিতাব, বিশেষ করে ঈহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকুক না কেন, সাময়িক ভাবে সামান্য দুঃখ কষ্ট প্রদান ব্যতীত তারা আর কোন ঘোরতর ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা যদি মদীনার মুনাফেক ও মক্কার কাফের মুশরেকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়, তবে তারা তিষ্টিতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বরং তারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে চরম লাঞ্চনা ভোগ করবে। উপরোক্ত ঘোষণায় আল্লাহতা'য়ালা আরও জানিয়ে দিলেন যে, যাদের প্ররোচনায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে আসবে, তারা (অর্থাৎ মক্কার কাফের/মুশরেকরা) ও মুনাফেকরা কখনই তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেনা। অর্থাৎ তাদেরকে যথাসময়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করবে না।

উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে আল্লাহতা'য়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার ঈহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ/ফাঁস করে দেন এবং সে সাথে মুসলমানদের হাতে তারা যে, বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়ে লাঞ্চিত হবে এ মর্মান্তিক পরিণতির কথাও পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন।

উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহতা'য়ালা উপরোক্ত ঘোষণাটি দিয়েছিলেন তখন মুসলমানদের প্রবল শত্রু মক্কার কাফের/মুশরিক ও মদীনার ঈহুদীদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে, ধনবল ও জনবলে দুর্বল মুসলমানেরা কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং কিভাবেই বা তাদেরকে পরাজিত, বিদ্ধস্ত ও লাঞ্চিত করবে তা কারো বোধগম্য হাচ্ছিল না, বিশেষ করে যখন প্রচন্ড বিরোধীতা ও প্রতিরোধের মুখে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বেশী দিন নয়, বরং মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঈহুদীরা চরমভাবে বিদ্ধস্ত ও লাঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আর ইহাও দেখা গেল যে, ঈহুদীদের চরম বিপর্যয়ের সময় মক্কার কাফের মুশরিকরা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (ঈহুদীদেরকে) সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এভাবে সর্ব প্রকার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত থেকেও কোরআনের উপরোক্ত ঘোষণা মোতাবেক ঈহুদীরা মুসলমানদের সাময়িক উৎপীড়ন ছাড়া তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, তারা বিদ্ধস্ত ও লাঞ্চিত হয়ে অবশেষে বিতাড়িত হয়ে মদীনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল- যা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এভাবেই ধূর্ত ও কপট ঈহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালার উপরোক্ত আগাম ঘোষণা অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

www.pathagar.com

খল/কপট বিশ্বাসী অর্থাৎ মুনাফিকদের মর্মন্তুদ পরিণতি সম্পর্কে আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার কাফের/মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধীতা, প্রতিরোধ, নির্যাতন ও উৎপীড়নের মুখে বাধ্য হযে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের পর মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু মদীনায় এবং মদীনার পাশ্ববর্তী এলাকায় কাপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পারদর্শী মুনাফিকরা বাস করত। তারা খল, কপটতা/মুনাফিকিতে এত নিপুন ছিল যে তাদের মুনাফেকি সহজে ধরা পড়ত না। তারা ইসলাম ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষতি সাধনে সদা তৎপর ছিল। আল্লাহ তাদের এই মুনাফেকি, কপটতা রাছুল (ছাঃ)-কে আগাম অবহিত করে দিলেন যে, তাদের এ মুনাফেকির দরুন তারা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"এবং তোমাদের পাশ্ববর্তী মরু প্রান্তরবাসীদের মধ্যে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কপট/খল বিশ্বাসীরা তথা মুনাফিকরা রয়েছে, তারা কপটতায়/মুনাফিকিতে অটল। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে পরিজ্ঞাত আছি। অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি প্রদান করব, তৎপর তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে"। (সূরা তওবা আয়াত-১০১)।

(ক) এই আয়াতে মদীনার বহির্ভূত পল্লী-প্রান্তরবাসী কপটদিগের (মুনাফিকদের) প্রসংগ বর্ণিত হয়েছে। জুহায়না, আসলাম, আশজা এবং গফর প্রভৃতি সম্প্রদায়ই এ আয়াতের লক্ষ্য। ইহারা এ সময় ইসলামের ক্ষতিসাধনে একযোগে মদীনার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হয়েছিল (কাশ্‌শাফ)। আল্লাহতা'য়ালা আগাম বলে দিয়েছেন যে, ঐ সম্প্রদায় ঘোর কপটচারী, তুমি তাদেরকে জাননা, কারণ কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষ কারও অন্তরের কথা জানা সম্ভব নহে। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহতা'য়ালা প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন। ফলে, তাদের এ কপটতা ও মুনাফেকির জন্য শাস্তি অপরিহার্য।

দু'বার শাস্তি অর্থে কেহ বলেন, ইহকাল ও পরকালের শাস্তি এবং কেহ কেহ বলেন যে, কপটকূল কর্তক ইসলামের হিতকল্পে অনিচ্ছার সহিত সাহায্য ও যাকাত প্রদান এবং কবরের শাস্তিই উক্ত বাক্যে পরিব্যক্ত হয়েছে। এই কপট সম্প্রদায় সমূহের কপটতা অবশেষে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত বা ফাঁস হয়ে পড়লে তারা মসুলমানগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। (তাফসীরে ইবনে জরীর) (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) উপরাক্ত আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার বলে দিচ্ছেন যে, মদীনা ও মদীনার পাশ্ববর্তী এলাকায় যে সকল মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসী রয়েছে তারা নিজেদের

www.pathagar.com

মুনাফিকিতে এতদূর ওস্তাদ ও পাকাপোক্ত যে, নবী করীম (ছাঃ) নিজেই পূর্ণমাত্রা ও মানের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (অনেক সময়) তাদের মুনাফেকী ধরতে সক্ষম হতেন না। তবে আল্লাহ মহাজ্ঞানী অন্তর্যামী ভাল করেই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব চিনেন এবং তাদেরকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ), ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে এ মুনাফেকী ও বে-ঈমানীর কারণে কঠোর শাস্তি দিবেন।

দ্বিগুন শাস্তির অর্থ এই যে, তারা একদিকে যে দুনিয়ার প্রেম মায়ায় পড়ে ঈমান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার নীতি গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফেকী ও বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করছে, সেই দুনিয়া তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আর উহার মাল, সম্পদ ও সম্পত্তি এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভের পরিবর্তে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অপমান, লাঞ্ছনা, ও ব্যর্থতাই লাভ করবে। অপরদিকে তারা যে জেহাদী আন্দোলনকে ব্যর্থকাম দেখতে চায় এবং তাদের নিজেদের হীন ষড়যন্ত্রের দ্বারা ব্যর্থ করে দিতে সচেষ্ট, তা তাদের মনের তীব্র কামনা, বাসনা ও শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনেই সাফল্য লাভ করবে ও ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

উল্লেখ্য যে, মদীনা ও পাশ্ববর্তী এলাকার কপট বিশ্বাসী/মুনাফিকরা মুনাফিকিতে ছিল খুবই পটু। অনেক সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদের মুনাফেকী/কপটতা ঠিকভাবে ধরে উঠতে পারতেন না। ফলে অন্তর্যামী আল্লাহতায়ালা তাদের মুনাফেকীর কথা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগাম জানিয়ে দিলেন এবং সে সাথে এ-ও বলে দিলেন যে, তারা তাদের মুনাফেকির দরুন একাধিকবার বা দ্বিগুন শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাদের এ কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়লে, তারা লাঞ্ছিত ও বিদ্ধস্ত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিল। আর পরবর্তী জীবনেও অর্থাৎ আখেরাতেও তারা কঠোর শাস্তিভোগ করতে বাধ্য হবে।

এভাবেই কপট মুনাফিকদেরকে শাস্তি দানের আগাম ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছিল যা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।

www.pathagar.com

ঈহুদীদের প্রতি মুনাফিকদের আনুগত্য থাকা ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি/আশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে বলে আগাম ঘোষণা

মদীনার মুনাফিক তথা ভন্ড মুসলমানেরা প্রতারক ঈহুদীদের সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর রাছুল (ছাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। মুনাফেকরা ভন্ড ও প্রতারক ঈহুদীদের গোপনে এরূপ আশ্বাস দিয়েছিল যে, মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষ/যুদ্ধ বাধলে তারা ঈহুদীদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। এমনকি যদি তাদেরকে বাহিস্কার করেও দেয়া হয়, তবে তারাও ঈহুদীদের সাথে বহিস্কৃত হয়ে তাদের অনুসরণ করবে। আল্লাহ তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্রের কথা অহির মাধ্যমে রাছুল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিয়ে বলে দিলেন যে, ভন্ড মুনাফেকরা ঈহুদীদের প্রতি দেয়া এ প্রতিশ্রুতি/আশ্বাস কোন কালেই পালন করবে না। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

"তুমি কি সেই মুনাফিকরদের দেখ নাই যারা তাদের আহলি কিতাব (গ্রন্থানুগামী) অবিশ্বাসী ভাইদেরকে বলে 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বহিস্কৃত হব। উপরন্ত আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনই কারো কথা শুনব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব'। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এই লোকেরা মিথ্যাবাদী। উহারা বহিস্কৃত হলে, ইহারা তাদের সংগে কখনই বের হবে না, আর তাদের উপরে আক্রমণ করা হলে ইহারা কখনই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর ইহারা যদি তাদেরকে সাহায্য করেও তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর কোথাও থেকে তারা কোন সাহায্য পাবে না" (সূরা হাশর, আয়াত-১১-১২)।

(ক) আপনি কি (আবদুল্লাহ বিন-উবাই ও অন্যান্য মুনাফিকরদের অবস্থা দেখেন নাই যে, তারা নিজেদের (স্বধর্মী) কিতাব প্রাপ্ত (অর্থাৎ ঈহুদী বনু নাযীর গোত্রের কাফের ভাইদেরকে বলছে যে, 'আল্লাহর শপথ (আমরা সকল অবস্থাতেই তোমাদের সংগে রয়েছি) অতএব যদি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃভূমি থেকে বলপূর্বক বের করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে স্বীয় জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যাব। আর যদি তোমাদের সাথে কাহারো যুদ্ধ বাধে, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব'। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, যদি কিতাব প্রাপ্ত লোকেরা নির্বাসিত হয় তবে ইহারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তাদের সাথে বের হয়ে যাবে না। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধে তবে ইহারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি (অসম্ভব কিছু ধরে নেয়া হয় যে,) ইহারা তাদেরকে সাহায্যও করল এবং যুদ্ধে

www.pathagar.com

অংশগ্রহনও করল তথাপি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করবে। অনন্তর ইহাদের পলায়নের পর তাদেরকে কোনই সাহায্য করা হবে না।

বস্তুতঃ তাই হয়েছিল। অর্থাৎ যখন (ঈহুদী) বনু নযীর গোত্রকে দেশান্তর/বহিষ্কৃত করে দেয়া হল তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করে নাই। আর প্রথম দফায় যখন তাদেরকে ঘেরাও করা হল যাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল, তখন এতেও তারা বনু নযীরকে সাহায্য করে নাই (তফসীরে আশরাফী)।

(খ) মদীনার মোনাফিক বা কপটবিশ্বাসীদিগের দলপতি আবদুল্লা-বিন-ওবাই অবিশ্বাসী ঈহুদীদেরকে আশ্বাস প্রদান করেছিল যে, তোমরা মদীনা পরিত্যাগ না করে মুসলমানদেরকে সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমরাও তোমাদের সহিত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং যদি একান্তই তোমাদিগকে মদীনা পরিত্যাগ করতে হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে মদীনা পরিত্যাগ করব। কিন্তু আল্লাহতা'লা মুসলমানদেরকে অগ্রিম জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় উহারা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। উহারা কখনই ঈহুদীদিগকে সাহায্য করবে না এবং তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধও করবে না এবং যুদ্ধ করলেও পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। তারপর ঈহুদীরা দেশত্যাগী হলেও তারা দেশত্যাগী হবেনা। তোমাদের ভয়ে উহারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকবে। কিন্তু ঈহুদীরা এরূপ নির্বোধ যে, ঐ মিথ্যা আশ্বাসে ভুলে গিয়ে নিজেদের অমঙ্গল ডেকে আনছে।

আল্লাহতা'লা আরও বলেছেন- অবিশ্বাসী ও কপটবিশ্বাসীরা (মুনাফিকরা) নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ করতে খুবই মজবুত এবং তারা আল্লাহকেও ভয় করে না। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ভীত- নির্ভীক মুসলমানদিগের নাম শুনলেই তাদের প্রাণে আতংক উপস্থিত হয়। মুসলমানদের শত্রুতা সাধনে তাদেরকে একতাবদ্ধ দেখা গেলেও তাদের এমন সাহস ও শক্তি নাই যে, তারা একতাবদ্ধ ও সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ অবতীর্ণ হবে। অবশ্য তারা বিক্ষিপ্ত ভাবে সুরক্ষিত গৃহ-প্রাচীর অথবা নিরাপদ দূর্গের মধ্যে আত্মগোপন করে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করলেও করতে পারে; কিন্তু তার পরিণামে ঐ নির্বোধদেরকে অবশ্যই পরাজিত ও বিতাড়িত হতে হবে। বলা বাহুল্য, এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণ সফলতা স্বরূপ অবিশ্বাসী ঈহুদী ও কপটবিশ্বাসী মোনাফেক দল মদীনা হতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়েছিল (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা হাশরের উল্লেখিত আয়াত সমূহে এরূপ অগ্রিম সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, মদীনায় অবস্থানকারী ভন্ড মুসলমান তথা মুনাফিকরা আহ্‌লে কিতাব অর্থাৎ ঐশী কিতাব প্রাপ্ত অবিশ্বাসী ভন্ড প্রতারক ঈহুদীদেরকে গোপনে এরূপ আশ্বাস দিয়েছিল যে, যদি মুসলমানেরা তাদেরকে (ঈহুদীদেরকে) মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয় তবে তারাও তাদের সাথে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। আর যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ বাঁধে তা হলে তারা সর্বোতভাবে তাদেরকে (ঈহুদীদেরকে) সাহায্য/সহযোগীতা করবে। মুনাফিকরা ধারনা করতে পারে নাই তাদের এই গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির কথা

www.pathagar.com

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-জেনে যেতে পারেন। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অহির মাধ্যমে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তারা মিথাবাদী, ভন্ড ও প্রতারক। মুসলমানেরা যদি তাদেরকে দেশান্তর বা বহিস্কার করে দেয় তথাপি মোনাফিকরা কখনই স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঈহুদীদের সাথে দেশান্তরিত হবে না অথবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বাধলেও তারা তাদেরকে কোন সাহায্য/সহযোগিতা করবে না, এমন কি করলেও তারা পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের গোপন আশ্বাস স্রেফ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা কোন সময়ই কার্যকর হবে না।

বাস্তবে তাই হয়েছিল। মুসলমানেরা ঈহুদীদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিলে মুনাফেকরা তাদের সহগামী হয় নাই এবং যুদ্ধাবস্থায়ও তারা ঈহুদীদেরকে কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা করতে এগিয়ে আসে নাই।

এভাবে কোরআনে উল্লেখিত উপরোক্ত আগাম ঘোষণাটি অতি বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

"তবুক" অভিযানের পর মুনাফেকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমীপে এসে মিথ্যা অজুহাত/বাহানা পেশ করবে বলে আগাম অবহিতকরন

নব-উত্থিত ইসলামী শক্তিকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবার জন্য মক্কার কাফের/মুশরিকদের অবিরাম চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তথা-ইসলামী শক্তি আর একটি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হল। উত্তরের (সিরিয়ায়) বিরাট রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় মদীনার ইসলামী শক্তি তখনও একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। মদীনার ক্ষুদ্র এই ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার মানষে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস/হেরাকল এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সংবাদ পেয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদেরকে মুকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার মুজাহিদ সম্বলিত একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু রোমানগণ স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে এবং তাঁর নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার কুদ্দুসী মুজাহিদ সেনার মোকাবেলার পরিণতি কি হতে পারে তা আঁচ করতে পেরে, ইসলামী শক্তির মুকাবেলা করার বাসনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। 'তবুক' নামক স্থানে যেখানে যুদ্ধ হবার কথা ছিল সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফিরে এলেন। 'তবুকে' সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও রোমানদের মুসলমানদেরকে মোকাবেলা করার ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে এলেন।

এদিকে মুনাফিক তথা-কপট/ভন্ড বিশ্বাসীরা (নামধারী ভন্ড মুসলমানেরা) যারা নানা ছল ছুতায় 'তবুক' অভিযানে রাছুল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অহীযোগে আগাম জানিয়ে দিলেন

www.pathagar.com

যে, তবুক অভিযান থেকে রাছুল (ছাঃ) -এর ফিরে আসার পর পরই দেখা যাবে যে, মুনাফিকরা যারা উক্ত অভিযানে অংশগ্রহনে ব্যর্থ হয়েছিল তারা তাদের ঐ ব্যর্থতার কারণ হিসাবে নানা খোঁড়া অজুহাত, মিথ্যা ওজর, আপত্তি বা বাহানা পেশ করতে থাকবে। তাদের ঐসব মিথ্যা অজুহাত/বাহানায় বিশ্বাস না করার জন্যও আল্লাহপাক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

১। **"তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের নিকট পৌছবে তখন তারা বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করবে। কিন্তু তোমরা যেন তাদেরকে স্পষ্ট বলে দাও যে, তোমরা কোন ওজর আপত্তি, বাহান পেশ করোনা, কারণ আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (প্রকৃত) অবস্থা জনিয়ে দিয়েছেন। এখন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ)-ই তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করবেন। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তোমরা যা করতেছিলে তা জানিয়ে দিবেন"** (সূরা তওবা, আয়াত নং-৯৪)।

হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তবুক অভিযান উপলক্ষ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করবার পর মদীনায় (নিরাপদে) পুনঃ প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, এই ভবিষ্যদ্বানী অচিরেই পূর্ণ হয়েছিল (তফসীরে মুহাম্মদ আলী)।

তবুক থেকে প্রত্যাবর্তন ঃ হযরত রাছুলে পাক (ছাঃ) মদীনা থেকে যাত্রা করবার সময়ে হযরত আলীকে মদীনার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পন করেছিলেন। অনন্তর সৈন্য দলের শৃংখলা সম্পাদনের জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে প্রধান পরিচালক পদে নিযুক্ত করে সর্ববৃহৎ পতাকা তাঁর হস্তে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র পতাকা প্রদত্ত হয়েছিল। এরূপে সুবৃহৎ সৈন্যদলের শৃংখলা সম্পাদন করে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সদলবলে রোমক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং চতুর্দ্দশ মঞ্জিল অতিক্রম করে মদিনা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী 'তবুক' নামক দুর্গ অথবা নির্ঝর প্রান্তরে উপনীত হন। এ স্থানেই রোমক সৈন্য দলের সহিত সাক্ষাত ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোম-সম্রাট 'হেরাকল' ইহার পূর্বেই হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিদ্যমানতা ও নবুয়ত সম্বন্ধে সত্য সংবাদ অবগত হয়ে এবং আল্লাহর প্রেরিত রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ অথবা তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষের পরিনাম ধ্বংসপ্রাপ্তি ও পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করে অবিলম্বে সিরিয়া থেকে স্বীয় সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সৈন্যসহ দুই মাস (মতান্তরে বিংশতি অথবা দ্বাদশ দিবস) তবুকে অবস্থান করে যখন রোমক সৈন্যের চিহ্ন অথবা তাদের গতিবিধি ও অস্তিত্বের কোনই সংবাদ পেলেন না, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদে সসৈন্যে মদীনায় ফিলে আসলেন।

www.pathagar.com

এ অভিযানে হযরত রাছুলুল্লাহর বহু বিস্ময়কর অলৌকিকতা প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষতঃ এ অভিযানের ফলে আরবের বর্হিভূত প্রদেশ-সমূহেও হযরত রাছুলুল্লাহ'র প্রভাব অতি দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল (তফসীরে হাক্কানী)।

আল্লাহতায়ালা বলে দিলেনঃ 'হে রাছুল, যখন তুমি মদীনায় ফিরে আসবে, তখন যে সকল কপট মুনাফিক তবুক অভিযানে তোমার সহযাত্রী হয় নাই, তারা তোমার সমক্ষে উপস্থিত হয়ে নানা ওজর আপত্তি উত্থাপনপূর্বক নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি তখন তাদেরকে বলে দিও, তোমাদের অযথা আপত্তি আমি কখনই বিশ্বাস করব না। কারণ সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালা পূর্বেই আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে দিয়েছেন এবং আমরা তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব তোমরা যা করেছ তার জন্য অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রভু সর্বজ্ঞ আল্লাহর সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তোমাদেরকে অচিরেই তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। তোমরা স্ব-স্ব গুপ্ত অথবা ব্যক্ত কৃতকার্য্যের প্রতিফল থেকে কখনই পরিত্রান পাবে না। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

২। **"যখন তোমরা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তারা তখনই তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করবে যেন তোমরা তাহাদিগ থেকে বিমুখ হও, অতএব তোমরা তাহাদের থেকে বিমুখ হয়ে যাও, নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের বাসস্থান নরক, ইহা তদ্বিনিময় - যা তারা উপার্জন করেছে। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি পরিতুষ্ট হও, কিন্তু যদিও তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কার্যকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না" (সূরা তওবা, আয়াত- ৯৫-৯৬)।** তাফসীর ঃ-

এ দুইটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা কপট-বিশ্বাসীদের সহিত সম্পর্ক ছেদনের আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা মিথ্যা শপথ করতে খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং তাদের একদল আল্লাহর শপথ করে বলবে, "যেন তোমরা তাহাদিগ থেকে বিমুখ হও" অর্থাৎ তোমরা যেন তাদের দুষ্কার্য সম্বন্ধে ভৎর্সনা বা তিরস্কার না কর। (তঃ কবির ও বহরুল মহিত)। অতএব তোমরা তাহাদিগ থেকে বিমুখ হয়ে যাও - ইহার অর্থ এই যে, তোমরা তাদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ-ছেদন কর (তঃ এবনে-আব্বাস ও কবির)। কিন্তু মোকাতেল বলেন, "আবদুল্লা-বিন-ওবাই এবং ইবনে আবি-দার হযরতের নিকট শপথ করে বলেছিল যে, আমরা ভবিষ্যতে কোন অভিযানে যোগ করতে কখনই পশ্চাৎপদ হবনা। তাদের ঐ শপথ সম্বন্ধেই প্রথমোক্ত আয়াত অবতীর্ন হয়েছে"। (তঃ বহরুল মহিত)

অনন্তর আল্লাহতা'য়ালা আর এক শ্রেণীর কপটের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন। ইহারা আল্লাহর শপথ করে হযরতের নিকট নিজদের নির্দোষিতা জ্ঞাপন পূর্বক মুসলমানদের

www.pathagar.com

সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু আল্লাহতা'য়ালা বলে দিলেন যে, যদি তোমরা ঐ কপটদিগের কথা বিশ্বাস অথবা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি আল্লাহাতায়ালা কখনই ঐ দুষ্কার্যকারী কপটকূলের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ইহার কারণ প্রথমোক্ত আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহতা'য়ালা বলে দিয়েছেন যে, কপট-বিশ্বাসীরা প্রকৃতিগত ভাবে অপবিত্র। সুতরাং উহাদের অন্তর কখনই সরল অথবা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। স্ব-স্ব দুষ্কার্যের বিনিময়ে নরকে গমনই উহাদের ভাগ্যে লিখিত হয়েছে। 'তবুক' থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য-বিশ্বাসী মুসলমানিদগকে কপট বিশ্বাসী মোনাফিকদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদনের আদেশ প্রদান করেছিলেনন (তফসীরে মুহাম্মদ আলী, তফসীরে কোরান শরিফ)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, যারা (মুনাফিকরা) তবুক অভিযানে অংশগ্রহনে ব্যর্থ হয়েছিল তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর তাদের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে মিথ্যা শপথ করে খোঁড়া অজুহাত ও বাহানা পেশ করবে। অতঃপর দেখা দেল যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তবুক অভিযান থেকে ফিরে আসলে পর আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষনা মোতাবেক সত্যি সত্যি তারা মিথ্যা শপথ করে মিথ্যা ওজর আপত্তি/বাহানা পেশ করেছিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছেদন করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

সূরা- তওবার উপরোক্ত আয়াত সমূহে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'তবুক' অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন এবং প্রর্তাবর্তনের পর মদীনার কপট/ভন্ড নামধারী মুসলমান তথা মুনাফেকরা যারা তবুক অভিযানে র ছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহনে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা ঐ অভিযানে শরিক না হওয়ার কৈফিয়ত স্বরূপ নানা ছল চাতুরীপূর্ন মিথ্যা অজুহাত, মিথ্যা শপথসহ বিভিন্ন খোঁড়া ওজর আপত্তি পেশ করে তাদের নির্দোষিতা প্রমান করার চেষ্টা করবে এবং তা দ্বারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পরিতুষ্ট করার চেস্টা করবে বলে অগ্রিম জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাদের মুখরোচক মিথ্যা শপথ বাক্য এবং ছলনাময় কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাদের থেকে বিমুখ হওয়ার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

উল্লেখিত ঘোষণা মোতাবেক বাস্তবেও তাই হয়েছিল। তবুক অভিযান থেকে ফেরার পর, ভন্ড মুনাফেকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে সত্যি সত্যিই অভিযানে সহগমনে ব্যর্থতার জন্য মিথ্যা ওজর আপত্তি, মিথ্যা শপথ বা মিথ্যা বাহানা করতে থাকে এবং নির্দোষিতা প্রমানের প্রয়াস চালায়।

এভাবে মোনাফেকদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে উপরোক্ত আগাম সংবাদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোনাফেকদের অনিষ্টকর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী মসজিদ 'মসজিদে জেরার' নির্মাণের হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগাম সংবাদ প্রদান

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে আসার পর মদীনায় বসবাসকারী কতিপয় অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী/মুনাফেক মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ, বিচ্ছেদ ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদকেই কোরআনের ভাষায় 'মসজিদে জেরার' বলা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহার নির্মান অসংগত বলে প্রতিয়মান না হলেও আসলে উহা নির্মিত হয়েছিল ষড়যন্ত্র ও দুরভিষন্ধিমূলক অভিপ্রায় নিয়ে। নির্মাতারা উহা নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যাও দিয়েছিল যা ছিল মিথ্যাশ্রয়ী। নির্মাতারা উহাতে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়িয়ে উদ্বোধন করে দেয়ার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পীড়াপিড়ি করতেছিল। কিন্তু রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তা সরাসির অস্বীকার না করে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেন এবং এরই মধ্যে তিনি ইতিহাস খ্যাত সেই 'তবুক' অভিযানে বহির্গত হন। তবুক থেকে ফিরার পথে 'যি আওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ 'অহি' (বর্ণিত আয়াত সমূহ) নাজিল করে দিয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগাম জানিয়ে দিলেন যে, তারা (মোনাফিকরা) যে মসজিদ নির্মাণ করেছে তা অনিষ্টকর, যন্ত্রণা প্রদানকারী ও বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী 'মসজিদ'। তারা অবশ্য মিথ্যার উপর ভিত্তি করে নানা প্রকার অজুহাত ব্যাখ্যা দান করবে এবং মিথ্যা কসম খেয়ে বলবে যে, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ বলে দেন যে, তাদের এসব কথা সম্পূর্ন মিথ্যা এবং তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। অতঃপর উহাতে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ না পড়ার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ

"কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই) তারা ক্ষতিগ্রস্থ করবে এবং (খোদার বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরি করবে এবং ঈমানদার লোকজনের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাংগন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদতখানাকে) সেই ব্যক্তির জন্য ঘাটি বানাবে, যে লোক ইতিপূর্বে খোদা ও তাঁর রাছুলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা অবশ্য কসম খেয়ে বলবে যে, ভাল করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন ইচ্ছাই ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। তুমি কস্মিন কালেও সেই ঘরে দাঁড়াবেনা। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তাহাই এই জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি তথায় (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াবে। ইহাতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহরও পছন্দ, এ সব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে।" (সূরা তওবা, আয়াত- ১০৭-১০৮)।

www.pathagar.com

মসজিদ জেরার বা বিভেদ সৃষ্টি যন্ত্রণাদায়ক মসজিদ তৈরীর ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ নবী করীম (ছাঃ) এর মদীননায় হিজরত করে আসার পূর্বে খাজরাজ বংশে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলিয়াতে কালে সে খৃষ্টীয় পাদ্রী হয়েছিল। সে 'আহলে কিতাব' আলেম-পন্ডিতদের মধ্যে গণ্য হত। সে রাহেব বা পাদ্রী ছিল বলে তার পান্ডিত্যের মর্যাদার সংগে সংগে তার দরবেশীর খ্যাতিও মদীনার আশেপাশের জাহেল আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবী করিম (ছাঃ) যখন মদীনায় উপনীত হলেন, সে সময় মদীনায় আবু আমেরের প্রাধান্য খুব ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তার এ ইল্‌ম ও দরবেশী তার মধ্যে সততা ও সত্যানুসন্ধিৎসা জাগাতে পারে নাই বরং উহা তার জন্য এই পথে একটা বড় বাঁধা হয়ে দেখা দেয়। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে দেখা গেল যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমণের পরও সে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই থাকে নাই, বরং সে নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বীয় প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার দরবেশী কারবারের দুশমন মনে করে নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর কাজের বিরোধীতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। প্রথম দুই বৎসর পর্যন্ত সে মনে করে ছিল যে, কাফের কুরাইশ শক্তিই ইসলামকে নির্মূল করে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু বদর যুদ্ধে, করাইশরা যখন পরাজিত হল তখন সে আর চুপ হয়ে বসে থাকতে পারল না। সেই বৎসরই সে মদীনার বাহিরে চলে গেল এবং সে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব কাবীলার (গোত্রের) মধ্যে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালাতে শুরু করল। ওহুদের যুদ্ধ যাদের চেস্টায় অনুষ্ঠিত হয়, আহযাব যুদ্ধে যে সৈন্যরা চারিদিক থেকে এসে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল, তাদের এই চড়াও হবার কাজে উত্তেজনা দানের পশ্চাতে আবু আমেরের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। উহার পর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেই সবের মধ্যেই এই পাদ্রী দরবেশরই সক্রিয় সমর্থন ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তিই ইসলামের এই উদ্যাম জোয়ার প্রতিরোধ করতে পারবে বলে তার কোন বিশ্বাসই থাকল না। এই কারণে সে আরব দেশ থেকে বের হয়ে রোমে চলে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল রোমান সম্রাট কাইজারকে আরবদেশে উত্থিত এই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ঠিক এ সময় মদীনায় সংবাদ এসে পৌছায় যে, কাইজার আরব দেশের উপর আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি চালিয়েছে। উহারই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য নবী করীম (ছাঃ) কে 'তবুক' অভিযানে গমন করতে হয়েছিল।

আবু আমের পাদ্রীর এ সব অপতৎপরতায় মদীনার মুনাফিকদের একটি দল সব সময়েই তার সহিত ষড়যন্ত্রে সাথী হয়েছিল। ইহাদের সর্বশেষ মতৈক্যভিত্তিক প্রস্তাব ছিল এই যে, তার নিজের ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইজার ও উত্তর আরবের সমস্ত খৃষ্টান রাজ্যগুলির সামরিক সহায্য লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে সে যখন রোম যাত্রা করল তখন তার ও মুনাফিকদের মাঝে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, মদীনায় ইহারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র মসজিদ গড়বে। ইহার সাহায্যে সাধারন মুসলমান হতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে মুনাফিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে উঠা সম্ভব হবে। উহা একটি ধর্মীয় কাজ বলে লোকেরা জানবে আর সহজে কেহ সেই

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহও করতে পারবে না। সেখানে মুনাফিকরা স্বতন্ত্র ভাবে শুধু সংঘবদ্ধই হবেনা, ভবিষ্যতের কাজ ও কর্মসূচী সম্পর্কে পরস্পর মিলে মিশে সেখানে শলা পরামর্শও করতে পারবে। উপরন্ত, আবু আমেরের নিকট থেকে যেসব গোয়েন্দা খবরাখবর ও কাজের নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও ফকীর ও মুসাফিরের বেশে সকল সন্দেহ হতে মুক্ত হয়ে এখানে অবস্থান করতে পারবে। এই আয়াত কয়টিতে যে মসজিদের উল্লেখ করা হয়েছে, উহার নির্মাণের পশ্চাতে ইহাই ছিল সেই নাপাক ষড়যন্ত্র ও গোপন উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, মদীনায় এ সময় দুইটি মসজিদ বর্তমান ছিল। একটি 'মসজিদে কুবা'। ইহা অবস্থিত ছিল মদীনা শহরের উপকণ্ঠে। আর দ্বিতীয় ছিল 'মসজিদে নব্বী'। ইহা ছিল শহরের মধ্যে। এই দুইটি মসজিদ বর্তমান থাকা সত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক এ সময়ে মসজিদের নামে একটি ইমারত নির্মাণও কোন সওয়াবের কাজ বলে তখনও বিবেচিত হতে পারতনা। কেননা এ সময়টি তেমন কোন নির্বুদ্ধিতাজনক ধর্মীয় ভাবধারা দেখাবারও উপযুক্ত ছিলনা। বরং অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। এ সময় একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের একমাত্র অর্থ ছিল এই যে, ইহার ফলে মুসলিম সমাজে বিচ্ছেদ দেখা দিবে। কিন্তু ইসলামের গড়া একটি সুষ্ঠ পবিত্র স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণের পূর্বে উহার প্রয়োজন প্রমাণ করতে ও উহার উপযুক্ততা সম্পর্কে কারণ দর্শাতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, বৃষ্টি ও শীতের রাত্রে সাধারণ লোক ও দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে- বিশেষত দূরবর্তী লোকদের পক্ষে এই দুইটি মসজিদে যাতায়ত করা আর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে রীতিমত শরীক হওয়া বড়ই মুশকিল হয়ে পড়েছে। এ কারণে নামাজের সহজতার জন্য আমরা একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে ইচ্ছা করেছি।

এ পবিত্র ইচ্ছা ও বাসনা প্রকাশ করে যে 'জিরার মসজিদটি' তারা নির্মাণ করে নিল উহাতে একবার নামাজ পড়ে উহার উদ্বোধন কার্য সমাধা করার জন্য তারা এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে প্রস্তাব পেশ করল। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) ইহাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেনঃ "এখন তো আমি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। সামনে একটি বড় রকমের অভিযান উপস্থিত। উহা থেকে ফিরে এসে দেখা যাবে।"

অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তবুকে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই লোকেরা এ মসজিদকে কেন্দ্র করে নিজেদের দলকে সংঘবদ্ধ করতে ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করার কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকল। এমনকি তারা এতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করে বসল যে, ঐদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের পরাজয় ও মুলোৎপাটন হলেই এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর (মদীনার প্রধান মুনাফিক) মাথায় বাদশাহীর মুকুট পড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তবুকে যা ঘটল তাতে তাদের সব আশা ভরসাই পানি হয়ে গেল। ফিরে আসার সময় নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনার নিকটবর্তী 'যি-আওয়ান' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন এই আয়াত কয়টি নাজিল হল। নবী করীম (ছাঃ) তখনি কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, হযরতের মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই যেন তারা এই জিরার মসজিদটিকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

www.pathagar.com

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর সমূহ থেকে দেখা যায় যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ মদীনায় হিজরত করে আসার পর থেকেই মদীনার একদল কপট মুনাফিক, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, বিরোধ, বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র মূলক কার্য্যকলাপ চালিয়েছিল। সেখানে খাজরাজ রংশীয় আবু আমের নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তকে মেনে নিতে পারে নাই। সে তার দলবলসহ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র/চক্রান্ত যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে সেজন্য ঘাটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি তথাকথিত মসজিদ নির্মাণ করে। ষড়যন্ত্র কারীদের নির্মিত এই মসজিদটিই হচ্ছে আল্লাহর ভাষায় 'মসজিদে জেরার'। উহাতে এবাদত বন্দেগী করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা, বরং এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেধ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করাই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য।

মদীনায় ইতোমধ্যে ২টি মসজিদ বর্তমান ছিল। একটি কুবা পল্লীতে, অপরটি মদীনা শহরের মধ্যেই মসজিদে নব্বী। এ দু'টি মসজিদ বর্তমান থাকা অবস্থায় মুসলমানেরা তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। করলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-ই মসজিদ নির্মানের নির্দেশ দিতেন।

এমতাবস্থায় কি কারণে আবু আমেরের দল ও মুনাফেকরা আরও একটি মসজিদ নির্মাণ করল তা তাৎক্ষনিকভাবে কেহই তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। মসজিদ নির্মাতারা উহার কারণ ব্যাখ্যাও করেছিল এবং উহাতে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়ার জন্য রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে পিড়াপিড়ি করতে থাকে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে উহাতে নামাজ পড়া স্থগিত রেখে তাদেরকে বলে দেন যে, তবুক অভিযান থেকে ফিরে এসেই যা করার করবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে উহাতে কোন রকমে দন্ডায়মান করাতে পারলেই উহার মাধ্যমে তাদের হীন কর্মকান্ড জায়েজ করা যাবে এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজনে ইহা অজুহাত হিসাবে খাড়া করা যাবে।

কিন্তু যিনি অন্তর্যামী তিনি তো ভাল করেই জানেন তাদের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ফলে তাদের হীন চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়ে তবুক অভিযান থকে ফেরার পথে 'যি-আওয়ান' নামক স্থানে উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তাঁর রাছুল (ছাঃ)-কে আগাম জানিয়ে দিলেন যে মসজিদ নির্মাণেনর জন্য তারা যে অজুহাত দেখিয়েছে তা অবৈধ এবং সর্বৈব মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উক্ত মসজিদে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ না পড়ার জন্যও পরিস্কার বলে দিলেন। কারণ উহার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে কষ্ট/যন্ত্রনা প্রদান এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য বিভেদ, বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ'র নিকট থেকে অহির মাধ্যমে ইহা অগ্রিম অবহিত হয়ে মসজিদে জেরার মসজিদটি ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ফলে সাহাবাগণ অবিলম্বে ইহা ধ্বংস করে ফেলেন।

এভাবে যন্ত্রনাদায়ক ও বিভেদ সৃষ্টিকারী মসজিদটি নির্মানের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগাম অবহিত হয়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহার বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে মুশরিক/মুনাফিকদের একটি ঘোরতর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পানিতে নিমজ্জিত ফেরাউনের মরদেহ নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত হবে বলে আগাম ঘোষণা

নবী মুসা (আঃ)-এর সময়কার মিশরের রাজা/বাদশা ছিলেন ফেরাউন। ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে নবী হিসাবে মানত না। বরং সে নিজেই নিজেকে খোদা হিসাবে দাবী করত। ধর্মদ্রোহী ও খোদাদ্রোহী ফেরাউন ও তার জাতিকে হেদায়েত তথা সৎ পথ দেখানোর উদ্দেশ্য আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে নবী হিসাবে পাঠালেন মুসা (আঃ)-এর কঠোর বিরোধীতা করার কারণে আল্লাহ আগাম ঘোষণা করে দেন যে তাকে হত্যা করে তার লাশ উদ্ধার করে নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত হবে। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর কতিপয় বাণীর উল্লেখ করা হল। আল্লাহ বলেন, **"তোমার আল্লাহ যখন মুসাকে ডেকে বলল, যাও যালেম জাতির নিকট, ফেরাউনের নিকট" (সূরা শোয়ারা- আয়াত-১০)**। ফেরাউন ও তার জাতির নিকট প্রেরণের পর ফেরাউনের প্রতি মুসা (আঃ) এর যে আহ্বান ছিল তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) **"তুমি কি পবিত্র পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক? আমি কি তোমাকে তোমার রব এর পথ দেখাব এবং তুমি কি তোমার রবকে ভয় করে চলবে?" (সূরা নাযিয়াত - আয়াত-১৮-১৯)**।

(খ) **"আমরা তোমার নিকট তোমার রব এর নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছি আর শান্তি ও নিরাপত্তা তার জন্য যে সঠিক পথের অনুসরণ করবে। আমার প্রতি অহি নাজিল করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে মিথ্যা মনে করবে ও অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নিবে" (সূরা ত্বাহা- আয়াত- ৪৭-৪৮)**।

ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা শুরু করে দিল। ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে যে সকল কারণে বিরোধীতা করতো তার স্বরূপ ও প্রকৃতি কোরআনে উল্লেখ রয়েছে যার কতিপয় বিবরণ এখানে দেয়া হল ঃ-

(ক) **"আর ফিরাউন বলল ঃ হে সভাষদবৃন্দ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন রবকে জানি না।" (সূরা- কাছাছ- আয়াত- ৩৮ অংশ)**।

(খ) **"ফেরাউন জাতির সর্দারেরা বলল, (হে ফেরাউন) তুমি কি মুসা ও তার জাতিকে এ সুযোগ দিবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাকেও তোমার মাবুদদেরকে পরিহার করে চলবে?" (সূরা- আ'রাফ- আয়াত-১২৭)**।

www.pathagar.com

(গ) **"হে জাতির লোকেরা, মিশরের বাদশাহীর মালিক কি আমি নই? এই খাল ও ঝরণা সমূহ কি আমারই অধিন প্রবাহিত হচ্ছে না?" (সূরা যুখরুফ- আয়াত-৫১)।**

(ঘ) **"হে মুসা! তুমি কি এ জন্য এসেছ যে, তুমি তোমার যাদুর জোরে আমাদেরকে এদেশ থেকে বেদখল দেবে?" (সূরা- ত্বাহা- আয়াত-৫৭)।**

(ঙ) **"আমি ভয় করছি যে, এ ব্যক্তি তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" (সূরা মু'মেনুন- আয়াত-২৬)।**

এভাবে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা মুসা (আঃ)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে তা'কে রাজ্য থেকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলে আল্লাহও ফেরাউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করার নিমিত্তে কৌশল অবলম্বন করেন। এ প্রসংগে আল্লহ বলেন, **"সে এবং তার সৈন্য সামন্ত পৃথিবীতে কোন অধিকার ছাড়াই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসল। মনে করল যে, তাদেরকে কখনও আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সৈন্য সামন্তকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখ এই যালেমদের কি পরিণতি হয়েছে" (সূরা কাছাছ, আয়াত- ৩৯-৪০)।** পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, পানিতে নিমজ্জিত ফেরাউনের মরদেহ উদ্ধার করে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য নিদর্শন/প্রতীক হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। প্রাসংগিক সূরা ও আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

"আর আমরা বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম, ঐদিকে ফেরাউন ও তার সৈন্য বাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য, তাদের পিছনে ছুটে চলল- শেষ পর্যন্ত ফেরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখণ বলে উঠলঃ আমি মানতেছি যে, প্রকৃত খোদা তিনি ছাড়া আর কেহ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে, আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (জবাব দেয়া হল) "এখন ঈমান আনতেছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করতেছিলে, আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের অন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাক" (সূরা ইউনুস, আয়াত-৯০-৯১)।

(ক) **ফেরাউনের সব দেহ সন্ধান** -এই আয়াতে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষিত হয়েছে যে, আল্লাহতা'য়ালা ফেরাউনের নিমজ্জিত দেহ উদ্ধার করে, পরবর্তী কালের লোকদের জন্য স্বীয় অলৌকিক মহিমার নিদর্শন স্বরূপ সুরক্ষিত করে রাখবেন। কিন্তু বাইবেলে এ সম্বন্ধে কোন উক্তি পরিদৃষ্ট না হওয়ায় এবং কোরআন

www.pathagar.com

অবতরণের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ফেরাউনের দেহ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় খৃষ্টান জাতি স্বর্গীয় কোরআনের (এই আয়াতের) সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রচার করবার একটি বড় সুযোগ পেয়ে আসছিল। মুসলমান তফসীরকারকগণও খৃষ্টানদিগের অভিযোগের উত্তরে "নিশ্চয় কোন পিরামিডের মধ্যে ফেরাউনের দেহ সুরক্ষিত আছে"- এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে নাই। কিন্তু তার পর দ্বিতীয় রামেসিসের "মমি" বা সুরক্ষিত সব দেহ আবিস্কৃত এবং উহাই হজরত মুসার সমকালীণ ফেরাউনের মৃত দেহ বলে প্রমাণিত হওয়ায় পবিত্র কোরআন এর উক্ত বাণীর স্বর্গীয় সত্যতা এবং বাইবেলের অসম্পূর্ণতা অতি উজ্জলভাবে ও নিঃসন্দেহরূপে প্রামাণিত হয়ে গিয়েছে। (এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়ায় "মমি" বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য)। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

(খ) সীন (সীনাই) উপ-দ্বীপের পশ্চিম তীরে ফেরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। স্থানটি এখনও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানে এ স্থানটিকে বলা হয় "ফেরাউন পর্ব্বত"। উহার নিকটেই একটি উষ্ণ কূপ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা উহাকে ফেরাউনের হাম্মাম-স্নানাগার বলে থাকে। ইহা 'আবু জনীস' নামক স্থান থেকে উপরে উত্তর দিকে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা সু-নির্দিষ্ট ভাবে বলে থাকে যে এখানেই ফেরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

(পানিতে) ডুবে মরে যাওয়া ফেরাউন যদি সেই 'মুন্‌ফাতা' ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে মুসার ফেরাউন বলা হয়েছে, তা হলে তার লাশ বর্তমানে কায়রোর যাদু ঘরেই সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটন ইলিয়ট স্মীথ এই মমির উপর থেকে যখন আচ্ছাদন খুলে ফেলে ছিলেন তখন উহার লাশের উপর লবনের পুরু স্তর জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ইহা লবনাক্ত পানিতে ডুবে যাবার এক বাস্তব প্রমাণ। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

সেই পিড়ামিডের ভিতরেই ফেরাউনের লাশ অতি সযত্নে বিস্ময়করভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে যা আজ বিশ্ববাসী মিশরের যাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছে। পিরামিড থেকে উদ্ধারকৃত তখনকার ফেরাউনের মমির একটি প্রতিকৃতি এখানে প্রদর্শিত হল যা দৈনিক সংগ্রাম, তারিখ ৩১/১০/১৯৯৩ ইং থেকে সংগৃহিত হয়েছে। অতি আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এই বিশাল পিরামিডের (যা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটি এবং যার নির্মাণ প্রণালীর রহস্য আবিষ্কার করতে বিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানীরাও চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা যায়, উহার) ভিতরে ফেরাউনের লাশ কি

www.pathagar.com

ভাবে ঢুকানো হল যার মমি আজ হাজার হাজার বছর পরও অটুট- অবস্থায় পাওয়া গেল!

উল্লেখ্য যে, পানিতে নিমজ্জিত ফেরাউনের মরদেহ উদ্ধার করে সংরক্ষিত করে রাখার ঘোষণাটি কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যা অতি বিস্ময়কর ভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে ঐতিহাসিক সত্যরূপেই আজ বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই বিরাজমান।

ফেরাউনের একটি প্রতিকৃতি, যা মিশরে পিরামিডের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

হোদায়বিয়ায় "বয়াতে রিজওয়ানে" অংগ্রহণকারীগণকে অনতিবিলম্বে একটি বিজয় প্রদানসহ আরও বহু গণিমতের মাল অর্জন করবে বলে আগাম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে পবিত্র মক্কায় 'ওমরা' পালন উপলক্ষে চৌদ্দশত সাহাবাকে নিয়ে মক্কারই উপকণ্ঠে 'হোদায়বিয়া' (বর্তমান নাম সুমাইসিয়া) নামক স্থানে উপনীত হন। সেখানে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলেন যে মক্কার কাফের মুশরিকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণকে 'ওমরা' পালন করতে দেবে না এবং ওমরা অনুষ্ঠানের বিরোধীতায় প্রয়োজনে তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও দ্বিধা করবে না।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা একমাত্র ওমরা পালনের উদ্দেশ্যেই নিরস্ত্র অবস্থায় কুরবানীর পশুসহ এসেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু তারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার কোন মূল্যই দিচ্ছিল না। এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যে বহু কথাবার্তা ও বাকবিতন্ডা চলতে থাকাকালে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য হজরত ওসমান (রাঃ)-কে মক্কায় কোরেশদের কাছে পাঠানো হল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ফিরতে দেরি হলে গুজব রটে গেল যে, ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। এরূপ দুঃসংবাদে সাহাবাগণ বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তিরোহিত হবার উপক্রম হল। এক পর্যায়ে অবস্থা এরূপ হয়ে দাঁড়াল যে, কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বা জেহাদ করা ছাড়া উপায় থাকল না। এরূপ পরিস্থতিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত সকল সাহাবাগনকে একটি বৃক্ষতলে সমবেত করে কাফের/মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংকল্পে অটুট থেকে আমরণ জেহাদ চালিয়ে যাবার এক 'বায়াত' গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এই বয়াতকেই 'বায়াতে রিজওয়ান' বলা হয়ে থাকে।

পরবর্তীতে হজরত ওসমান (রাঃ) ফিরে আসলে জানা গেল তাঁর নিহত হবার কথাটি ছিল নিতান্ত একটি গুজব। পরিশেষে সংঘর্ষ পরিহার করে একটি সন্ধি/চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেল যা ইতিহাসে 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামেই অবহিত। হোদায়বিয়ার বায়াতে রিজওয়ানে অংশগ্রণকারীগণের দিকে ইংগিত করেই আল্লাহতা'য়ালা অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এক আরামদায়ক প্রশান্তি নাজিল ও পুরস্কার স্বরূপ একটি আসন্ন বিজয় (খয়বর বিজয়) দান করেছেন এবং অনতিবিলম্বে আরো বহু গণিমতের (জিহাদলব্দ) মাল অর্জন করবেন। আল্লাহর উপরোক্ত আগাম ঘোষণাটি অদূরবর্তী ভবিষ্যতেই বাস্তাবায়িত হতে দেখা গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর ঃ

"আল্লাহতায়ালা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন যখন তাঁরা গাছের তলায় আপনার নিকট 'বায়আত' করেছিল। তাঁদের দিলের অবস্থা তাঁর (আল্লাহ'র) জানা ছিল। এইজন্য তিনি তাঁদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন। পুরস্কার হিসাবে

www.pathagar.com

তাঁদেরকে একটি (তাৎক্ষণিক) নিকটবর্তী বিজয়দান করলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু গণীমতের সামগ্রী তাঁদেরকে দিলেন যা তাঁরা (শীঘ্রই) অর্জন করবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী (সূরা ফাতহ্ আয়াত-১৮-১৯)।

(ক) উপরোক্ত আয়াতে হোদাইবিয়ার সন্ধিকালে সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে গৃহীত বায়আতের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বায়আতকে বলা হয় 'বায়আতে রিদওয়ান' (সর্বাধিক মাত্রার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানের অংগীকার)। কেননা আল্লাহতায়ালা এ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় আগাম সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, "তিনি সেই লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যারা এ বিপদ সংকুল সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিতেও এক বিন্দু কুণ্ঠিত হন নাই"। বরং রাছুলে করীম (ছাঃ)-এর হাতে আত্মদানের 'বায়আত' করে নিজেদের প্রকৃতি ও একনিষ্ঠ ঈমানদার হবার সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। সময়টা এতই নাজুক ছিল যে, মুসলমানগন নিছক প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য একজন মাত্র এক এক খানি তরবারি নিয়ে এসেছিলেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত। কোন সামরিক সরঞ্জামাদিও তাদের ছিলনা। কেবলমাত্র ইহরামের চাদর তাঁদের দেহ আবৃত ছিল। তাঁদের সামরিক প্রানকেন্দ্র (মদীনা) থেকে তারা প্রায় আড়াইশত মাইল দুরে অবস্থিত ছিলেন এবং শত্রুপক্ষের লীলাভূমি (মক্কা) কেবলমাত্র তের মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে তারা সকল প্রকার সাহায্য লাভ করতে পারত। আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (ছাঃ) এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি এই লোকদের আন্তরিকতা ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা যদি একবিন্দুও কম হত তাহলে এই কঠিন বিপদ সংকট কালে তারা রাছুলে করীম (ছাঃ) এর সংগ ও সাহচর্য ত্যাগ করে চলে যেতেন এবং ইসলামের অগ্রগতি চিরতরে স্তব্দ হয়ে যেত। তাঁদের নিজেদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা ব্যতীত বাহ্যিক চাপ এমন আর কিছুই ছিলনা, যার দরুন তারা এরূপ বায়আত গ্রহণে বাধ্য হতে পারেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য এই কঠিন সময়ে মৃত্যুবরন ও শত্রু নিধনে তাঁদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহ ও রাছুলে করীম (ছাঃ)-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ভাব ধারার পুর্নাংগ ও উচ্চতম মানে উন্নীত ছিলেন। এ কারনেই আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করলেন। (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

(খ) হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) (হোদায়বিয়ায়) অবস্থানকালে একটি ছায়াশীতল তরুতলে অবস্থান করে যে চৌদ্দশত ধর্মপ্রান মুসলমানের নিকট ধর্মযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছিলেন, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদের প্রসংগ উল্লেখ করে বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ঐ সকল বিশ্বাসী মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তাঁদের আন্তরিক সৎসাহস ও সৎউদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হয়েই আমি তাদের অন্তরে সাহস ও শান্তনা (সাকিনা) অবতীর্ন করেছি। তাঁদের এই সত্যানুরাগ ও সৎসাহসের জন্য আমি তাঁদেরকে ইহলোক ও পরলোককে পুরস্কৃত করব। পার্থিব পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা অচিরেই 'খয়বর' যুদ্ধে ঈহুহীদিগের উপর জয়লাভ করে যুদ্ধলব্ধ বহু ধন সম্পদ লাভ করবে এবং পরলোকে স্বর্গীয় সুখ সম্পদসহ অতুলনীয় গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহাবাগনের নিকট থেকে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহনকে 'বায়তুর রেজওয়ান' বলা হয়। এতদভিন্ন তিনি মক্কায় হিজরতের পূর্বে মদীনার মুসলমানদিগের নিকট থেকে একবার সত্যানুসরণের ও আর একবার আত্মরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। এই দুইটি প্রতিশ্রুতি 'বায়তুল আ'কাবা' নামে খ্যাত। মুসলমান নারীদিগের নিকট থেকেও তিনি একবার সত্যানুসরণের সুদৃঢ় থাকবার জন্য প্রতিশ্রুতি/বায়ত গ্রহণ করেছিলেন। (সূরা মুমতাহিনা-আয়াত-১২)।

সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যারা 'বায়তুর রেজওয়ানে' উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গোদ্যানের (বেহেশতের) অধিবাসী হবে এবং তাঁদের মধ্যে কেহই নরকগামী (দোজখী) হবে না। হাদিস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মোসেলম জগতে বদর-যোদ্ধাগণের পরে ইঁহারাই উচ্চতম গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী। (সহি বোখারী- তফসীরে কোরান শরিফ)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে ইহা দেখা যায় যে, আল্লাহতায়ালা এই মর্মে অগ্রীম ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, হোদায়বিয়ার একটি বৃক্ষতলে সন্ধির পূর্বে হযরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতের উপর হাত রেখে যে সকল সাহাবা 'বায়াত' (অংগীকারাবদ্ধ) হয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে 'প্রশান্তি' নাজিল করেছেন এবং তাঁদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় অর্থাৎ 'খয়বর' বিজয় দান করেছেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রচুর গনিমতের মাল (জেহাদলব্ধ মালামাল) প্রদান করেছেন। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে (আরো বহু সংখ্যক বিজয়ের মাধ্যমে) অফুরন্ত গণিমতের মালামালের অধিকারী হবার স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর পরই উপরে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বানীর বাস্তবায়ন স্বরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ষড়যন্ত্রকারী কপট, প্রতারক ঈহুদীদের ঘাটি 'খয়বর' বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং প্রচুর গণিমতের মাল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া মুসলমানেরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বহু সংখ্যক বিজয়ের মাধ্যমে বহু গণিমতের মাল হস্তগত করেন।

এভাবে আল্লাহর উপরোক্ত ওয়াদা/ঘোষণা অনতিবিলম্বে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়ে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

হোদায়বিয়ার সন্ধির অনতিবিলম্বে 'খয়বর' বিজয়ের পর আরও বহু বিজয়ের মাধ্যমে বিপুল গণিমতের মাল হস্তগত হবে বলে অগ্রিম ঘোষণা

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কাবায় 'ওমরা' পালন উপলক্ষে চৌদ্দশত সাহাবা সমেত মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে 'হোদায়বিয়া' (বর্তমান নাম 'সুমাইসিয়া') নামক স্থানে উপনীত হন। কিন্তু ইসলামের শত্রু মক্কার কাফের/মুশরিকরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সংগী সাথী সাহাবাদের ওমরা পালনে বাঁধা সৃষ্টি করল। তারা কিছুতেই তাঁদেরকে ওমরার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজী হল না। অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি ও বাদানুবাদের পর সে বৎসর ওমরা পালন না করে, পরবর্তী বৎসর ওমরা পালনের ও অন্যান্য কতিপয় শর্তে একটি সন্ধিতে উপনীত হওয়া গেল যা ইতিহাসে 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে খ্যাত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা একটি অসম চুক্তি বলে প্রতিয়মান হলেও আল্লাহতা'য়ালা এই সন্ধিকেই 'স্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন (সুরা ফাতহ আয়াত-১)। ইহা ছাড়া সন্ধির ফলশ্রুতিতে আল্লাহতা'য়ালা মুসলমানদেরকে একটি ত্বড়িৎ বিজয় অর্থাৎ ঈহুদীদের ঘাটি 'খয়বর' বিজয় দান করেন। তাছাড়া আরও বহু সংখ্যক বিজয়ের মাধ্যমে আরো বিপুল গণিমতের মাল প্রদান করবেন বলে আগাম সু-সংবাদও দেন। আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন স্বরূপই অবিলম্বে খযবর বিজয়ের পর আরও বহু বিজয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমান গণিমতের মালামাল নবী করীম (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবা তথা মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলমানগণ কর্তৃক অর্ধবিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমা ও তফসীর ঃ-

"আল্লাহ তোমাদেরকে বহু যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি অংগীকার করেছেন - যা তোমরা প্রাপ্ত হবে ঃ অনন্তর তিনি তোমাদের জন্য ইহা (আসন্ন খায়বার বিজয়) অতি শীঘ্র করেছেন এবং তোমাদের উপর থেকে মানবদিগের হস্ত প্রতিরোধ করেছেন এবং যেন উহা বিশ্বাসীগণের জন্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে থাকে এবং যেন তিনি তোমাদিগকে সরল সুপথ পথ প্রদর্শন করেন, এবং অন্যান্যদিগকেও যাদের উপর তোমরা এখনও আধিপত্য লাভ করতে পার নাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। এবং যদি অবিশ্বাসকারীরা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে তবে নিশ্চয় তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তৎপর তারা কোন অভিভাবকই অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবে না। ইহাই আল্লাহর নীতি; নিশ্চয় ইহার পূর্বেও ইহা অতিক্রান্ত হয়েছে ঃ এবং তুমি কখনই আল্লাহর নীতিতে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হবেনা।" (সূরা ফাতহ- আয়াত ২০-২৩)।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহতা'লা মুসলমানদিগকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তোমরা 'খয়বর' যুদ্ধে জয়লাভ করে যেরূপ বহু ধনসম্পদ লাভ করবে, সেরূপ আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য আরও বহু যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদের অংগীকার করছেন। তোমরা শীঘ্রই আরব ও আজমের বহু শক্তিমান ও সম্পদশালী জাতির উপর জয়লাভ করে ঐ সকল ধনসম্পদের অধিকারী হবে। আল্লাহতা'লার স্বীয় অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ তোমাদিগকে সাধনা ও সাফল্যের সরল সুপথ প্রদর্শন করে তোমাদিগ থেকে অন্যান্য মানবদিগের হস্ত প্রতিরোধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কিছুতেই তোমাদের এ বিজয়াভিযানের গতিরোধ করতে পারবেনা।

পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী জাতি- যাদের উপর তোমরা এখনও আধিপত্য লাভ করতে পার নাই, ক্রমে ক্রমে তারাও তোমাদের নিকট পরাজিত ও নতশির হতে বাধ্য হবে। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার এ ইচ্ছা ও নির্দ্ধারণ কেহই অতিক্রম করতে পারবেন না। এ আয়াতে রোমক, পারসিক, সিরিয়া, মিসরীয় ও অন্যান্য শক্তিলাশী জাতির উপর মুসলমানদিগের বিজয় লাভের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

(পরবর্তী আয়াতে) আল্লাহতা'লা সুসংবাদ ও অভয় প্রদান করে বলেছেন যে, অবিশ্বাসীরা যতই শক্তিমান ও সম্পদশালী হউক না কেন, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করলে তারা অবশ্যই পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে এবং সেই পরাজয় ও লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে কেহই সাহায্য অথবা রক্ষা করতে পারবেনা। আল্লাহতা'লা আরও বলেছেন যে, সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়- ইহাই আমার চিরন্তন নীতি, অতীতেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হবেনা।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র কোরানের ঐ সকল বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বানী কিরূপে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল এবং সত্যবিশ্বাসী মুসলমানেরা কিরূপ অবলীলাক্রমে রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সভ্য জগতের সর্বত্র ইসলামের জয়-পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং কিরূপভাবে পূণ্যধাম মদীনা অফুরন্ত ধনরত্নে পূর্ণ হয়েছিল জগতের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। পবিত্র কোরান যে আল্লাহতা'লার অভ্রান্ত ঐশ্বীবাণী, ঐ সকল আলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্ময়কর সফলতা দ্বারাই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। (তফসীরে কোরান শরিফ)।

সূরা ফাতহ্ -এর উল্লেখিত আয়াত সমূহে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদেরকে এরূপ অগ্রিম সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, "খয়বর" বিজয়ের পর অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আরো বহু বিজয় লাভের মাধ্যমে প্রচুর গণিমতের (জেহাদলব্ধ) মালের অধিকারী হবে। অর্থাৎ শীঘ্রই অবিশ্বাসী কাফের/মুশরিকদের বিরুদ্ধে আরো জেহাদ অনুষ্ঠিত হবে যাতে তারা (কাফের/মুশরিকরা) পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়ে যাবে এবং প্রতিফল স্বরূপ (জেহাদলব্দ) অজস্র সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হবে। অবিশ্বাসীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারা মুসলমানদের গতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা। নবী-রাছুলগণের

www.pathagar.com

বিরোধীদের প্রতি মহান স্রষ্টার ইহাই চিরন্তন নীতি এবং এক্ষেত্রেও সে নীতির কোনই ব্যতিক্রম হবে না।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ যখন নাজিল হয়েছিল তখন মুসলমানদের ধনবল, জনবল ও অস্ত্রবল ছিল খুবই নগণ্য। বাহিরের অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতি তো দূরের কথা সমগ্র আরবের প্রবল প্রতাপশালী শক্তিধর কাফের/মুশরিকদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে তাদেরকে ধ্বংস করে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা এক সময় সেটাই ছিল সন্দেহ। কিন্তু আল্লাহ'র দেয়া উক্ত প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস তখনকার বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসীদের নিকট অতি হাস্যকর বলে প্রতিয়মান হলেও, এ আগাম ঘোষণার বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন ঈমানদার মুসলমানের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলনা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলে যে, উপরোক্ত ঘোষনার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রথমে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয় এবং পরবর্তীকালে স্বল্পতম সময়ে সমগ্র আরবসহ অন্যান্য রাজ্যসমূহ মুসলমানদের করতলগত হয়ে যায়। অবশেষে মুসলমানেরা বিশ্বের এক বিশাল ভূ-ভাগের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।

এভাবেই মুসলমানদেরকে দেয়া আল্লাহ'র অগ্রিম প্রতিশ্রুতি/সুসংবাদ বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিরাজমান।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মহানবী হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর বিশ্ব মাঝে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পূর্ণ হবার এবং পরপারে মহাপ্রস্থানের অগ্রিম আভাস

ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্য প্রেরণের সময়ই মহান আল্লাহতা'য়ালা যে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ভূতলে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনার সুবিধাতে সময় সময় হেদায়েত বা শরীয়তী বিধান মালা প্রেরিত হবে। (সূরা বাকারা- আয়াত-৩৮) ঐসব পথ নির্দেশ নবী রাছুলগণের মাধ্যমেই বিশ্বমানবের উপর জারী হয়ে থাকে। আদি মানব হজরত আদম (আঃ) থেকে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) পর্যন্ত এক বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের (নবী/রাছুলগণের) মাধ্যমে মানুষের জন্য হেদায়েত বা পথ নির্দেশ স্বরূপ আসমানী কিতাব/সহিফা এসেছিল। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর ওহী আকারে যে সূরা/আয়াত নাজিল হয়েছিল তারই সমষ্টি হচ্ছে 'আল-কোরআন'। এই কোরআন একদিনে বা একরাত্রে নাজিল হয়ে যায়নি। ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তী জীবনে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে অল্প অল্প করে প্রয়োজানুসারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহা অল্প অল্প করে নাজিল হবার সুবাদে ইহার যাবতীয় হুকুম আহকাম, আদেশ নিষেধ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মক্কী জীবনে কাফের মুশরিকদের প্রচন্ড বিরোধীতা ও প্রতিরোধের মুখে নির্বিঘ্নে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর পক্ষে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করা, এমন কি নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে চলাফেরা করারও তেমন সুযোগ ছিল না। এরূপ মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়েই তিনি নিজে এক সময় তায়েফে গমন এবং সহচরগণকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মদীনায় হিজরত করে এসে কিছুটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেও, মক্কার কাফের/মুশরিকদের এবং মদীনার প্রতারক ঈহুদী ও মুনাফেকদের সার্বক্ষনিক বিরোধীতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে প্রতিটি মূহুর্তই উদ্বিগ্নের সাথে কাটাতে হাতো। এখানে (মদীনায়) এসে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বড় বড় জেহাদ ছাড়াও অসংখ্য ছোটখাট সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে । এরূপ মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও তাঁর নবুয়তী মিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি মোটেই বিচলিত হননি যা অতি বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ চান যে, কাফের/মুশরিক ঈহুদী মুনাফিকরা যতই বিরোধীতা ও প্রতিরোধ করুক না কেন তিনি তাঁর 'জ্যোতিকে' (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নবুয়তী মিশন তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করেন। তাই আল্লাহ বলেন, "তারা ইচ্ছা করে যে, তাদের ফুঁৎকার দ্বারাই আল্লাহর নূর/জ্যোতিকে নির্বাপতি করে দেবে। (কিন্তু) আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (দ্বীন ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন এবং যদিও এতে অবিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট হয়।" (সূরা ছফ্ আয়াত-৮)।

www.pathagar.com

উল্লেখিত শত সহস্র বাধা, বিঘ্ন ও চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলামকে বিজয়ীর পথে এগিয়ে নিয়ে যান। 'আহযাব' যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই তিনি মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন যার ফলশ্রুতিতে কাফের/মুশরিকদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। সবশেষে আরও কতিপয় বিজয় অভিযানের পর কাফের/মুশরিকরা আর কখনও মাথা তুলতে সক্ষম হয়নি। এভাবে আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র আরবে নিরংকুশ বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সর্বত্র তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসার ফলে, দলে দলে লোকজন এসে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবিষ্ট হতে থাকে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সমগ্র এলাকায় ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন হয়। আর ইসলামের এ বিজয়ের মধ্য দিয়েই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তী মিশনের এবং নবুয়তী জীবনের পরিসমাপ্তির ঘন্টা বেজে উঠে।

কোন মানুষ যদি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা কোন কাজ সম্পন্ন করার মানসে অন্য কোথাও বা ভিন্ন কোন দেশে যায় তখন সেখানে কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে গেলে সে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় রাছুল (ছাঃ)ও তাঁর নবুয়তী মিশন শেষে পরপারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রস্থানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইহকালের কাজকর্ম গোছিয়ে ফেলে অপরপারে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর ঃ

১। যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে।

২। এবং তুমি দেখবে যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ধর্মে) প্রবেশ করছে।

৩। তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (তওবা) কর; নিশ্চয় তিনি (অধিকতর ক্ষমাশীল ও) তওবা কবুলকারী (সূরা নাসর, আয়াত- ১-৩)।

(ক) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইহা কোরআন মজিদের সর্বশেষ সূরা। ইহা নাজিলের পর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল হয়নি। (মুসলিম নাশায়ী, তাবারানী, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে মারদুইয়া)। যদিও এরপর কতিপয় আয়াত নাজিল হয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরাটি বিদায় হজ্জ কালে "আইয়ামে তাশরীকের" মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা'তে নাজিল হয়েছিল। ইহার পরপরই নবী করীম (ছাঃ) নিজের উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সেই বিখ্যাত বিদায়ী হজ্বের ভাষণ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি এক পর্যায়ে বলেছিলেন "আমি জানিনা অতঃপর তোমাদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারব কিনা, সম্ভবত না।" তারপর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। তবে অধিকাংশের মতে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যখন এই সূরাটি নাজিল হয় তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে, আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর, তাবারানী, নাসায়ী, আবু হাতিম ইবনে মারদুইয়া) (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন - সংক্ষেপিত)।

www.pathagar.com

এই সূরাটি অবতীর্ণ হবার পর হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিখ্যাত সাহাবগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সূরাটিতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের (মহাপ্রয়ানের) পূর্বাভাস রয়েছে এবং সূরাটির মর্ম উপলব্ধি করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আসন্ন বিয়োগ-বেদনায় কোন কোন সাহাবী বিশেষ করে ইবনে আব্বাস (রাঃ) ক্রন্দন করতে থাকলে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে শান্তনা দিয়ে বলেছিলেন 'তোমাদের এই ধারণা সত্য যে, এতদ্বারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে তার পূর্ণতা বিকাশ লাভ ঘটেছে। ধরাতলে আমার কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে এবং আমার পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে এসেছে'। এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) এই সুরাটিকে "সূরাতুল বিদা" বা বিদায়ের সূরা বলে অভিহিত করেছেন। এ সূরাটির অপর নাম 'তাওদী' যার অর্থ বিদায় করা।

(খ) উম্মুল মোমেনীন হজরত হাবীবা (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এ বৎসরই আমার ইন্তেকাল হবে'। এ কথা শুনে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমা (রাঃ) কেঁদে উঠেন। ইহা লক্ষ্য করে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি চলে যাবার পর আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এ কথা শুনে হজরত ফাতেমা (রাঃ) হেসে উঠলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, পিতার ইন্তেকালের অনতিবিলম্বে তাঁরও মৃত্যু হবে এবং তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (অনতিবিলম্বে) পুনরায় মিলিত হতে যাচ্ছেন (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া) (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

(গ) উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহতায়ালা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে উদ্দেশ্যে করে যেন বলছেন যে, 'হে আমার প্রিয় রাছুল (ছাঃ) আমি তো তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, যখন তোমার প্রতি আমার প্রতিশ্রুত সাহায্য উপস্থিত হবে এবং আমারই সাহায্যে তোমার প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে পরাহত করে অবলীলাক্রমে তুমি মক্কা নগরী অধিকার করে নেবে এবং তার ফলে তুমি যখন দেখবে যে, সমগ্র দেশবাসী দলে দলে তোমার নিকট আগমণ করে তোমার আনুগত্য স্বীকার করে আমার মনোনীত সত্য ধর্ম- "দ্বীন ইসলামে" প্রবেশ করছে, তখন তুমি নিশ্চিত জেনে নিও যে, তোমার ধর্ম ও কর্মজীবনের সাধনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ও সফল হয়েছে এবং তোমার পার্থিব জীবনের দিনগুলিও ফুরিয়ে এসেছে। তোমার নবী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর ক্ষনস্থায়ী নশ্বর পৃথিবীতে অধিক দিন অবস্থান করার আর কোনই প্রয়োজন নেই। সেরূপ অবস্থায় তোমার প্রতি আমার অসীম অনুগ্রহ ও অনুপম সাহায্যের কথা স্মরণ করো। তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক আমার মহিমা বর্ণনা ও প্রশংসা গুণকীর্তন করিও এবং সর্বদা নিজেকে হাম্‌দ্ তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন রেখো। কারণ, একমাত্র আমার অনুগ্রহেই তুমি নবুয়তের এত বড় কঠিন কাজ ও দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে সফল ও সক্ষম হয়েছে। তুমি নিজের ও তোমার অনুগামী মুসলিম মন্ডলীর জন্যও দোয়া/ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমার প্রার্থনা অবশ্যই গ্রহণ করবো যেহেতু আমিই সর্বোত্তম করুণাময়, ক্ষমাশীল ও তওবা গ্রহণকারী (তফসীরে-কোরান শরিফ)।

www.pathagar.com

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এই আয়াতটি খুব বেশী করে পড়তেন "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবেহামদিকা আসতাগ ফেরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা"। তখন আমি নিবেদন করলাম ইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আপনি এসব কি পড়তে শুরু করেছেন? তিনি বললেন আমাকে একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখনই উহা দেখব তখনই যেন আমি এগুলি পড়ি, এই নির্দেশই আমার প্রতি দেয়া হয়েছে। আর ঐ নিদর্শন হচ্ছে (ইজা যা আনা.... অর্থাৎ উপরোক্ত সূরা নাসর) (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, ইবনে জরীর, ইবনুল মুনফির, ইবনে মারদুইয়া)।

হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর জীবনের শেষ ভাগে উঠতে বসতে, যেতে আসতে অর্থাৎ সর্বদাই এ দোয়াই উচ্চারণ করতেন "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আপনি সব সময়ই এ কথাগুলি কেন বলতে থাকেন? তিনি বললেন, আমাকে ইহা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এ সুরাটি পড়ে শুনালেন (ইবনে জরীর) (তফসীরে তাফহীমুল কোরআন)।

এভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন নিশ্চিত হলেন যে তাঁর 'মিশন' তথা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর ওফাত আসন্ন, তখন তিনি সেই বিদায় হজ্জে আরাফাতের মাঠেই তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতা এবং সফলতা সম্পর্কে উপস্থিত লক্ষ জনতাকে সাক্ষী রেখে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেন এবং তাদের সাক্ষ্যের প্রতি ইংগিত করে স্বয়ং আল্লাহকেও সাক্ষী রাখেন, যিনি তাঁকে এই মিশনে পাঠিয়েছেন।

বিদায় হজ্জের পর পরই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকল কাজকর্মে, চিন্তা-চেতনায় ও মন মানসিকতায় যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা কারও দৃষ্টি এড়াল না। বিদায় হজ্জের পর তিনি একদিন ওহোদের ময়দানে উপস্থিত হন। সেখানে মাটির নীচে শুয়ে আছেন তাঁরই সুখে দুঃখে আজীবনের সংগী আপন চাচা বীর হামজা (রাঃ) ও অন্যান্য বহু প্রিয় সাহাবাবৃন্দ। তাঁদের মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে মনে প্রাণে আবেগ জড়িত কণ্ঠে মোনাজাত করলেন। ওহোদের শহীদদের প্রতি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ইহাই ছিল শেষ মোনাজাত। এর পর একদিন নিঝুম নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে আকুল আবেগময় অবস্থায় নিকটেই 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে উপস্থিত হন। সেখানে শায়িত কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে শেষ বারের মত আকুলভাবে অধিক্ষণ অশ্রুসজল অবস্থায় দোয়া/মোনাজাত করেন। এভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ বিদায়ের আগে যা যা করণীয় তা দ্রুত সেরে ফেলতে থাকেন। পরিশেষে সেই ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার মহাপ্রস্থানের দিন উপস্থিত হল। মুসলিম জাহানের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, সমগ্র মুসলিম জাহানকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে "রফিকি আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই হি রাজেউন)।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমগ্র জীবনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁকে বহু ঘাত প্রতিঘাত, চড়াই উৎড়াই ও প্রবল প্রতিকলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। নবুয়তের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবনভর তিনি কঠিন

www.pathagar.com

সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই অগ্রসর হয়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরই আল্লাহর নির্দেশে মূর্তিপূজার বিপরীতে একেশ্বরবাদের ঘোষণা দেবার সময় থেকেই কাফের মুশরিকরা সদা সর্বদা তাঁর অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিছে লেগে থাকত। এমন কি তারা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করতেও দ্বিধা করত না। কারণ তারা ভাবত যে তাদের বাপ দাদাদের ধর্মের বিরোধীতায় তিনি যে নুতন ধর্ম ইসলাম প্রচার করে চলেছেন এবং তা যেভাবে দিন দিন শক্ত থেকে অধিকতর শক্ত হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র পথই হচ্ছে তাঁকে কতল বা হত্যা করা। ফলে সময় সময় চরম নির্যাতন ছাড়াও ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় একবার এবং হিজরতের সময় আরেকবার তাঁকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য হযরত ওমর (রাঃ) অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য খোলা তরবারী হস্তে ধাবিতও হয়েছিলেন। পরবর্তীতে হিজরতের রাত্রে তাঁকে হত্যা করার জন্য সশস্ত্র ঘাতকদল কর্তৃক তাঁর ঘর ঘেরাও করা হয়েছিল। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে?এভাবে অসংখ্যবার তিনি চরম সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্ত প্রতিবারই তিনি সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিস্ময়করভাবেই রক্ষা পেয়ে যান। (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে)।

এরূপভাবে প্রতিটি কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে আল্লাহতায়ালা তাঁকে রক্ষা করেন। আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি তাঁকে (রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে) 'নজরেই' রেখেছেন (সূরা তূর আয়াত-৪৮) কাজেই, 'মনুষ্যকুল তাঁকে সাময়িকভাবে কিছু ক্ষতি ছাড়া আর বিশেষ কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না' (সূরা ইমরান আয়াত-১১১)।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে চোখে চোখে রেখে তাঁকে পূর্ণ নিরাপদ রাখার কারণ কি ? তার কারণ আল্লাহই বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বার বার বলেছেন যে, কাফের মুশরিকরা চায় যে তারা আল্লাহর 'নূর' (জ্যোতিকে) তথা দ্বীন ইসলামকে তাদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ চাহেন কাফের মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন তিনি তাঁর জ্যোতি (আলোকে) পূর্ণতা প্রদান করবেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা প্রদান করার পূর্বেই যদি তিনি ইন্তেকাল করেন অথবা কাফের/মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়, তবে আল্লাহর নূর তথা দ্বীন ইসলাম কিভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, আর কিভাবেই উহা বিশ্বব্যাপী বিজয়ী হবে। তাঁর অবর্তমানে কিভাবেই বা আল্লাহর উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি/ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে ? কিন্ত আল্লাহর ঘোষণা অবশ্যই কোন অলীক/অবস্তাব ঘোষণা নয়। তিনি শত ঝড় ঝাপটার মধ্যেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বাঁচিয়ে রেখে তাঁর মাধ্যমে তাঁর মিশনকে (দ্বীন ইসলাম কায়েম বা প্রতিষ্ঠার মিশন) পূরো করে দেবেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহতা'য়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর মিশন পুরো করার উদ্দেশ্যেই অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মিশন সাফল্যজনকভাবে পরিসমাপ্তির পর দুনিয়াতে তাঁর বেশি দিন অবস্থানের অপ্রয়োজনীযতার কথা আল্লাহ্ প্রকান্তরে জানিয়ে দেবার পর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)ও আল্লাহরই নির্দেশ মোতাবেক যা যা করনীয় তা করছেন। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার ইহাই যে, এতদিন যারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে চরম নির্যাতন উৎপীড়ন করেছে এমন কি তাঁকে হত্যা করার জন্যও যারা ছিলেন সদা-সচেষ্ট, পরবর্তীতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবার পর তাঁরাই তাঁকে রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও সদা প্রস্তুত। এখন প্রশ্ন হল এই যে, এতদিন যারা তাঁকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন (পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে) এখন কি তারা তাঁকে রক্ষা করতে সফল হবেন ? আল্লাহর মহিমার কি লীলা খেলা, যে ওমর (রাঃ) একদিন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে খোলা তরবারী নিয়ে ধাবিত হয়েছিলেন, সেই ওমর (রাঃ)-ই আজ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ওফাতের খবর শুনার সঙ্গে সঙ্গেই আবার খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোষণা করে দেন যে, 'যে বলবে আমার রাছুল (ছাঃ) নেই তার গর্দাণ উড়িয়ে দেব। (বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা)। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে হজরত ওমর (রাঃ)-এর পূর্বের অসহনীয় অবস্থা এবং বর্তমান অসহনীয় অবস্থা যেন আসমান জমিন প্রভেদ।

উল্লেখ্য যে, কোন ঘটিতব্য ঘটনা যা নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে অথবা রাছুলুল্লাাহ (ছাঃ)-এর পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তা আল্লাহতায়ালা অনেক ক্ষেত্রে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পুর্ব থেকেই অবহিত করে দিতেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনার কথা আল-কোরআনে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টিও অনুরূপ আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুয়তী জীবনের মিশনের পূর্ণতা লাভান্তে উহার অবসান এবং সে সুবাদে তাঁর পরপারে মহাপ্রয়ানের জন্য প্রস্তুতির আভাস। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরাটি নাজিল হবার পর অনেকের মতে মাত্র তিন মাস অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যেই রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল/ওফাত হয়েছিল। তাছাড়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদরের কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ)-কে পরপারে গমনের যে স্পষ্ট আভাস দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি যে বলেছিলেন যে 'আমার বংশধরদের মধ্যে সর্বাগ্রে তুমিই পরপারে আমার সাথে মিলিত হবে'। এই অগ্রিম আভাসটিও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ওফাতের মাত্র ১৮০ দিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ ৬ মাসের মধ্যেই হজরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়।

উপরোক্ত তফসীর সমূহ থেকে দেখা যায় যে আল-কোরআনে উল্লেখিত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কিত উপরোক্ত অগ্রিম আভাস বা ঘোষণাটি কি বিস্ময়করভাবেই না বাস্তাবয়িত হয়েছে!

www.pathagar.com

আল-কোরআনের 'আয়াত'কে (কোরআনকে) অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে খোদ কোরআন

আল-কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত স্বরূপ সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী ও রাছুল হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত সর্বশেষ মহাঐশীগ্রন্থ বা আসমানী কিতাব। কোরআনে উল্লেখিত স্রষ্টার আদেশ নিষেধ হুকুম আহকাম পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরিপালন করে নিজ জীবনে উহার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটাবার জন্যই সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ইহা (কোরআন) তো উপদেশ সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য" সূরা তাকভীর (আয়াত-২৭)। এভাবে কোরআনেই অসংখ্য জায়গায় কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পর্কে পরিস্কারভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা কোরআনের এসব আদেশ নিষেধ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করলো তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত হল এবং তারাই ইহ ও পরকালে অশেষ কল্যাণ, মংগল, ও নেয়ামত প্রাপ্ত হবে বলে ঘোষিত। যেমন আল্লাহ বলেন, "হে নবী যারা এ কিতাবের উপর ঈমান আনবে এবং এর বিধান অনুযায়ী নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব জান্নাত (বেহেশত) তথা বাগান রয়েছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা।" (সূরা বাকারা আয়াত-২৫)। বিপরীতক্রমে যারা ইহা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করলো তারাই ইহ ও পরকালে ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে বলেও কঠোর হুশিয়ারী উচ্চরিত হয়েছে। আল্লাহর নাজিলকৃত/অবতারিত "আয়াত সমূহকে" (অর্থাৎ আল-কোরআনকে) যারা অবিশ্বাস করে অস্বীকার করছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে যে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে তারই কতিপয় বিবরণ এখানে দেয়া হল ঃ

(১) আদী মানব হজরত আদম (আঃ)কে বিশ্বমাঝে প্রেরণের সময় মহান শ্রষ্ঠা আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছিলেন, **"আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়েত (শরীয়তি বিধানমালা) তোমাদের কাছে পৌছবে তখন যারা আমার সেই হিদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয়, দুঃখ, বেদনা। আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল"**। (সূরা বাকারা আয়াত-৩৮-৩৯)।

২। **"তারা তো কোন হিসাব বিকাশ হবার আশা পোষন করতো না এবং আমার আয়াত সমূহকে তারা সম্পূর্ণ (মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করতো। আর অবস্থা ছিল এই যে, আমি প্রত্যেকটি বিষয়ই গুণে গুণে লিখে রেখে ছিলাম। এখন (আযাবের) স্বাদ লও, আমি (এখন) তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।" (সূরা নাবা, আয়াত -২৭-৩০)।**

www.pathagar.com

৩। **"আর যারা অবিশ্বাস (কুফরী) করেছে, তারা সদা অমান্যতায় (অস্বীকৃতিতে) নিয়োজিত। অথচ আল্লাহ আড়াল থেকে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন (অর্থাৎ তাদের অমান্যতায় এই কোরআনের কোনই ক্ষতি হবার নহে) বরং এই কোরআন অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে (লৌহ মাহ্‌ফুজে) লিপিবদ্ধ।" (সূরা বুরুজ, আয়াত-১৯-২২)।**

৪। **"আর যারা আমার আয়াত সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারাই 'বামপন্থী' তাদের উপর আগুন একেবারে পরিবেষ্টনকারী হয়ে থাকেব"।**

(অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে নিবে যে, তা থেকে বের হবার কোন পথই তারা পাবে না)। সূরা- বালাদ (আয়াত-১৯-২০)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের তরজমা ও তফসীর সমুহ থেকে ইহা দিবালোকের মত পরিস্কার যে, যারা আল্লাহর আয়াত তথা তাঁর অবতারিত ঐশী গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবকে অবিশ্বাস/অস্বীকৃতি বা অমান্য করবে তাদের জন্য আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি অবধারিত এবং অনিবার্য যা কেহই রোধ করতে পারবেনা।

আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতিজনিত কারণে আল্লাহ যে শাস্তির হুশিয়ারী দিয়াছেন তা থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য উচিৎ নয় কি ?

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী অনুকরণ করেই আমরা প্রার্থনা করি, **"এসব লোকেরাই বলে, হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি (অর্থাৎ আমরা অবিশ্বাস বা অস্বীকারকারী নহি) আমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে বাচান"। (আমীন)। (সূরা- ইমরান, আয়াত-১৬)।**

খতমান্তে আল্লাহ'র অশেষ শুকরিয়া।

ওয়া আখেরে দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নু ছাল্লি আ'লা রাছূলুহুল করীম।

ঃ সমাপ্ত ঃ

www.pathagar.com

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠার প্যারা	ছত্র / লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১২৭	৪	৬	বস্তুনিচয়ের	বস্তুনিচয়ের
১২৮	২	১	উপরো উল্লিখিত	উরোল্লিখিত
১৩১	১	১৪	আল দি	আল কোরআন দি
১৩২	৬	৩	সূরা প্রথমে	সূরার প্রথমে
১৩২	৬	৬	মুকাওায়াত	মুকাত্তায়াত
১৩২	৭	২	পূর্ব্বোআল্লিখিত	পূর্বোল্লিখিত
১৩৩	১	৬	রচনা করলেও	রচনার চষ্টা করলেও
১৩৩	৩	৫	আখ্যয়িত	আখ্যায়িত
১৪০	৪	শেষ	বিন্দুমত্রও	বিন্দুমাত্রও
১৪৩	৩	৫	এথাই	একথাই
১৪৩	৪	৯	অসত্য রোপকারী	অসত্যারোপকারী
১৪৫	৪	১	পরোলৌকিক	পারলৌকিক
১৪৫	৪	২	ইহালৌকিক	ইহলৌকিক
১৪৫	৪	৪	আশ্বানবানীও	আশ্বাসবাণীও
১৪৬	৩	৭	মহাসম্পানিত	মহাসম্মানিত
১৬২	৪	১	ক্রমিক নং ৭-৯	ক্রমিক নং ৯-১১
১৬৭	৩	১১	অতিশয্যে	আতিশয্যে
১৭১	২	২	আয়াত-৩	আয়াত-৪
১৭৪	৬	শেষ	সম্মিলিতবাবে	সম্মিলিতভাবে
১৮৪	১	১	মজিদে	মসজিদে
১৮৫	২	৩	তিন	তিনি
১৮৫	২	৬	সমহের	সমূহের
১৮৮	৩	১১	ভগি	ভগ্নি
১৯৪	৩	৯	সংগে হযরতের	সংগে নিয়ে হজরতের
২০২	২	১৫	উপাসনায়ল	উপাসনালয়
২০৫	১	৬	দ্বরা	দ্বারা
২০৫	৩	১১	সমেয়	সময়ে
২১৪	৪	৮	আঃ ৯-১৬	আঃ ৯-১৮
২১৫	২	৬	আমকে	আমাকে
২১৬	১	৩	নিকেট	নিকটে
২১৮	২	২	আয়াত-১	আয়াত-৩
২২৫	৩	৬	নেই	নাই

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠার প্যারা	ছত্র / লাইন	ভুল	শুদ্ধ
২৩০	২	২	মনক্ষুণ	মনক্ষুন্ন
২৩৭	১	৫	বন্ধুন্ত	বন্ধুত্ব
২৩৭	১	৬	সুবচার	সুবিচার
২৪৪	৪	১	কাফেগণ	কাফেরগণ
২৪৪	৫	৪	যুদ্ধামান	যুদ্ধমান
২৪৩	৩	১	নবদিক্ষীত	নবদীক্ষিত
২৪৫	৩	৪	নিপিড়িত	নিপীড়িত
২৪৮	৩	১	ইহমরানের	ইমরানের
২৫২	২	৬	অীধকাংশ	অধিকাংশ
২৫৩	১	১	উদ্ধেশ্য	উদ্দেশ্য
২৫৫	১	৯	অসারনতা	অসারতা
২৫৬	৩	৪	ষড়যন্ত্র	ষড়যন্ত্রে
২৫৮	১	৪	কাপটতা	কপটতা
২৫৮	৪	২	কর্তক	কর্তৃক
২৫৮	৪	৫	মসুলমানগনের	মুসলমানগণের
২৬৫	৪	২	প্রতাবর্তনের	প্রত্যাবর্তনের
২৬৬	১	৬	মিথ্যাশ্রুয়ী	মিথ্যাশ্রয়ী
২৬৯	৩	৪	নির্মাণেনর	নির্মাণের
২৭০	১	৪	পাঠালেন মুসা	পাঠালেন। মুসা
২৭১	১	২	অধিন	অধীন
২৭১	৩	২	মু'মিনুন	মু'মিন
২৭১	৪	৪	আল্লহ	আল্লাহ
২৭১	৫	১০	আঃ ৯০-৯১	আঃ ৯০-৯২
২৭১	৬	১	সব	শব
২৭২	১	৬	সব	শব
২৭৪	২	৬	দেরি	দেড়ি
২৮২	১	৬	শন্তনা	সান্ত্বনা
২৮৭	২	২	থাকেব	থাকবে।
সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী ক্রমিক নং ১৫			ইছরাম	ইসলাম
সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী ক্রমিক নং ২৭			হাড্রেড্‌দে	হাড্রেড্‌থ্

www.pathagar.com

ভ্রম সংশোধন

সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণ ঃ

সদ্য প্রকাশিত অত্র পুস্তকটি ইহার প্রথম সংস্করণ। ইহা পাঠান্তে প্রুফ রির্ডারদের যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক শব্দে, বানানে, কম্পোজ/মুদ্রণজনিত ভুল/ত্রুটি রয়ে গেছে। যা বর্তমান অবস্থায় সংশোধন করা যাচ্ছে না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে। নিম্নে কতিপয় ভুল/ত্রুটির সংশোধিতরূপ প্রদত্ত হল। –প্রকাশক।

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠার প্যারা	ছত্র / লাইন	ভুল	শুদ্ধ
সূচীপত্রের ক্রমিক নং ১৪১ হইতে ২৮৬ পর্যন্ত ভুল রয়েছে				
প্রকাশ				
কের				
কথা	১	৩	সমগ	সমগ্র
ভূমিকা	২	১৪	পূব	পূর্ব
ভূমিকা	৭	৩	বোধ কল্পে:	রোধ কল্পে:
ভূমিকা	৫	৯	সম্ভভ	সম্ভব
১৯	৫	৩	আয়াত-৩৯	আয়াত-৩১
২০	৩	৬	আঃ ২৫-২৬	আঃ ২৬-২৭
২০	৬	১	সাহায্য	সাহায্যে
২২	২	১	সুনিশ্চত	সুনিশ্চিত
২৮	৪	৫	নাজিলের উক্ত	নাজিলের পর উক্ত
৩০	২	৮	মনোনতী	মনোনীত
৩২	১	১-২	প্রাপ্তির পর পরই	(নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই)
৩২	৪	৬	আয়াত-৫৩	আয়াত-৫২
৪০	২	২	সম্পন	সম্পন্ন
৪২	১	২	সুষ্ঠু	সুষ্ঠ
৪২	২	১	বিরাট	×
৪২	৩	৩	চল্লিখ	চল্লিশ
৪২	৪	৫	গভীর ভাবে দেখা	গভীরভাবে ভেবে দেখা
৪৩	৩	৪	চশিোর্ধ	চল্লিশোর্ধ
৪৪	১	৪	বিভিন	বিভিন্ন
৪৭	২	৫	বিব্রত	বিবৃত
৪৭	৩	১০	অস্তিত	অস্তিত্ব
৫২	৬	২	ম্লেচ্ছ	ম্লেচ্ছ
৫৯	৩	৫	একশ্বরবাদ	একেশ্বরবাদ
৬১	১	৫	ভাষায় বলে	ভাষায় এই বলে
৬২	১	২	আঃ ৩৭-৩৮	আঃ-৩৮-৩৯
৬৩	২	৬	সুইচ্ছ	সুউচ্চ
৬৩	২	১৫	খ্যাতনাম	খ্যাতনামা
৬৪	১	৫	বানী	বাণী
৬৪	১	৮	একাধিকাবাতর	একাধিকবার
৬৪	৩	২	কলাম	কালাম
৬৫	৪	৯	ইজ্জাত	ইজ্জত
৬৬	৪	১	অন্যন্য	অনন্য
৬৬	৫	৩	পারনি	পারেনি
৬৭	১	৪	মানুসের	মানুষের
৬৮	১	১	অবঅস্থাতেই	অবস্থাতেই
৬৮	৩	২	বলতো	বসতো
৬৮	৩	২	কবিরদের	কবিদের
৭৩	৩	২	হতে	হয়ে
৭৭	৩	২	বাস্তাব	বাস্তব
৮১	২	২০	অসারত্তা	অসারতা
৮২	৭	২	অস্তত্ব	অস্তিত্ব
৯৩	২	১২	অবিজ্ঞতা	অভিজ্ঞতা
৯৫	৩	১২	শুনেন	শুনে
৯৮	২	১	রাছুল্লাহ	রাছুলুল্লাহ
৯৯	১	৫	সেই শুনে	সেই কথা শুনে
১১০	৪	৫	জিনিস	জিনিষ
১১২	২	২	গুরুত	গুরুত্ব
১১৫	১	৬	এতদ্বোদ্দেশ্যে	এতদোদ্দেশ্যে
১১৬	২	২	অনুগম	অনুপম
১১৭	১	৫	মাহেন্দক্ষণে	মাহেন্দ্রক্ষণে
১১৭	৬	৩	শোনারও	শুনারও
১২০	৪	৮	অদ্যোপান্ত	আদ্যোপান্ত
১২৫	২	১৬	বস্তকণা	বস্তুকণা
১২৭	৩	২	চৌদ্দমত	চৌদ্দশত
১২৭	৩	৯	মহাশুন্যের	মহাশূন্যের

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ মূলঃ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ), অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

২। তফসীরে আশরাফী ঃ মূলঃ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), অনুবাদঃ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী।

৩। তফসীরে তাফহীমুল কোরআন ঃ মূলঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ), অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।

৪। তফসীরে কোরান শরিফ ঃ মোহাম্মদ আলী হাসান (অনূদিত ও সংকলিত)।

৫। বোখারী শরীফ ঃ অনুবাদ ঃ শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক।

৬। সীরাতুন্নবী (সাঃ) ঃ মূল আল্লামা শিবলী নোমানী (রঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

৭। বিশ্বনবী ঃ কবি গোলাম মোস্তফা।

৮। মেশকাত শরীফ ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ)।

৯। পবিত্র কোরআন দর্পণে মানব জীবন ঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম।

১০। নবুয়াত ও রিসালাত ঃ মাওলানা মোঃ আবদুর রহীম।

১১। তাওয়ারীখে মোহাম্মদী ঃ মুহাম্মদ ছায়ীদ প্রণীত।

১২। কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা ঃ ডঃ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

১৩। পরধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ) ঃ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা।

১৪। শেষ নবী (সাঃ) ঃ আখতারুল আলম।

১৫। ইছরাম সোপান ঃ ইব্রাহীম খাঁ ও মৌলভী আহছান উল্লাহ সংকলিত।

১৬। মানবধর্ম ঃ আলহাজ্ব মওলানা ফজলুল করিম।

১৭। কোরআন পরিচিতি ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত।

১৮। সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা ঃ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা।

১৯। অমুসলিম মনিষীদের চোখে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ঃ উবায়দুর রহমান খান নদভী।

২০। ই'লমুল কোরআন ঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খান-সিরাজুল ইসলাম অনূদিত।

২১। ছিরাতুন্নাজাত ঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুস ছাত্তার।

২২। মহাগ্রন্ত আল-কোরআন কি ও কেন ঃ এ,কে, এম,ইউসুফ (মোমতাজুল মুহাদ্দেসীন)।

২৩। দি স্পিরিট অব ইসলাম ঃ জাষ্টিস স্যার সৈয়দ আমীর আলী।

২৪। দি ওয়ে অব লাইফ ঃ প্রফেসর ফিলিপ কে হিট্টি।

২৫। দি গ্লোরিয়াস কোরআন ঃ মোঃ মার্মাডিউক পিকথল।

২৬। বাইবেল-কোরআন ও বিজ্ঞান ঃ মূলঃ মরিস বুকাইলী, অনুবাদঃ আখতারুল আলম।

২৭। দি হার্ট্রেড্‌দে ঃ মাইকেল এইচ হার্ট।

২৮। দি মিনিং অব দি কোরআন (ভলিয়ম-১) ঃ সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদী।

২৯। কুরআন হাদীস ও বিজ্ঞান ঃ ছদরুদ্দীন, ই. ফা. প্রকাশনা।

৩০। সিরাজুম মুনীরা ঃ আবুল আসাদ সংকলিত।

৩১। মাদারেজুন নবুয়াত ঃ শায়খ আবদুল হক মোহদ্দেস দেহলভী (রহঃ)।

৩২। তরজুমানুস সুন্নাহ ঃ বদরে আলম মিরাঠী, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, অনূদিত,ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা।

৩৩। মাসিক মদীনা ঃ সীরাতুন্নবী সংখ্যা -১৯৯৭, ৯৮, ৯৯।

৩৪। সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ঃ সিরাতুন্নবী সংখ্যা-১৯৯৮, ১৯৯৯)।

৩৫। শাহ্‌নূর বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ ঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী,

৩৬। কাব্য–আমপারা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম,

৩৭। কেন মুসলমান হলাম (বিশ্বসেরা ২০০ মনীষী, ১ম ও ২য় খন্ড) ঃ মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী।

৩৮। অলৌকিক কিতাব আল-কোরআন ঃ এ,কে, মুহাম্মদ আলী।

www.pathagar.com